A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

বিশ্বপরিক্রমা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

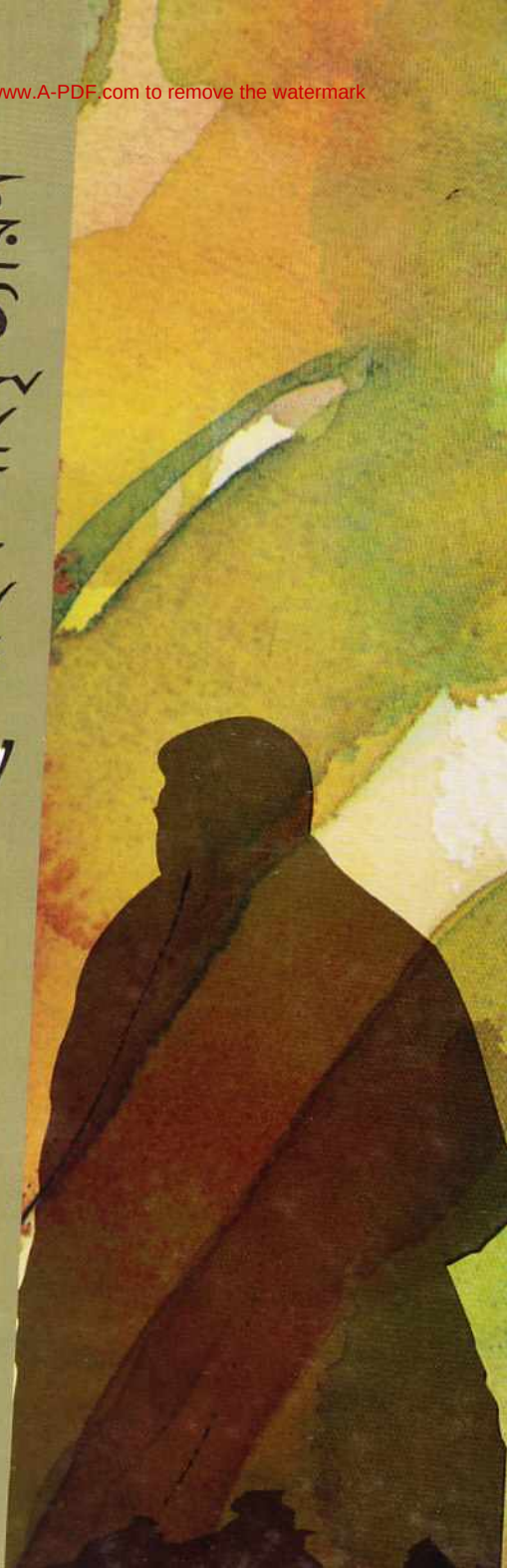

বিস্মৃত যাত্রী

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদ

মলয় চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা ও সম্পাদনা

যতীন সরকার

রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা)

ISBN : 978-984-8928-34-9

প্রকাশকাল : প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২

মূল্য : ২২০.০০ টাকা

প্রকাশক : মোঃ আমজাদ হোসেন খান (জামাল), রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স
৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১১-৭৩৮১৯২, কম্পিউটার কম্পোজ : রুক্কু শাহ্ কম্পিউটার
৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, মোবাইল : ০১৯৩৪-৫৫২৯৫৬
প্রাপ্তিস্থান : বাতিঘর চট্টগ্রাম, বইবাজার, নীলক্ষেত, ঢাকা
পরিবেশনায় : স্বরবৃত্ত প্রকাশন

প্রচ্ছদ : অরূপ মান্দী

সম্পাদকের কথা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামে আজ যিনি সর্বজন-পরিচিত, তাঁর পরিবার-প্রদত্ত নাম ছিল কেদারনাথ পাণ্ডে। পিতা গোবর্ধন পাণ্ডে ও মাতা কুলবন্তী দেবী।

১৮৯৩ সালের ৯ এপ্রিল উত্তর প্রদেশের পন্দাহা জেলায় আজমগড় গ্রামে মাতামহের বাড়িতে তাঁর জন্ম। মায়ের সঙ্গে মাতামহ রামশরণ পাণ্ডের অভিভাবকত্বেই অতিবাহিত হয়েছে কেদারনাথ পাণ্ডের বাল্যজীবন। বাল্যেই মাতামহের কাছে তিনি উর্দুভাষা শেখেন, এবং উর্দুতেই কেদারনাথের প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। শুধু উর্দুভাষা শিক্ষা নয়, মাতামহের কাছ থেকেই তিনি নানা দেশ ভ্রমণের প্রেরণা লাভ করেন। তাঁর মাতামহ এক সময়ে সৈন্যদলে কাজ করতেন। মাতামহের সৈনিকজীবনের নানা রোমাঞ্চকর গল্প ও বিভিন্ন দেশ দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে শুনতে একান্ত বাল্য বয়সেই কেদারনাথ রীতিমত অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় হয়ে ওঠেন। দশ বছর বয়সেই (১৯০৭ সালে) বাড়ি থেকে পালিয়ে কাশীতে চলে আসেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে ফিরেও যান। আবার সেই বছরেই কলকাতায় এসে রেলে কিছুদিন মার্কাম্যানের কাজ করার পর এক দোকানে খাতা লেখার কাজ নেন। সেই সঙ্গেই তিনি ইংরেজিভাষা শিখতে থাকেন। শুধু ইংরেজি নয়, জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তিনি অনেক অনেক ভাষা শিখে ফেলেন ও সে-সব ভাষার ভাণ্ডার থেকে জ্ঞানের মণিরত্ন আহরণ করে আনেন স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত এই মানুষটি।

মাত্র এগারো বছর বয়সে সন্তোষী নাম্নী এক মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই বিয়ে তিনি মেনে নিতে পারেননি, সারা জীবন সন্তোষীর সঙ্গে কোনোই সম্পর্ক রাখেননি। এর পর রাশিয়ায় গিয়ে তিনি লোলা নাম্নী এক বিদুষী মহিলাকে বিবাহ করেন, এবং এক পুত্রসন্তানের জনক হন। কিন্তু রাহুল রাশিয়া ছেড়ে ভারতে চলে এলে লোলা রাহুলের সাথে আসতে রাজি হননি। এরও অনেক পরে— ১৯৫০ সালে— তিনি তৃতীয় বিবাহ করেন নেপালি মহিলা কমলা পেরিয়ারকে।

দুই

বাল্যে ও প্রথম যৌবনে রাহুল ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ও ধর্মচর্চায় মনোযোগী। তবে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্মাচরণে কখনো অন্ধতাকে তিনি প্রশ্রয় দেন নি। যুক্তিশীলতা ছিল তাঁর একান্ত মানস-বৈশিষ্ট্য। সেই মানস-বৈশিষ্ট্যের দরুনই বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসকে যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিতে নিতে এক সময় ঈশ্বর ও ধর্মের নির্মোক পরিত্যাগ করে হয়ে ওঠেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী।

বিশ বছর বয়সে—১৯১৩ সালে—ছাপরা জেলার পরসা মঠের মহান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় বাবাজি রামোদার দাস। মহান্তের মৃত্যুর পর তাঁর গদির উত্তরাধিকারী রূপে লক্ষ লক্ষ টাকা ভোগের সুযোগ লাভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু ভোগসুখের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই অনায়াসে তিনি মহান্তের গদি ছেড়ে দেন। এ-সময় তিনি দয়ানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আর্যসমাজের সঙ্গে পরিচিত হন, এবং বেদ-অনুসারী আর্যসমাজের ভাবধারাকে সত্য বলে মেনে কিছুদিনের জন্য আর্যসমাজী হয়ে যান। আর্যসমাজে অবস্থান করেই গভীরভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি উপলব্ধি করেন যে বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ মতবাদই হচ্ছে প্রকৃত সত্যের ধারক। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষু হয়ে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নাম ধারণ করেন। আজীবন এই নামটি তিনি পরিত্যাগ করেন নি, এবং এ-নামেই হন স্বনামধন্য ও বিশ্বনন্দিত।

বৌদ্ধ দর্শনে ব্যুৎপত্তি লাভ করার পরই তিনি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মার্কসীয় দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং মার্কসবাদকেই গ্রহণ করেন তাঁর জীবনদর্শন রূপে। আমৃত্যু সেই দর্শনের তিনি অনুসারী ছিলেন, মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েই জীবন ও জগতের সকল কিছুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে চলছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়,—

> "আমি কোনো এক সময় বৈরাগী ছিলাম, পরে আর্যসমাজী হয়েছিলাম, বৌদ্ধ ভিক্ষুও হই, আবার বুদ্ধের ওপর অপার শ্রদ্ধা রেখেও মার্কসের শিষ্য হয়েছি।"

মার্কসের শিষ্য ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য হয়েও বুদ্ধের শিষ্যত্ব তিনি পরিত্যাগ করেন নি কেন তার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন। কয়েকবার তিব্বত অভিযান করে তিনি যে-সব হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধগ্রন্থের উদ্ধার সাধন করেন, সে-সবের মধ্যেই ছিল বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম ভাষ্যকার ধর্মকীর্তির 'প্রমাণ বার্তিক' গ্রন্থটি। সেই গ্রন্থে বুদ্ধের মতবাদ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে—

> "বেদকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা, কাউকে (ঈশ্বর) কর্তা বলে মানা, গঙ্গাদিতে স্নান করে পুণ্যসঞ্চয় করা, উচ্চনীচ জাতির অভিমান করা, পাপ বিনষ্ট করার জন্য সন্তাপ—এই পাঁচটি বুদ্ধিহীন মূঢ়তার লক্ষণ।"

ধর্মকীর্তির গ্রন্থে প্রাপ্ত বুদ্ধের এই মতবাদ রাহুলের চৈতন্যকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। আবার বৌদ্ধদর্শন পাঠ করেই উপলব্ধি করেন যে বুদ্ধ তাঁর সকল মতবাদকে চূড়ান্ত বা চিরকালীন বলে নিজেও গ্রহণ করেননি এবং অন্যকেও তেমন করার উপদেশ দেন নি। তিনি সকলকে 'আত্মদীপ' হওয়ার—অর্থাৎ নিজের পথ নিজেই খুঁজে নেওয়ার— পরামর্শ দিয়েছেন। বুদ্ধের এই বক্তব্যও রাহুলকে বিশেষভাবে উজ্জীবিত করে, এবং এক সময় মার্কসীয় দর্শনের মধ্যে তিনি খুঁজে পান বৌদ্ধের দর্শনের ধারাবাহিকতার পরিচয়। 'বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ' গ্রন্থে রাহুল বলেন,—

> "বুদ্ধ ছিলেন কালবাদী—দেশ, কাল, ব্যক্তি দেখে তিনি তাঁর সম্পদ দান করতেন, বাতাসে তলোয়ার চালনা পছন্দ করতেন না তিনি। বুদ্ধের এই নগণ্য শিষ্য রাহুলেরও নীতি তাই। বুদ্ধের শিষ্যত্বের যে অধিকার সেটা আমি ছেড়ে দিইনি। বুদ্ধ বলেছিলেন, 'আমার উপদেশিত ধর্ম নৌকার মতো, পারে পৌঁছানোর জন্যে, ঘাড়ে

করে বয়ে চলার জন্য নয়' (মজ্‌ঝিম নিকায়)। তাঁর উপদেশ অনুসরণ করেই আমি ক্ষণিক (দ্বন্দ্বমূলক) অনাত্মবাদ থেকে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদে এসে পৌঁছেছি।"

ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীরা যেমন আত্মার অবিনাশিতায় বিশ্বাস করেন, বুদ্ধ তেমনটি করতেন না। তাই তাঁর মতবাদের অভিধা 'ক্ষণিক অনাত্মবাদ'। কোনো কিছুই নিত্য বা অপরিবর্তনীয় নয়, সব কিছুরই ক্ষণে ক্ষণে বদল ঘটে। এই বদল ঘটার দর্শনই প্রতীত্যসমুৎপাদ। বুদ্ধ তাঁর ধম্মপদে এই ক্ষণিক অনাত্মবাদ তথা প্রতীত্য-সমুৎপাদের দর্শনকে বর্ণনা করেছেন এ-ভাবে,—

"ভিক্ষুগণ, সবকিছু যা জীবিত থাকে তা মারা যায় বলে জানবে। প্রত্যেক কিছুর একটি কারণ আছে। যে বস্তু স্থায়ীভাবে আত্মপ্রকাশ করে বাস্তবে এটা অস্থায়ী। তারা অবশ্যই দূরীভূত হয়ে যাবে। গৌরবের সর্বোচ্চ বিন্দুতে থাকলেও তার শেষ আছে। ঐক্য থাকলে বিচ্ছেদও আছে। যেখানে জীবন আছে সেখানে মৃত্যুও আছে।"

'কার্যকারণের নিয়মকে বিশ্ববিকাশের মূল হিসেবে চিহ্নিত করার ভারতীয় ধারার বড় ধরনের বিকাশ'ই ঘটেছিল বৌদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদে। রাহুল এ-দর্শনটির প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েও এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। সেই সীমাবদ্ধতাই তিনি নিরাকৃত হতে দেখলেন মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শনের নৌকা বা ভেলায় চড়ে তিনি মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে উপনীত হতে পেরেছিলেন বলেই নিজেকে যুগপৎ বুদ্ধ ও মার্কসের শিষ্য বলে পরিচিত করেছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান অর্জনে রাহুল বিশেষ সহায়তা পেয়েছেন শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ শাস্ত্রপীঠ 'বিদ্যালংকার পরিবেণ' থেকে। ১৯২৭ সালের ১৬মে থেকে ১৯২৮ সালের ১ ডিসেম্বর বিদ্যালংকার পরিবেণে অবস্থান করে সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন ও মূল পালিভাষায় ত্রিপিটক শাস্ত্র ও অট্‌ঠকথা অধ্যয়ন করেন। বিদ্যালংকার পরিবেণ থেকে তিনি 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধি পান, এবং কাশীর পাণ্ডিতসমাজ কর্তৃক ভূষিত হন 'মহাপণ্ডিত' উপাধিতে।

১৯৩৪, ১৯৩৬ ও ১৯৩৮— এই তিনবার তিনি তিব্বতে যান, সেখান থেকে তিনি ৩৬৩টি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করেন। বিশিষ্ট মার্কসবাদী লেখক ও বিপ্লবী সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার লিখেছেন,—

"রাহুলের বৌদ্ধ ভিক্ষু জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভারতে লুপ্ত বৌদ্ধ সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শনের অমূল্য সম্পদগুলিকে তিব্বত থেকে পুনরুদ্ধার এবং বিদ্বৎ সমাজের সামনে তুলে ধরা। এই কীর্তি তাঁকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দান করে।...নাগার্জুন, অসংগ, বসুবন্ধু, জ্ঞানশ্রী, প্রজ্ঞাকর গুপ্ত, রত্নকীর্তি প্রমুখ বহু বৌদ্ধ পণ্ডিতের লুপ্ত মূলগ্রন্থ তিনি আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধ দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক' গ্রন্থের মূল সংস্কৃত আকারে পুনরাবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁরই। রাহুলের তিব্বত অভিযান ছিল যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনি রোমাঞ্চকর।...সংগৃহীত পুঁথিগুলি বহনের জন্য ২২টি ঘোড়া ও খচ্চরের প্রয়োজন হয়। সেই বিশাল সংগ্রহের বেশির ভাগই এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। সেগুলি পাটনা যাদুঘরে বিহার রিসার্চ সোসাইটির ও বিদ্যালঙ্কার মঠের গ্রন্থাগারে পড়ে আছে।"

প্রখ্যাত বৌদ্ধদর্শন-বিশারদ শ্চেরবাটস্কেইর আমন্ত্রণে ১৯৩৭ সালে রাহুল রাশিয়ায় যান, এবং ১৯৩৮ সালে দেশে ফিরে আসেন। আবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ১৯৪৫ সালে রাশিয়ায় গিয়ে লেনিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। রাহুল ও শ্চেরবাটস্কেই— এই দুই জ্ঞানব্রতী বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে পারস্পরিক মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে উভয়েই যথেষ্ট সমৃদ্ধ হন, এবং উভয়ের প্রযত্নে বৌদ্ধ দর্শনের অনেক অজ্ঞাত তথ্য ও তত্ত্বের উন্মোচন ঘটে।

রাহুল শুধু পৃথিবী পরিব্রাজকই ছিলেন না, বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যে পরিব্রাজনাতেও ছিলেন একান্ত নিষ্ঠাবান ও নিরলস।

তিন

রাহুল তাঁর অধীত জ্ঞান ও উপলব্ধিকে লোকসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না-দিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারতেন না। এর জন্যই তিনি প্রতিনিয়ত লিখে চলেছেন। প্রায় দেড়শত গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। তাঁর গ্রন্থ রচনার প্রকৃতি ছিল একান্তই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের ধারক। এ-ব্যাপারে গোপাল হালদার জানিয়েছেন,—

> তিনি একসঙ্গে চার পাঁচটা বই লিখেছেন। চার পাঁচজন লোককে বসিয়ে দিতেন তাঁর চারদিকে। খাবার জিনিসপত্র থাকতো, মাঝে মাঝে খেয়ে নিতেন, ছ'সাত ঘণ্টা তিনি একজনের পর আর একজনকে বলে বলে যেতেন। চারজন লোককে চার বিষয়ে একের পর এক বলে যাওয়া, খেই না হারিয়ে এবং ভাষা ঠিক রেখে, সামঞ্জস্য রেখে— এ অদ্ভুত প্রতিভাধারী মানুষের পক্ষেই সম্ভব।"

শুধু তাই নয়। অন্যকে দিয়ে এভাবে লেখানো ছাড়াও, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ হাতেও তিনি অনবরত লিখে যেতেন। এ-ব্যাপারে রাহুলের বন্ধু ধর্মাধার মহাস্থবির একটি অভিনব তথ্য আমাদের জানিয়েছেন,—

> "একবার বেনারসে একসঙ্গে খেতে বসেছি, আমরা কয়েকজন খাচ্ছি ডালভাত, তিনি রুটি। কেন ভাত তরকারি খান না জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন : 'রুটি মুখে দিয়ে চিবোতে চিবোতে লিখতে পারি। হাত পরিষ্কার থাকে।' এর থেকে প্রমাণ হয় সময়ের অপচয় তিনি করতেন না। সেই জন্য সংস্কৃতি, রাজনীতির এত কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।"

এভাবে নিজের হাতে লিখে ও অন্যকে দিয়ে লিখিয়ে রাহুল যে-সব বই প্রকাশ করেছেন, সে-সব বই প্রকৃতিতে ও বিষয়বস্তুতে যেমন বিচিত্রবিধ, প্রকাশরীতিতেও তেমনই অভিনবত্ব ও বিশিষ্টতার ধারক। বিভিন্ন ধরনের পাঠকের কথা বিবেচনায় রেখে একই বিষয়বস্তু নিয়ে একাধিক বই একাধিক ভঙ্গিতে তিনি রচনা করেছেন। কোনোটি হাল্‌কাচালের, কোনোটি গম্ভীর। কোনো বইয়ে গল্পের মাধ্যমে সমাজসত্য সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে আকৃষ্ট ও শিক্ষিত করে তোলার প্রয়াস, কোনো বইয়ে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পাঠকের জন্য তথ্যানুসন্ধান ও তত্ত্বকথন।

উদাহরণস্বরূপ 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা' ও 'মানব সমাজ' বই দুটোর কথা বলা যেতে পারে। বিশটি গল্পের আধারে গণমনতোষিণী ভাষা ও রীতিতে 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা'য়

বিশ শতকের বিশের দশক পর্যন্ত মানবসমাজের ইতিহাসটিকে তিনি তুলে আনেন। এর পরই লিখেন দুই খণ্ডের 'মানব সমাজ' গ্রন্থটি। এ-গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতি অবলম্বন করে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর পাঠকদের জন্য মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবসমাজের ইতিহাস বিবৃত করেন— বিষয়বস্তু এক হওয়া সত্ত্বেও হাল্‌কা চালের 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা' থেকে আঙ্গিকে ও প্রকাশ রীতিতে 'মানব সমাজ' একান্তভাবেই স্বতন্ত্র।

পীযূষেন্দু গুপ্ত নামক একজন আলোচক রাহুল-রচিত সাহিত্যকে চার ভাগে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। প্রথম ভাগে পড়ে 'অতি উচ্চস্তরীয় গবেষণামূলক গ্রন্থসমূহ।' যেমন,—'মধ্য এশিয়ার ইতিহাস'। দ্বিতীয়ভাগে আছে 'মানব সমাজ', 'বিশ্বের রূপরেখা', 'বৈজ্ঞানিক ভৌতিক বাদ', 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' ইত্যাদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলো মূলত রচিত হয়েছিল শিক্ষিত পাঠকদের কাছে ভারতীয় পটভূমিকায় মার্কসবাদকে পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে। রাহুল-সাহিত্যের তৃতীয় ভাগে আছে ঐতিহাসিক কাহিনী এবং উপন্যাস। যেমন— 'সিংহ সেনাপতি', 'জয় যৌধেয়', 'ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা' 'রেখা ভগৎ', 'মঙ্গল সিংহ', 'সফদর', 'সোমের' ইত্যাদি। এগুলোতে প্রাচীন কাহিনীর মধ্য দিয়ে তিনি বিগত কালের রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে গণমনের উপযোগী রূপে পরিস্ফুট করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। সর্ব শেষভাগে আছে তাঁর এমন কতকগুলো গ্রন্থ যেগুলো তিনি রচনা করেছেন একান্তই স্বল্পশিক্ষিত লোক সাধারণ ও শ্রমনিষ্ঠ প্রাকৃত জনের জন্য। যেমন— 'বাইসবীঁ সদী' (বাইশতম শতাব্দী), 'সাম্যবাদ হি কেওঁ' (সাম্যবাদই কেন), 'তুম্‌হারী ক্ষয়' (তোমার ক্ষয়') 'ভাগো নেহী, দুনিয়া কো বদলো' (পালিও না, দুনিয়াকে বদলাও) ইত্যাদি। এগুলোর বাইরেও আছে তাঁর পাঁচখণ্ডের বিশাল গ্রন্থ 'মেরী জীবনযাত্রা' শীর্ষক আত্মজীবনী।

সংক্ষেপে তাঁর গ্রন্থাবলির পরিচয় তুলে ধরা কোনো মতেই সম্ভব নয়। তবে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন' সম্পর্কে কিছু কথা না-বললেই নয়। 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন'কে বলা যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ। কিন্তু, না। এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিরা দর্শনের যে-সব ইতিহাস লিখেছেন সেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্বে অবশ্যই বিশেষ সমৃদ্ধ। কিন্তু রাহুলের বইয়ে দর্শনের সব তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে। এতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের দর্শনের মূলমর্ম যেভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তেমনটি আর কোথাও হয়নি। বিশেষ করে ভারতীয় দর্শন ও ইসলাম দর্শন রাহুলের হাতে নতুন আলোতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। ইসলামের প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক ভূমিকার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাহুল লিখেছেন,—

> "ইসলাম বোঝাপড়া করতে চেয়েছিল, সামন্ত-পুরোহিতদের শাসন ব্যবস্থার সঙ্গেই যার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ছিল সামন্তবাদী শোষণ ও দাসপ্রথা। একথা ঠিক যে ইসলাম এই মূল ভিত্তিকে পরিবর্তিত করার উদ্দেশ্য কখনও ঘোষণা করেনি, কিন্তু এই কাজে আরবের উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলির (কবীলগুলির) মধ্যে প্রচলিত সাম্য ও সৌভ্রাত্রের নীতিকে অবশ্যই ব্যবহার করেছিল, যাতে তারা মুষ্টিমেয় শাসকগোষ্ঠীর পায়ের নীচে পড়ে থাকা সাধারণ জনতার এক বিরাট অংশকে আকৃষ্ট ও শোষণমুক্ত

করতে সমর্থ হয়েছিল। যদিও ইসলাম ঐ নীতিকে কবীলগুলির সামাজিক কাঠামো থেকেই গ্রহণ করেছিল তবুও পরিণামে এটি একটি প্রগতিশীল শক্তির কাজ করেছিল।"

শুধু 'দর্শন-দিগ্‌দর্শন'-এ নয়। ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থেকে এক সময় তিনি সংস্কৃত ভাষায় কোরান শরিফের অনুবাদেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাঁর 'ইসলামের রূপরেখা' একটি অনবদ্য গ্রন্থ। বর্তমানে কিছু ধর্মান্ধ মুসলমান মৌলবাদী ভাষ্যের মাধ্যমে ইসলামের একটি বিকৃত রূপের প্রকাশ ঘটাচ্ছে যখন, তখন সেই বিকৃতিটাকেই অনেকে প্রকৃত ইসলাম বলে সাব্যস্ত করে বসেছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্যে এখন ইসলামকে একান্তই মৌলবাদী বলে চিত্রিত করা হচ্ছে এবং জঙ্গিবাদের সঙ্গে ইসলামকে একীভূত করে ফেলে সারা বিশ্বে ইসলাম-বিদ্বেষ ছড়ানো হচ্ছে। একান্তই অসঙ্গত এই বিদ্বেষ। এই বিরূপ সময়ে রাহুল সাংকৃত্যায়নের ইসলামচর্চা থেকে আমরা প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেতে পারি,— মহান্ ইসলাম সম্পর্কে আমাদের সকল ভুল ধারণার অপনোদন ঘটতে পারে।

চার

মহাপণ্ডিত রাহুল তাঁর পাণ্ডিত্যের ভাগ যেমন বিভিন্ন ধরনের বই রচনা করে সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য পরিবেশন করেছেন, তেমনই সক্রিয় রাজনীতিতে যুক্ত হয়ে তাঁর তত্ত্বজ্ঞানকে কর্মে পরিণত করে তুলেছেন। একই সঙ্গে চলেছে তাঁর বিশ্বপরিক্রমা, জ্ঞানান্বেষণ ও রাজনীতিচর্চা।

বিশ শতকের বিশের দশকের গোড়াতেই তিনি কংগ্রেসী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অবদান রাখেন। এই আন্দোলনের জন্য দু'বার তাঁকে কারাবাসে যেতে হয়।

তিরিশের দশকের প্রায় শুরু থেকেই তাঁর চৈতন্যে আমূল পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এ-সময়েই তিনি মার্কসবাদকে তাঁর জীবনদর্শন রূপে গ্রহণ করেন, এবং তারই পরিণতিতে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে।

১৯৩৯ সালে বিহারের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যপদ লাভ করেন তিনি। কিছুদিন পরেই বিহারে কৃষক-সত্যাগ্রহে অংশ নিয়ে গ্রেফ্‌তার হন। এ-সময়ে মুক্তি পেলেও ১৯৩৯ সালের ১৫ মার্চ ভারতরক্ষা আইনে আবার তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয় এবং হাজারিবাগে তাঁকে ২৯ মাস কারাভোগ করতে হয়।

১৯৪৭ সালে ভাষা প্রশ্ন নিয়ে (হিন্দি-উর্দু বিতর্ক) কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে তিনি পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু কমিউনিজমের দর্শন পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই ১৯৫৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি রাহুল কমরেড অজয় ঘোষের সঙ্গে দেখা করে আবার পার্টির সদস্য হন। রাহুল নিজেই লিখেছেন,—

"এটা সকলেই জানতেন যে আমি পার্টি সদস্য না-থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ছিলাম পার্টিরই লোক। আর কলমের সাহায্যে সে-কাজই তো করতাম। এখনও কলম

দিয়েই সে-কাজ করে যেতে পারি। এ-কথা তাঁকে (কমরেড অজয় ঘোষকে) বলছি।"

আসলে ভাষা-প্রশ্নে মতানৈক্য সত্ত্বেও রাহুল পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হননি। তিনি নিজের ইচ্ছাতেই পার্টি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তবু সব সময় নিজেকে তিনি পার্টির লোক বলেই ভেবেছেন, এবং পার্টির বাইরে থাকা-যে সঠিক বা সঙ্গত নয় এক সময় এ-বোধে উপনীত হয়েই আবার পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেছেন।

রাহুল দীর্ঘকাল ডায়বেটিসে ভুগছিলেন। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যান। কিছুদিন কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসা চলার পর তাঁকে মস্কোতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে সাতমাস ধরে তাঁর চিকিৎসা চলে। কিন্তু তাঁর স্মৃতির আর পুনরুদ্ধার ঘটে না। ১৯৬৩ সালের ২৩ মার্চ তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১৪ এপ্রিল ৭০ বছর বয়সে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

পাঁচ

বাংলা ও বাঙালির সঙ্গে রাহুলের ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রাহুলের যেমন বাঙালিদের জন্য ছিল গভীর ভালোবাসা, বাঙালিদেরও তেমনই রাহুলের প্রতি রয়েছে অন্তহীন প্রীতি ও শ্রদ্ধা। পশ্চিমবঙ্গে তো রাহুলকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় বাংলাদেশ রাহুলচর্চায় অনেক পিছিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক কালে এ-ব্যাপারে এখানেও বেশ সচেতনতা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে রাহুলচর্চায় অগ্রচারীর ভূমিকায় আছেন চট্টগ্রামের বৌদ্ধসমাজের সুধীবৃন্দ। অতি সম্প্রতি (মে ২০০৯) প্রকাশিত হয়েছে ঐ সমাজেরই তরুণ লেখক জগন্নাথ বড়ুয়ার 'মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন জীবন ও সাহিত্যকর্ম' গ্রন্থটি।

বহু ভাষাবিদ্ রাহুলের বইপত্র মূলত হিন্দি ভাষাতেই লিখিত। তবে সংস্কৃত, পালি, তিব্বতি, ভোজপুরী প্রভৃতি ভাষাতেও বেশ কিছু বই তিনি লিখেছেন। বাংলা ভাষায় এ-পর্যন্ত রাহুলের অন্তত ত্রিশ/চল্লিশটি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এ-গুলোর মধ্যে আছে : দর্শন-দিগ্‌দর্শন (২ খণ্ড), বৌদ্ধ দর্শন, মানব সমাজ, ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা, সিংহ সেনাপতি, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, তিব্বতে সওয়া বছর, কিন্নর দেশে, আকবর, স্তালিন, মাও সে-তুঙ্, বিস্মৃতযাত্রী, ইরান, জয় যৌধেয়, স্মৃতির অন্তরালে, বহুরূপী মধুপুরী, ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতন, সপ্তসিন্ধু, ইসলাম ধর্মের রূপরেখা, অগ্নিস্বাক্ষর, উত্তরাংশ, মধুর স্বপ্ন, পুরনো সেই দিনের কথা (সতমী কে বঁচ্চে), কনৈলা কী কথা, রামরাজ্য ও মার্কসবাদ, নতুন মানব সমাজ, আমার লাদাখ যাত্রা, এবং পাঁচখণ্ডে লিখিত আত্মজীবনী 'আমার জীবন যাত্রা' প্রভৃতি।

বাংলায় অনুবাদিত এই বইগুলো বর্তমানে খুব সহজপ্রাপ্য নয়। অথচ রাহুলের বইগুলোর সঙ্গে বর্তমানের তরুণ বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন খুবই তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের বিপর্যয়ের পর বিশ্বায়নের নামে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা-ধন্য তাত্ত্বিকবৃন্দ যখন 'ইতিহাসের সমাপ্তির তত্ত্ব' প্রচার করেন কিংবা মার্কসীয় শ্রেণীসংগ্রামের

তত্ত্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যে বিভ্রান্তির জাল বিস্তার করেন, তখন সে-জাল থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাবার জন্য রাহুলের গ্রন্থপাঠ একান্তই জরুরি। রাহুলের সব বক্তব্যই-যে পুরোপুরি যুক্তিসিদ্ধ নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই-যে তিনি সরলীকরণের প্রশ্রয় দিয়েছেন,—এ-কথা ঠিক। তবু, মানতেই হবে যে : প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত আমাদের এই উপমহাদেশের ভাবনা-ধারণা ও কর্মকাণ্ডকে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে রাহুল যেভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তেমনটি আর কারো দ্বারাই সম্ভব হয়নি। তাই, একালেও, রাহুলের বক্তব্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আবশ্যকতা আমাদের জন্য একান্তই অপরিহার্য।

এই অপরিহার্যতার বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই 'রুক্কু শাহ্ ক্রিয়েটিভ পাবলিশার্স'-এর মোঃ আমজাদ হোসেন খান (জামাল), বঙ্গানুবাদিত রাহুল-পুস্তকাবলির প্রকাশ ও প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর এই উদ্যোগ সাফল্যমণ্ডিত হোক।

—যতীন সরকার

অনুবাদ প্রসঙ্গে

'বিস্মৃত যাত্রী' মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের এক ইতিহাসাশ্রয়ী ভ্রমণোপন্যাস, যদিও লেখক নিজে গ্রন্থের ভূমিকায় এর উল্লেখ করেছেন নিছক উপন্যাস বলে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের এক পরিব্রাজকের জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই কাহিনি। পরিব্রাজক নরেন্দ্র যশ যে পথে চীনদেশের উদ্দেশে যাত্রারম্ভ করেছিলেন সে কালে তার অধিকাংশই ছিল মহাবাণিজ্য পথ। বর্তমানে Silk Root বা রেশম পথ বলে যে প্রাচীন বাণিজ্য পথের খোঁজ ঐতিহাসিকেরা করছেন, কাহিনির পরিব্রাজকের পথও ছিল সেই দিকে। উৎসাহী পাঠকেরা এই গ্রন্থের পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবে, গ্রন্থকারের 'মধ্য এশিয়ার ইতিহাস', 'বৌদ্ধদর্শন', এবং পারস্যের মজদক পন্থী ও হুণদের ইতিহাস সম্বলিত গ্রন্থ 'মধুর স্বপ্ন' পড়ে নিতে পারেন।

১ বৈশাখ ১৪০৭ মলয় চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা

দুটি কথা

ইতিহাসের ছাত্র হওয়ার কারণে এবং একজন পর্যটক হওয়ার সুবাদেও 'বিস্মৃত যাত্রী'র মতো উপন্যাস লেখার দিকে আমার মনযোগ আকর্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। একই সঙ্গে একজন ইতিহাসকার এবং একজন পর্যটকের দায়িত্বভার সার্থকভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা করেছি, এর ফলে এমনটিও হতে পারে যে উপন্যাস-প্রেমী পাঠক এখানে কিছু সীমাবদ্ধতা পেতে পারেন। যদিও ওই সমস্ত পাঠকের মতামতের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত নই তা সত্ত্বেও যে সমস্ত ত্রুটির কথা উঠতে পারে সে সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তবে সমস্ত ত্রুটিমুক্ত গ্রন্থ রচনা বোধ হয় আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ওই সমস্ত ত্রুটি অপসারণ করতে হলে বেশ কিছু তথ্যেরও অপসারণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে, সেই সঙ্গে আমার মধ্যে ধৈর্য্যেরও যথেষ্ট অভাব আছে। অতীতের সমাজব্যবস্থাকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তোলাই আমার কাছে প্রথম কর্তব্য বলে মনে হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে, ইতিহাস এবং ভূগোল, তৎকালীন দেশ, কাল, পাত্রর মধ্যে অসঙ্গতি এবং সেই অসঙ্গতির কোনো ব্যাখ্যা আমার কাছে আদৌ গ্রহণীয় নয়। 'বিস্মৃত যাত্রী' লিখতে গিয়ে উপরোক্ত বিষয় সমন্ধে কতটা মনযোগ দেওয়া হয়েছে তা পাঠকের বিচার্য।

নরেন্দ্র যশ কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়। তিনি আমাদের দেশেরই– অধুনা পাকিস্তানের স্বাত (উদ্যান)-এর মাটিতে ৫১৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভিক্ষু হওয়ার পর তিনি ভারত, সিংহল, মধ্য এশিয়া, যাযাবরদের ভূমি ও চীন দেশ ভ্রমণ করেছিলেন এবং পরিশেষে আধুনিক শিয়ান (প্রাচীন ছাঙ-আন) মহানগরে দেহত্যাগ করেন। চীনা সাহিত্যে তাঁর সম্বন্ধে যে সমস্ত উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলিকে ড. পা চাউ সংকলিত করেছেন যা আমি গ্রন্থের প্রারম্ভেই উল্লেখ করেছি এবং ড. পা চাউয়ের কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী।

'নরেন্দ্র যশ উদ্যানের ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মেছিলেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি প্রবজ্যা গ্রহণ করেন এবং ২১ বছর বয়সে বৌদ্ধ সংঘ তাঁকে উপসম্পদা প্রদান করে। ভিক্ষু জীবনের শুরুতেই তাঁর মনে সেই সমস্ত পবিত্র স্থান জন্মায় সেখানে বুদ্ধের পবিত্র ধাতু সুরক্ষিত আছে। তিনি বৌদ্ধধর্মেও সঙ্গে সম্পর্কিত বহু স্থান পরিভ্রমণ করেন। দক্ষিণে সিংহল এবং উত্তরে হিমালয় অতিক্রম করে তিনি আরও দূর দেশে যান। একবার একজন স্থবির তাঁকে বলেছিল যদি তুমি চুপচাপ শীল (আচার) অভ্যাস করে যাও তাহলেই তুমি আর্যফল (দিশা অথবা নির্বাণ) পেতে পারো, অন্যথায় তোমার এই পরিব্রাজনা বৃথা। কিন্তু, নরেন্দ্র যশ সেই স্থবিরের উপদেশ পালন করেননি।

'সিংহল থেকে ফিরে নরেন্দ্র যশ কিছুদিন তাঁর জন্মভূমি উদ্যানে বাস করেন। যখন তাঁর বিহার আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয় তখন বোধ হয় সাহায্যের আশায় পাঁচজন সঙ্গীর

সঙ্গে হিমালয়ের উত্তরে অগ্রসর হন। হিমালয়ের ওপরে দুটি পথ ছিল। একটি মানুষের অপরটি দানবের। চলতে চলতে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁদের একজন সঙ্গী পথভ্রষ্ট হয়ে দানবদের পথে চলে গিয়েছেন, তখন তিনি দৌড়ে সেদিকে যান। কিন্ত দুর্ভাগ্য দানবেরা ততক্ষণে তাঁর সঙ্গীকে মেরে ফেলেছিল। মন্ত্রশক্তির বলে তিনি দানবদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সমর্থ হন। তারপর তাঁরা দস্যুদের খপ্পরে পড়েন। সেখানেও মন্ত্রশক্তির বলে রক্ষা পান। তারপর তাঁরা পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে জুই-জুই (অবার) দেশে পৌছান। সেখানে তখন তুর্করা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। তখন আর পশ্চিমদিকে ফিরে দেশে চলে আসার কোনো সম্ভাবনা না থাকায় তিনি উত্তরদিকে অগ্রসর হন এবং নী-হাই (নীল সমুদ্র) তটে গিয়ে পৌছান। ওই জায়গা তুর্কদের দেশ থেকে ৭০০লি (সওয়া দুই হাজার মাইলের কিছু বেশি) দূরে অবস্থিত ছিল। সেখানেও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি না থাকায়, তিনি ৫৫৮ খ্রিস্টাব্দে চীনের উত্তরে ছী রাজবংশের (৫৫০-৫৭৭খ্রিঃ) রাজধানী হোনাতে (য়েহ) পৌছান। সম্রাট বেন্‌শুয়েন (৫৫০-৫৫৯খ্রিঃ) তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে ছিলেন এবং থিয়েন পিঙ বিহারে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন। চীনে রাজবংশের অধিকারে যে সমস্ত সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাদি ছিল সেগুলিকে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদের জন্য তাঁর কাছে পাঠানো হয় এবং বেশ কয়েকজন সে দেশীয় বিদ্বান পণ্ডিতকেও তাঁর সহায়তার জন্য দিয়েছিলেন।

'চীনে আসার কিছুকাল পরেই তাঁকে সে দেশের বৌদ্ধ সংঘের উপনায়কের পদ প্রদান করা হয়, তারপর প্রধান নায়কের পদ দেওয়া হয়। এই পদে থাকাকালীন তিনি যা কিছু সম্পদ পেতেন তার অধিকাংশ ব্যয় করতেন দরিদ্র ও পীড়িত মানুষের কল্যাণের জন্য। তিনি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য অনেক কূপ খনন করেন, অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য সাধারণ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া চিন-জুনের পশ্চিমে পর্বতের ওপরে তিনটি বিহার নির্মাণ করেন। তুর্করা ঠাঁই নিয়েছে এমন সরাইখানায় তিনি যখন যেতেন তখন তিনি তাদের বোঝাতেন যে তারা যেন মাসে অন্তত ছ'দিন নিরামিষভোজী থাকে এবং আহার্যের জন্য তাদের ছাগল-ভেড়া না মারে। একবার তিনি অসুস্থ হলে সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী স্বয়ং তাঁকে দেখতে এসেছিলেন।

১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে ছী রাজবংশকে উত্তরের চাওবংশ (৫৫৭-৫৮১খ্রিঃ) ধ্বংস করে। সম্রাট বুক ছিলেন তাউ ধর্মের অনুসারী এবং প্রচণ্ড বৌদ্ধধর্ম বিদ্বেষী। এরকম পরিস্থিতিতে নরেন্দ্র যশ তাঁর ভিক্ষুবেশ ত্যাগ করে সাধারণ গৃহস্থের পোশাক পরতে বাধ্য হন। প্রাণরক্ষার জন্য তাঁকে বিভিন্ন স্থানে অনেক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। এই অত্যাচার ততদিন ধরে চলেছিল যতদিন না সুই রাজবংশের (৫৮৯-৬১৮ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠা হয়। সুই রাজবংশের আমলে তিনি তাঁর হৃত প্রতিষ্ঠা ফিরে পান।'

ড. পা চাউয়ের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে নরেন্দ্র যশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়।

বহু ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই গ্রন্থের সাহায্যে সেই মহান ব্যক্তিকে যদি স্মরণ করা যায় তাহলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

মুসৌরী ১২.১১.৫৫ রাহুল সাংকৃত্যায়ন

বাল্য (৫১৮ - ৫২৭ খ্রিঃ)

পা-কু-লাই, বেলোর প্রদেশ থেকে আরম্ভ করে উদ্যান প্রদেশ পর্যন্ত লোকে সেতুর পরিবর্তে লোহার শিকল ব্যবহার করে। পাহাড়ি খাদের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হলে অনেক জায়গাতেই এরকম ঝুলন্ত সেতু ব্যবহার করতে হয়। এই শিকল পাহাড়ের গায়ে এক বিশেষ উচ্চতায় আটকানো থাকে। সেখান থেকে নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করলে পাহাড়ি নদীর স্রোতধারা দেখাও যায় না। কোনোভাবে একবার যদি শিকল হাত থেকে ছেড়ে যায়, তাহলে কয়েক সহস্র হাত নিচে পতন অনিবার্য। যখন এই অঞ্চলে জোরে বাতাস বয়; তখন ওই শিকলের সেতু পার হবার কথা কেউ কল্পনাও করেনা। পামিরের উচ্চ মালভূমি এই প্রদেশের (উদ্যান) উত্তরে অবস্থিত আর দক্ষিণে ভারতবর্ষ। এখানকার জলবায়ু সকালে ও সন্ধ্যায় নাতিশীতোষ্ণ, সুখদায়ক। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এই দেশ। এদেশের অধিবাসী আর তাদের উৎপাদিত বস্তু সামগ্রী উভয়ের মধ্যেই নানা বৈচিত্র্যের সমাহার। চীনদেশের লিন-জি প্রদেশের মতোই উর্বর এদেশের মাটি। কিন্তু এখানকার জলবায়ু সেখানকার চেয়ে অনেক ভালো। এদেশের রাজা নিরামিষভোজী আর উপোসথের দিন তিনি মৃদঙ্গ, বাঁশি, শঙ্খ, বীণা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সকালে ও সন্ধ্যায় বুদ্ধের আরাধনা করেন। দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হলে রাজকার্যে মনোনিবেশ করেন। এদেশে হত্যার মতো অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না, সঙ্গে কিছু আহার্য দিয়ে পার্বত্যাঞ্চলে নির্বাসিত করা হয়। যথাসময়ে এখানকার লোক নদী থেকে নালা কেটে চাষের জমিকে জলে ভরিয়ে দেয়। মাটির উর্বরতার গুণে মানুষের আহার্যের প্রায় সমস্ত বস্তুই এখানে যথেষ্ট জন্মায় এবং মূল্যও সুলভ। এই অঞ্চলে শাক-সব্জী এবং ফল প্রচুর জন্মায়। প্রতি সন্ধ্যায় সংঘারামের ঘণ্টাধ্বনি সমস্ত অঞ্চলকে মন্দ্রিত করে তোলে। শীত কিংবা গ্রীষ্ম, বারোমাসই এখানে নানা বর্ণের ফুল ফোটে, শ্রমণ এবং গৃহপতিরা সেই ফুলে বুদ্ধের আরাধনা করেন।

উপরে উক্ত পংক্তিকটি সেই বছরে (৫১৮ খ্রিঃ) মহাচীনের পরিব্রাজক সুঙ-উয়ান লিখেছিলেন, যে বছরে আমি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখি। এরও বিশবছর আগে আরেকজন চৈনিক পরিব্রাজক ফা-শীন (ফাহিয়ান) আমার মাতৃভূমি উদ্যানে এসেছিলেন। পরবর্তী কালে আমি নিজে চীনদেশে গিয়ে দেখেছি সেখানকার সাধারণ মানুষও ভ্রমণবৃত্তান্ত শুনতে ভালোবাসে, কারণ এর সাহায্যে তাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ে। এই বিষয়টি আমার দেশের পক্ষেও একটি অনুকরণীয় বিষয় হতে পারে। আমাদের দেশে মণ্ডলীর মধ্যে কথকতা শোনাবার রেওয়াজ আছে কিন্তু তার কাহিনির মধ্যে বাস্তবের চেয়ে কাল্পনিক বিষয়বস্তুর কদর বেশি। অনেক খ্যাতনামা পর্যটন আমাদের দেশেও জন্মেছেন। এখনো (৫৮৮খ্রিঃ) শুধু চীনদেশেই আমাদের কয়েক

সহস্র ভিক্ষু এবং পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন পথে বহু কষ্ট সহ্য করে এসেছেন। প্রতিবছর আমাদের মহাসংঘ চারটি দিশাতে ধর্মপ্রচারক পাঠায়। গন্তব্যস্থলে পৌছানর পক্ষে প্রতিটি পথই থাকে বিপদ সঙ্কুল। তাদের পূর্বজ যারা অতীতে এ পথে গিয়েছেন, তাঁরা যদি তাঁদের সুখ, দুঃখের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করতেন তাহলে পরবর্তী কালের যাত্রীদের পক্ষে তা কত উপকারে লাগত। আমাদের ধর্মপ্রচারকেরা সারাজীবন ধরে ধর্মপ্রচার করে অবশেষে বার্ধক্য সংঘারামে কাটান। অনেকে আবার সুদূর বিদেশের মাটিতেই অস্থি সমর্পণ করে চিরবিদায় নিয়েছেন। তাঁদের সেই অস্থির কিয়দংশ সংগ্রহ করে আমাদের সংঘ তার ওপরে স্তূপ নির্মাণ করেছে। ওই সব স্তূপ দেখে পরবর্তী প্রজন্মের তরুণেরাও ওই পথে যেতে উদ্বুদ্ধ হতো। আমি চৈত্যগিরি (সাঁচী) এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানে সেই সমস্ত মহাপুরুষদের স্মরণে প্রতিষ্ঠিত স্তূপ দর্শন করেছি। আমাদের সংঘে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই পর্যটন বা দেশ ভ্রমণে উৎসাহ দেওয়া হয়। সেই প্রেরণা থেকেই আমি সারাজীবন ধরে বিশ্বের যতগুলি সম্ভব দেশে নিজের পদচিহ্ন আঁকার চেষ্টায় রত আছি।

আমার পূর্বসূরীদের মতো আমিও যদি বিষয়টিকে উপেক্ষা করতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমি আমার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখতাম না। আমার চৈনিক বন্ধুদের কাছেই শিখেছি যে আগামী প্রজন্মের জন্যই আমাদের পরিব্রাজকদের উচিত নিজেদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখে যাওয়া। যদিও আমার নিজের মনে হয় না যে আমার এই লেখা আমার দেশবাসীর কাছে পৌছাবে এবং আমার পরবর্তী প্রজন্ম এর দ্বারা কোনোভাবে উপকৃত হবে।

আমার জন্ম হয়েছে সেই উদ্যানভূমিতে যার সম্বন্ধে সুঙ-উয়ান অনেক প্রশংসাবাক্য বলেছেন। প্রবাসে বসেও আমি তাঁর সেই প্রশংসাবাক্য বারবার পড়ি। নিজ মাতৃভূমি সকলের কাছেই প্রিয়, এবং সেই কারণেই আমি কোনো দেশেরই নিন্দা করি না, তবে উদ্যান যেন সত্যি সত্যি স্বর্গের উদ্যান। আমার দেশের উত্তরে কর্পূরশ্বেত বর্ণের হিমাচ্ছাদিত উত্তুঙ্গ শিখর শ্রেণীকে কত মনোহর লাগে। প্রথমবার শৈশবের দৃষ্টিতে যখন ওই গিরিমালাকে দেখেছিলাম, তারপর থেকে সত্তর বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু স্মৃতিপটে আজও সেই দৃশ্য তেমনই অম্লান, তেমনই সুন্দর হয়ে আছে। এই কাহিনি যখন লিখছি তখন আমার কয়েকশত পর্বত এবং কয়েকশত দেশ দেখা হয়ে গেছে। বিশ্ব কতই না বৈচিত্র্যময়। সিংহলদ্বীপে দেখেছি বছরে মাত্র দুটি ঋতু, গ্রীষ্ম এবং বর্ষা। সে দেশে একমাত্র শ্রীপাদ পর্বতশিখর ছাড়া অন্য কোথাও বিন্দুমাত্র শীতের লক্ষণ অনুভূত হয়না। উদ্যানে আমরা যেরকম গ্রীষ্মের দিনেও পশমের বেশভূষা ব্যবহার করি ঠিক তেমনই সিংহলের লোকেরা শীতেও গ্রীষ্মের বেশভূষা ব্যবহার করে। সিংহলের ভিক্ষুরা যেভাবে তাদের ডান কাঁধ উন্মুক্ত রেখে চীবর পরে, আর নগ্নশিরে থাকে, উদ্যানে শীতের ঋতুতে ওরকম অবস্থায় থাকার অর্থ সরাসরি মৃত্যুকে আহ্বান করা। উত্তরাখণ্ডের দিকে ভ্রমণের সময় আমি এমন দেশেও গিয়েছি, যেখানে সমতলে শীত সমুদ্রের (বৈকাল হ্রদ) তটভূমিতে গ্রীষ্মকালেই এত ঠাণ্ডা যা ভাবা যায় না। এরকম অবস্থায় সেখানকার শীতকালের অবস্থা তো অকল্পনীয়। উদ্যানভূমির কথা আমার প্রতি মুহূর্তেই মনে পড়ে। মাঝে মাঝে ভাবি, আমার সামান্য কখানা দেহাস্থি যদি মাতৃভূমিতে

বিসর্জিত হতো, কিন্তু তথাগতর শিক্ষা 'তত্‌কুতোত্রলভ্যঃ'। কোনো রকম আসক্তি ভিক্ষুর পক্ষে অনুপযুক্ত। কিন্তু আমার জন্মভূমির স্মৃতিচারণা থেকে নিজেকে কিভাবে নিবৃত্ত করি? কোনো এককালে উদ্যানকে সুবাস্তু নামেও ডাকা হতো। এখনও আমার দেশের প্রধান একটি নদীর নাম সুবাস্তু (স্বাত)। পরবর্তীকালে গান্ধার দেশে গিয়ে সুবাস্তু নামের আরেকটি অর্থ জানতে পারি। সুন্দর সুন্দর বাস্তুর (গৃহ) জন্যই এই নামকরণ; আবার মধুর স্বাদের ফলের বাগানের জন্য এদেশের নাম ছিল উদ্যান। যদিও কপিশার (কাবুল) আঙুর সমগ্র জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষ) খ্যাত। কিন্তু আমার মনে হয়না তা আমাদের উদ্যানের আঙুরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তবে আমাদের দেশের আঙুর কপিশার আঙুরের মতো প্রচার পায়নি, এবং তার কারণ আমাদের দেশের দুর্গমতা। উদ্যান থেকে অন্যত্র আঙুর রপ্তানি করা ছিল খুব কঠিন কাজ।

মধ্যমণ্ডলের ভিক্ষুরা আমাদের দেশের শীতের তীব্রতার কথা শুনে এদেশের নাম দিয়েছিলেন তুষার (তুখার) এবং এই শীতের ভয়েই তাঁরা আমাদের দেশে আসার সাহস করতেন না। পরবর্তী সময়ে আমার মুখে উদ্যানের ক্ষীরবাহিনী নদী আর অমৃত মধুর স্বাদের ফলের কথা শুনে অনেকে উৎসাহিত হয়েছেন। শুধু জলবায়ু কিংবা আবহাওয়ার কথা জানাই কি একটা দেশকে জানার পক্ষে যথেষ্ট? আমার দেশের অধিবাসী কিংবা বর্তমানে আমার নিবাসস্থল ছাঙ-আন মহানগরীর বাসিন্দারা কি কল্পনা করতে পারবে যে মধ্যমণ্ডলে বারাণসী কিংবা জেতবনে গ্রীষ্মের ঋতুতে কিরকম আগুনের ভাঁটার মতো উত্তাপ অনুভূত হয়? আমরা উদ্যানের অধিবাসীরা তিনটি ঋতুতে তিনটি পৃথক অঞ্চলে বাস করতাম। শীতকালে বাসস্থান হতো দেশের বড়ো বড়ো নদীর নিম্ন অববাহিকায়, কিংবা গভীর অরণ্যে, যেখানে গাছের পাতা চিরসবুজ, কখনও তুষারপাত হয় না। বসন্তের আগমন বার্তা ঘোষিত হলেই তুষার গলতে আরম্ভ করে, কর্ষণভূমি তুষারমুক্ত হয়, চিরহরিৎ নয় এমন বনাঞ্চলে নতুন পাতা জন্মাতে থাকে, তখন আমরা পাহাড়ের ওপরের দিকে আমাদের সাবেক গ্রামে ফিরে যাই। তবে আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল উদ্যানের পয়ার (অধিত্যকা) যেটা ছিল উত্তুঙ্গ পর্বতের পৃষ্ঠদেশে এবং বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলের তুষার গলতে অনেক সময় নেয়, প্রায় বর্ষার কাছাকাছি। এই পয়ার অঞ্চল যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে তার কিছু আগেই বড়ো বড়ো গাছের ভূমির শেষ। এখানে শুধুই তৃণভূমি। এই দীর্ঘাকৃতির ঘাসের জঙ্গলে আমাদের পশুপাল চড়ে বেড়াত। এখানকার ঘাস ছিল অত্যন্ত পুষ্টিকর। প্রবাদ আছে যে, এই ঘাস খেয়ে মাঝে মধ্যে ভেড়ার দল এত মোটা হয়ে যায় যে শরীরের চামড়ার আবরণ তাদের দেহের মাংস আর ধরে রাখতে পারে না, পাকা ফুটির মতো ফেটে যায়। আমাদের দেশের দেবদারু অরণ্যও মানুষকে মোহিত করে। তথাগত বোধিবৃক্ষের (অশ্বত্থ) নিচে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন, সে জন্য আমরা চিরকাল বোধিবৃক্ষকে পুজো করে আসছি। আমাদের দেশেও বোধিবৃক্ষ লাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে অনেকবার কিন্তু আবহাওয়ার কারণে একটিও বাঁচেনি। এখন অশ্বত্থ গাছের পাতার সঙ্গে খানিকটা মিল আছে, এমন গাছকেই আমাদের দেশের লোক বোধিবৃক্ষ বলে মেনে নিয়েছে। প্রকৃত বোধিবৃক্ষ জম্বুদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মায়।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বোধিবৃক্ষের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তার কোমল পাতা কত সুন্দর, বিশেষত সেগুলি যখন মন্দ মন্দ বাতাসে আন্দোলিত হয় তখন কত নয়নাভিরাম লাগে। তবে একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে উদ্যানের দেবদারু সত্যি সত্যি যেন দেবতাদের দারু (কাঠ)। উদ্যানের সেই দীর্ঘকায় আকাশছোঁয়া দেবদারু গাছের কাছে এখানকার হ্রস্বাকৃতির দেবদারু গাছগুলিকে দেখলে মনে হয় যেন কুবেরের পাশে এক কপর্দকশূন্য ভিক্ষুক। দেবদারুর অরণ্যে পাতা ঝরে ঝরে মাটির ওপরে এক সবুজ গালিচা বিছিয়ে রাখে, একটা ভেজা সুগন্ধ ছড়িয়ে থাকে চারদিকে। দেবদারু কাঠ আমাদের গৃহকর্মে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হতো। আমাদের বাড়িতে তো দেয়ালও তৈরি হয়েছিল পাথরের পরিবর্তে দেবদারু কাঠে। শৈশব থেকে শুকনো দেবদারুর সুগন্ধ নাকে নিয়ে এত বড়ো হয়েছি, এখানেও ছাঙ-আন নগরীতে একটি দেবদারু কাঠে নির্মিত কুটিরেই আমার বাস, কিন্তু এখানকার কাঠে সেই সুগন্ধ কোথায়? আমার স্মৃতি কি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে? নাকি নাবালক বয়সের সমস্ত ভালোলাগা স্মৃতিকেই এই পরিণত বয়সেও খুঁজে বেড়াচ্ছি?

আমি হয়তো আমার দেশ সম্বন্ধে একটু বেশি বলে ফেলছি। প্রত্যেক জাতি বা দেশের গুণাবলী বিচারের জন্য আলাদা আলাদা মানদণ্ড আছে। যেমন আমাদের দেশ উদ্যানে, দূরত্ব মাপার জন্য ক্রোশ অথবা যোজন শব্দ ব্যবহৃত হয়, আবার মহাচীনে সেই দূরত্ব মাপার জন্যই ব্যবহৃত হয় লী শব্দ। আমাদের দেশের এক ক্রোশ এদেশের প্রায় চার লীর সমান। আমাদের দেশে গৌরবর্ণ, সোনালী চুল, নীলাভ চোখ সৌন্দর্যের একটি মাপকাঠি, কিন্তু মহাচীনের লোক একে বলবে মর্কট সদৃশ চেহারা। উন্নত তীক্ষ্ণ নাসিকা আমাদের কাছে গৌরবের কিন্তু এদেশে তার তুলনা ভেড়ার সঙ্গে। বিভিন্ন দেশের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যেও কত বৈচিত্র্য। মগধের গন্ধশালী (বাসমতী) চালের সুনাম সর্বত্র, কিন্তু আমার কাছে আমার দেশের গমের রুটির তুলনায় তা কিছুই না। আমরা সিদ্ধ মাংস লবণ সহযোগে যে তৃপ্তির সঙ্গে খাই তাতে মগধবাসীরা আশ্চর্য হবে, কারণ তাদের পছন্দ শূল্য পক্ক মাংস কিংবা ভর্জিত মৎস। সঙ্গীতের বেলাতেও তাই। আমরা বীণার মধুর মূর্ছনায় মুগ্ধ হই আবার মহাচীনে এই বাদ্যযন্ত্রটিকে নেহাতই সাধারণ জ্ঞান করা হয়।

উদ্যানের অধিবাসীরা রঙ রূপের দিক থেকে সাধারণত সুন্দর হয়ে থাকে যদিও চীনা পরিব্রাজকদের দৃষ্টিতে আমাদের সঙ্গে মধ্যমণ্ডলোর লোকের বিশেষ পার্থক্য ধরা পড়েনি। যদিও মধ্যমণ্ডলে যাকে গৌরবর্ণ বলা হয়, আমাদের দেশে লোকে তাঁকে নিঃসঙ্কোচে কালো বলবে। পরবর্তীকালে আমি মধ্যমণ্ডলে গিয়ে শুনেছি এবং যা শুনে আমি আমার হাসি সংবরণ করতে পারিনি, তা হলো, গর্ভবতী অবস্থায় মা যদি শাকাহার করে তাহলে শিশুর রঙ কালো কিংবা শ্যামল হবে, আর যদি পায়সান্ন আহার করে তাহলে শিশু গৌর বর্ণের হবে। আমাদের দেশে একজন কালো রঙের লোক পাওয়া দুষ্কর, কিন্তু শাকসব্জীর মরসুমে গর্ভবতীরা যথেষ্ট পরিমাণ শাকাহার করেও থাকে। আসলে রঙ, রূপ ইত্যাদি বিষয়গুলো বংশানুক্রমিক। চীনা এবং তুর্কদের মধ্যেও কালো রঙের মানুষ দেখা যায় না, কিন্তু তাদের নাক চাপা, গালের হনু ওপরে ওঠা, চক্ষু

অর্ধস্ফুটিত এবং তির্যক, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রু গুম্ফের আধিক্য নেই। এগুলো বংশানুক্রমিক ছাড়া আর কি? দেশভ্রমণে মানুষের অনেক ভ্রান্তি দূর হয়। এজন্যই কূপমণ্ডূকতাকে অজ্ঞানতার একটি পর্যায় বলা হয়।

উদ্যানের অপেক্ষাকৃত শীতপ্রবণ এলাকাতেই আমার বাস ছিল। আমাদের গ্রামের অদূরেই ছিল কুমার ও সুবাস্তুর মতো বড়ো নদীর উৎসস্থল। যে হিমাচ্ছাদিত শিখরটিকে আমরা নিত্যদিন দেখতাম তারই দুপাশ থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে নদী দুটি। সুবাস্তুর একটি ছোট উপনদী প্রবাহিত হয়েছিল আমাদের গ্রামের কোল ঘেঁসে। উপলখণ্ডে ভরা নদীতে জলকে সব সময় সফেন দুধের মতো দেখাত। ছেলেবেলায় ভাবতাম সত্যি সত্যি দুধ। কিন্তু অঞ্জলি ভরে হাতে নিলেই স্বচ্ছ জল। কিছুটা নিচে নদীর বুকে কুণ্ডের মতো সৃষ্টি হয়েছিল, যেখানে গ্রীষ্মের দিনে আমরা স্নান করতাম, সেখানকার জলের বর্ণ ছিল ঈষৎ নীলাভ কখনো বা সবুজ। শীতকালে পরিবারের সকলে মায় গৃহপালিত পশুদের নিয়ে আমরা নিচে নেমে যেতাম। আমার সেই যাত্রা ভালো লাগতনা বলে মা আমাকে কোনো কোনো বছরে মামার বাড়িতে নিয়ে যেতেন। সেখানে তিন-চার হাত উঁচু হয়ে তুষারপাত হতো আর আমরা ছোটরা সেই তুষার নিয়ে মজার মজার খেলা খেলতাম। আমাদের গ্রামে অবশ্য এর চেয়ে বেশি বরফ পড়ত এবং সেই কারণেই আমরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যেতাম। সে সময় পশুদের জন্য এক টুকরো তৃণখণ্ড জোটানও দুষ্কর হয়ে ওঠে।

আমার বাবা ছিলেন তাঁর ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং সে কারণে সকলের প্রিয়। ঠাকুর্দাকে আমি দেখিনি তবে ঠাকুমাকে আমার ভালোই মনে আছে। তাঁর মাথার চুল ছিল তুষারশুভ্র। তখন তাঁর বয়স সত্তরের কাছাকাছি কিন্তু সেই বয়সেও চেহারায় জরার চিহ্নমাত্র ছিলনা এবং অন্যদের তুলনায় তিনি ছিলেন দীর্ঘাঙ্গী এবং স্বাস্থ্যবতী। তাঁর কাছে আমি নানা ধরনের গল্প শুনতাম। আমার বাবার দুই ভাই ভিক্ষু হয়ে গিয়েছিলেন আর অবশিষ্ট ভাইয়ের ছিল দুই মেয়ে। পরিবারে প্রথম পুত্র সন্তান হিসাবে জন্মানোর সুবাদে সকলের সম্মিলিত স্নেহ ভালোবাসা অকৃপণভাবে আমার ওপরে বর্ষিত হতো। পরে আমার আরও দুটি ভাই জন্মগ্রহণ করে, এবং তাদের অনুগ্রহেই বলতে গেলে আমার ভিক্ষু হবার সুযোগ হয়। তথাগত পিতামাতার আজ্ঞা ব্যতিরেকে ভিক্ষু হওয়া নিষেধ করেছেন, আর আমি যদি আমার বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান হতাম তাহলে কখনোই তাঁরা আমাকে প্রবজ্যা নেবার অনুমতি দিতেন না। আমার সর্ব কনিষ্ঠ ভাইটির জন্মের পরই আমার মায়ের মৃত্যু হয়। মায়ের অভাব আমাকে সব সময় কষ্ট দিত যদিও ঠাকুমা সাধ্য মতো চেষ্টা করতেন আমার কষ্ট লাঘব করতে। মায়ের মৃত্যুর পর বাবা পুণর্বিবাহ করেন। সচরাচর বিমাতাদের সম্পর্কে যে সমস্ত নিন্দামন্দ প্রচলিত আছে, আমার নতুন মায়ের মধ্যে সে সব কিছু ছিলনা, এর একটা কারণ ছিল, সম্পর্কে আগে তিনি ছিলেন আমার মাসি। মায়ের খুড়তুত বোন।

উদ্যানের অধিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে তথাগতর অনুগামী। উদ্যানের প্রতিবেশি, পূর্বে কাশ্মীর, দক্ষিণে গান্ধার, পশ্চিমে কপিশা, কম্বোজ ইত্যাদি দেশেও তথাগতর (বৌদ্ধ) অনুগামীর সংখ্যাই বেশি, যদিও সেখানে অন্য ধর্মমতের মানুষও বসবাস করে। প্রথম

দিকে আমার ধারণা ছিল যে তথাগতর উজ্জ্বল স্বরূপ এবং স্বচ্ছ সুন্দর শিক্ষার জন্য উদ্যানের মতো বিশ্বের সব মানুষই তাঁর মত ও পথের অনুসারী। আমি যখন আমার উপাধ্যায়ের কাছে বিভিন্ন গ্রন্থ পড়তাম, 'ব্রাহ্মণ' ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থের আলোচনা করতাম, তখন আমি বুঝতে পারতাম না যে বিষ্ণু কি বস্তু কিংবা মহেশ্বর কিরকম দেবতা। উদ্যানে অন্য ধর্মের কোনো দেবালয় বা গ্রন্থ কিছুই ছিল না। উদ্যানে সামান্য সংখ্যক ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষ ছিলেন কিন্তু তাঁরাও তথাগতরই উপাসক ছিলেন। বিশেষত্ব শুধু এটুকুই ছিল যে তাঁরা ছিলেন আমাদের খুব সম্মানের পাত্র। উদ্যানের বাকী সমস্ত অধিবাসীরাই ছিল ক্ষত্রিয়। এছাড়া আমাদের ওখানে গ্রীষ্মের দিনে কিছু শিল্পকারেরা আসত যারা বর্ণের দিক থেকে আমাদের মতো ছিল না, তাদের আমরা বলতাম শূদ্র। এরা আমাদের জন্য তীরের ফলা, তরবারি প্রভৃতি তৈরি করে আনত। চাষের কাজকর্মে লাগে এমন যন্ত্রপাতি কোদাল, কুড়ুলও তারাই বানাত। এদের মধ্যে আবার কিছু লোক ধাতুর বাসনপত্র এবং সোনা রূপার অলঙ্কার তৈরি করত। তবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাঠের বাসনপত্রই ছিল বেশি। বিচার করে দেখলে আমাদের সমাজে তিনটি বর্ণের উপস্থিতি ছিল, বৈশ্যদের কথা কেবল পুঁথিপত্রতেই পেতাম। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় উভয় বর্ণের লোকেরাই ছিল। আমাদের পরিবার ছিল ক্ষত্রিয়। কিছু ক্ষত্রিয় পরিবার নিজেদের শাক্যমুনির বংশধর বলে বেশি কৌলীন্যের দাবি করত। প্রকৃতপক্ষে তারা শাক্যবংশীয় ছিলনা, তুষার দেশ থেকে আসা শক জাতির বংশধর। এই শকেরা একসময় বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেছে। ধর্মরাজ কণিষ্ক এই শক বংশেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর তৈরি বিশাল চৈত্য, সংঘারাম আমি অনেকবার দর্শন করেছি। এখন শকজাতির সেই গৌরব অস্তমিত, তাদের নতুন ধারার নাম হয়েছে যেথা (যন্তা)। যেথাদের নিষ্ঠুরতার অনেক কাহিনি আমার ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম। তবে অতীতের সেই নিষ্ঠুরভাব এখন যেথাদের মধ্য থেকে অনেকটাই অন্তর্হিত হয়েছে। যেথাদের মধ্যে কারও কারও রঙ ছিল আমাদের উদ্যানবাসীদের চেয়েও সাদা এবং তারা ছিল যোদ্ধা জাতি। বীরত্বের প্রশ্নে উদ্যানবাসীরাও কম যেতনা। সেজন্যই আমাদের দেশকে করদরাজ্য হিসাবে দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগত যে এত বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও আমাদের অবস্থা এরকম কেন? আমাদের সংখ্যাল্পতাই মনে হয় এর প্রধান কারণ ছিল। আমার ঠাকুমা যেথারাজ তোরমানের খুব প্রশংসা করতেন, বলতেন 'তোরমান ছিল ধর্মরাজ কণিষ্কের অবতার।' কিন্তু তাঁর পুত্র মিহিরকুলের (৫০৮-৫৪৭ খ্রিঃ) খুব নিন্দা করতেন। মিহিরকুলের শাসন কালেই আমার জন্ম হয় এবং তাঁর মৃত্যুর (৫৪৭ খ্রিঃ) তিনবছর পর আমি আমার জন্মভূমিকে চিরবিদায় জানাই। তরুণ বয়সে হয়তো মিহিরকুল বেশ অত্যাচারী ছিল, কিন্তু কাশ্মীরে আমি যখন তাকে দেখেছি তখন সে আগের মতো ছিল না, তাছাড়া তাঁর শাসনাধীন রাজ্যেই আমরা বাস করতাম। আমাদের উদ্যানের অনেক তরুণ যুবক তাঁর সৈন্যবাহিনীতেও ছিল। আমাদের রাজ্যের সীমানার বাইরে গেলে লোকে আমাদেরও বলত যেথা কিংবা হুণ। যতদিন পর্যন্ত আমি মহাচীনে যাইনি ততদিন পর্যন্ত আমি নিজেও ভাবতাম যেথা আর হুণ একই জাতি। কিন্তু এখন জানি যে হুণেরা আদতে তুর্কদের পূর্বজ এবং চেহারার দিক থেকে চীনাদের

সঙ্গে তাদের প্রভূত মিল ছিল যদিও তারা ছিল চীনের মহাশত্রু। চীনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে এই হুণদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই নির্মিত হয়েছিল যোজন বিস্তৃত চীনের মহাপ্রাচীর। হুণেরা শকদেরও তাদের রাজত্ব থেকে উচ্ছেদ করেছিল। যে সমস্ত শক দেশ ত্যাগ না করে হুণ অঞ্চলে থেকে গিয়েছিল, পরবর্তী কালে তাদের জীবনযাত্রায় প্রচুর পরিমাণে হুণদের প্রভাব পড়েছিল। সুযোগ পেলে নিষ্ঠুরতায় এরা হুণদেরও টেক্কা দিত সেইজন্য লোকে এদেরও হুণ ভাবত। আমি যে সমস্ত যেথা সামন্ত প্রভু, সৈনিক সর্বোপরি মিহিরকুলকে দেখেছি তাতে মনে হয়েছে হুণ বা তাদের পরবর্তী তুর্কদের সঙ্গে এদের মিল প্রায় নেই বললেই হয়। আমাদের মতো তাদেরও ছিল উন্নত নাসা, তেমনই কেশ শ্মশ্রু গুম্ফ ইত্যাদি। 'বিজিতাবণি অ বণিপতি শ্রীতোরমান'-এর মুদ্রা দেখলে বোঝা যায় যে তারা প্রকৃতপক্ষে হুণ ছিল না। বস্তুত পক্ষে যেথারা শকদেরই একটি শাখা যাদের বীর নেতা কেদার তাঁর দিগ্বিজয়ের পথে কুষাণ সাম্রাজ্য অধিকার করে মধ্যমণ্ডলের দূরদূরান্তে আক্রমণ চালিয়েছিল।

আমাদের দেশের অনেক লোক তো জানেই না, কে মিহিরকুল, কে তোরমান, কিংবা উদ্যানের বাইরে আর কোনো রাজা আছে। উদ্যানের রাজাই ছিল তাদের কাছে শেষ কথা। আমরা উদ্যান রাজধানীতে তথাগতর জয়ন্তী উৎসবে রাজারাণীকে দেখতাম। তাঁরা ভক্তিভরে তথাগতর উপাসনা করতেন এবং ভিক্ষু সংঘকে আহার্য, বস্ত্র দান করতেন। রাজা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল ওই পর্যন্ত। রাজার আসনের পাশেই আরেকটি প্রতিষ্ঠিত আসনে আসীন এক সৈনিক পুরুষ সম্বন্ধে যখন বিশদভাবে জানলাম, তখনই বুঝলাম যে আমাদের রাজারও একজন রাজা আছে, তাঁর নাম মিহিরকুল, কাশ্মীরে বাস করেন, তাঁরই নামাঙ্কিত মুদ্রা আমাদের উদ্যানে ব্যবহৃত হয় এবং তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধির আজ্ঞা আমাদের রাজাকেও শিরোধার্য করতে হয়।

শৈশব, জীবনের মধুরতম সময়। আমি অনেক চেষ্টা করেও আমার স্মৃতিকে সেই শৈশবের দিনগুলিতে নিয়ে যেতে পারিনা। আবছা মনে পড়ে আমার চার বছর বয়সের সময় আমার একটি বোনের জন্ম হয়েছিল। তাকে দেখে আমার ঈর্ষা হয়েছিল মনে আছে, কারণ তার জন্মের আগ পর্যন্ত আমার মায়ের কোলে আমারই ছিল একাধিপত্য। দুবছর বয়স কালেই সে এই পৃথিবী ত্যাগ করে। তখন আমার খুব কষ্ট হয়েছিল মনে আছে। শৈশবের আর যা কিছু মনে আছে তার মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে যে তখন অন্ধকারকে ভীষণ ভয় পেতাম। অন্ধকার হওয়া মাত্রই, ঘরের প্রতিটি কোণ থেকে, গাছের প্রতিটি ছায়া থেকে ভয়াবহ সমস্ত ভূতেরা নেমে আসত। তবে ভূত পেতনীরা মন্দ হলেও দেবতা অপ্সরারা বিশেষ ভালো হয় এরকমই শোনা ছিল। ভূত পেতনীদের দেখার সাহস কিংবা ইচ্ছা কোনোটিই ছিলনা কিন্তু অপ্সরাদের দেখার আগ্রহ যথেষ্টই ছিল। যখন সর্বত্র শ্বেত গালিচার মতো তুষার ছড়িয়ে যেত, পূর্ণিমার চাঁদ উঠত এবং পেঁজা তুলোর মতো অবিরাম ঝরতে থাকা তুষার তার মুখ ঢেকে দিত কিন্তু জ্যোৎস্নাকে ঢাকতে পারতনা। এরকম পরিবেশে আমি আমাদের বাড়ি আর দেবদারু বনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটার দিকে অপলকে চেয়ে থাকতাম। এরকম রাত্রিতেই নাকি অপ্সরারা স্বর্গ থেকে নেমে আসে এবং তুষারের গালিচার ওপরে নাচগান করে। ভোরে

ঘুম থেকে উঠেই দেবদারু জঙ্গলের দিকে চলে যেতাম, যদি সেখানে অপ্সরার তাদের নৃত্যগীতের কোনো চিহ্ন রেখে যায়। তুষারের ওপরের ছোট ছোট পদচিহ্ন দেখতেও পেতাম। আমি সেগুলিকেই অপ্সরাদের পায়ের ছাপ বলে ভাবলেও অন্যেরা সেগুলিকে ভালুক, নেকড়ে কিংবা অন্য কোনো জন্তুর পায়ের ছাপ বলে আমার কল্পনার জগৎ ভেঙে দিত।

নয় বছর বয়স পর্যন্ত আমার জগৎ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। আমরা যখন শীতকালে আমাদের আস্তানা বদল করতাম তখন পথে রাজধানী উদ্যানপুরী পড়ত। সেই বয়সে আমার কাছে উদ্যানপুরীর চেয়ে বড়ো আর কোনো নগর ছিল না। উদ্যানপুরীতে অসংখ্য বিপণি ছিল এবং সেখানে নানা ধরনের জিনিস বিক্রি হতো। সে বয়সে আমার ভাগ্যে কখনো কখনো কোনো খেলার জিনিস কিংবা মিঠাই জাতীয় কিছু জুটে যেত। আমাদের গ্রামে চিনি, গুড় জাতীয় কিছুই পাওয়া যেতনা। আমিতো তখন মধুকেই একমাত্র মিষ্টি বলে জানতাম। উদ্যানপুরীতেই প্রথম জানতে পারি যে মধু ব্যতিরেকে একরকম গাছের রস থেকেও মিষ্টি পাওয়া যায়। ওখানেই জনৈক ভিক্ষু আমাকে তাঁর চীবরটি দেখিয়ে বলেছিলেন, সেটি পশমে তৈরি নয় একরকম গাছের উৎপন্ন ফল থেকে এর তন্তু নির্মিত হয়েছে। সেদিন ভিক্ষুর কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি, পরে পরিব্রাজনায় বেরিয়ে কার্পাসের গাছ দেখে বিশ্বাস হয়েছিল। আমাদের দেশে ভালোমতোই কৃষিকাজ হতো তবু জীবিকার মূল উপাদান ছিল পশুপালন। আমাদের প্রধান আহার্য ছিল রুটি। আঙুর এবং অন্যান্য ফল শুকিয়ে সারা বছর ব্যবহারের জন্য রাখা হতো। তবে সমস্ত কিছুর ওপরে মাংস ছিল আমাদের সবচেয়ে কাঙ্খিত খাদ্য। উদ্যানে তখনও বৌদ্ধ মহাযানপন্থার প্রচার তেমনভাবে হয়নি। বেশির ভাগ লোকই ছিল হীনযান অনুগামী। প্রকৃতপক্ষে উদ্যানের বাইরে গিয়েই আমি মহাযান পন্থার সঙ্গে সম্পর্কিত হই। তবে এই মতে আস্থাবান হতে আরও কিছু সময় লেগেছিল। তবে আমার মনে হয় উদ্যানে মহাযান মত একসময় সম্পূর্ণভাবে সফল হবে। হীনযান মাংসাহারকে হিংসার মধ্যে সম্মিলিত করেনা, মহাযান সেখানে সর্বাত্মক অহিংসার কথা বলে। এর ফলে দেশ কাল ভেদে উপাসকদের অনেক অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়। পরিব্রাজক জীবনে আমি একবার তুর্কদের আস্তানাতে অতিথি হয়েছিলাম, তখন অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও মাংসাহার পরিত্যাগ করতে আবেদন করেছিলাম। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম প্রাণীর প্রাণরক্ষার জন্য যিনি নিজের প্রাণোৎসর্গে সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, সেই তথাগতর চিন্তার অনুগামী হয়ে কি করে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবেও হিংসার অনুমোদন করতে পারি? তবে একথা ঠিক যে অহিংসা বিষয়ে মধ্যপন্থীদের সংখ্যাই বেশি। উদ্যানের লোকদের যদি সর্বতোভাবে মাংসাহার ত্যাগ করতে হয় তাহলে বিষম এক সমস্যা দেখা দেবে। কারণ সেখানে মাংস ছাড়া অন্য খাদ্যবস্তু যথেষ্ট অপ্রতুল। আমি নিজে মাংসাহার ত্যাগ করেছি বহুকাল এবং এখন আমার মনে এক উপলব্ধি হয়েছে যে আমি যেন দুঃখ সন্তপ্ত সমস্ত প্রাণীর প্রাণপণ সেবা করতে পারি। 'অবদান' এবং 'জাতক' কাহিনিতে তথাগত তাঁর বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন, কিভাবে অপরের উপকার করা আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ হতে পারে।

পশুপালনের জীবন

আগেই বলেছি যে উদ্যান একটি বৌদ্ধ দেশ। আমাদের এখানে আট বছর বয়সের বালকদের শ্রমণের এবং বালিকাদের শ্রমণেরি তৈরি করার প্রথা ছিল। প্রতি পরিবার থেকে অন্তত একজন ভিক্ষু সংঘে যোগ দিত। চার পাঁচটি গ্রাম মিলিয়ে একটি সংঘারাম ছিল। প্রতি পরিবার থেকে একজন ভিক্ষু সংঘে যোগ দেওয়ার ফলে সংঘারামে আত্মীয় সম্বন্ধের একাধিক জনকে পাওয়া যেত। আমার এক কাকাও ভিক্ষু ছিলেন। তিনি যখন ভিক্ষার জন্য আমাদের বাড়িতে আসতেন, তখন তাঁর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি এবং মধুর বাক্যে আমি খুবই প্রভাবিত হতাম। তাঁর নাম ছিল ভিক্ষু জিনবর্মা। আমার মা-বাবা তাঁকে পঞ্চপ্রতিষ্ঠিত (মাথা, দুই হাত এবং হাতের পাঞ্জা ভূমিতে স্পর্শ করিয়ে) হয়ে প্রণাম করতেন, যদিও তিনি বয়সে তাঁদের চেয়ে ছোট ছিলেন। প্রথমে তাঁকে আর পাঁচজন ভিক্ষুদের একজন বলে জানতাম, পরে জানতে পারি তিনি আমার কাকা। আমার সঙ্গে খেলাধূলা করত এমন কয়েকটি ছেলে সাত-আট বছর বয়সেই মস্তক মুণ্ডন করে তাম্রবর্ণের চীবর পরে শ্রমণ হয়ে সংঘারামে চলে গেলো। তাদের দেখে আমারও শ্রমণের হবার ইচ্ছে হয়েছিল। আমি ছিলাম আমাদের পরিবারের একমাত্র পুত্র সন্তান অতএব আমার মা-বাবা আমাকে ছাড়তে চাননি। এরপর আমাদের একটি ভাইয়ের জন্ম হয় এবং আমার মনের কথা বলতেই তিনি বলেছিলেন–'ধৈর্য ধরো, সময় হলে তোমাকে অবশ্যই নিয়ে যাব।' সেই সময় কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আসেনি।

আমরা হয়তো তুর্কদের মতো সম্পূর্ণরূপে যাযাবর ছিলাম না, আমাদের গ্রামগুলিও তাদের মতো তাঁবুর সন্নিবেশ মাত্র ছিলনা, আমাদের স্থায়ী বাড়িঘর ছিল। তবে আমরা বছরে যেহেতু তিনবার আস্তানা পালটাতাম, অতএব আমাদেরও আংশিক যাযাবর বলা চলত। যে গ্রামে আমরা বছরের বেশির ভাগ সময় কাটাতাম সেখানকার আস্তানা অন্য দুই জায়গার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল। চাষের জমিও সেখানে বেশি ছিল। গম, জোয়ার আর বাজরা মোটামুটি ফলত। চালের ব্যবহার ছিল একমাত্র পায়েস খাবার সময় এবং তা আসত গান্ধার থেকে। আমাদের চতুর্থ একটি আবাসও ছিল এবং সেটি ছিল সম্পূর্ণভাবেই বস্ত্রাবাস। সেখানকার জীবনযাত্রাও ছিল ভিন্ন ধরনের। এখানে আমাদের সকলে থাকতনা, বাছাই করা কয়েকজন থাকত এবং সেটাও বর্ষার সময়। এই তাঁবুর বসতি ছিল পাহাড়ের পয়ার ভূমিতে (অধিত্যকা)। এখানে কোনো বড়ো গাছতো দূরের কথা তিন-চার হাত উঁচু গুল্মও চোখে পড়ত না। আমাদের জীবনে দেবদারু ছাড়া আরেকটি গাছেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। সেটা হলো ভূর্জ গাছ। ভূর্জ গাছের ছাল দিয়ে তৈরি পাত্রে আমরা দৈ, মাখন ইত্যাদি রাখতাম, লেখাপড়ার কাজেও এই ছালের বহুল ব্যবহার হতো। পুঁথিপত্র এই ভূর্জছালের ওপরেই লেখা হতো। আমি যখন পাটলীপুত্রে অশোকারমে ছিলাম তখন সেখানকার ভিক্ষুদের অজ্ঞানতা দেখে অবাক হয়েছিলাম। তাঁরা ভূর্জছালকে ভূর্জ গাছের পাতা মনে করতেন। আমি অনেক বলাতেও তাঁরা তাঁদের ধারণার পরিবর্তনে রাজি হননি। তাঁরা বলতেন এটা যদি পাতা না হয় তাহলে একে ভূর্জপত্র বলা হয় কেন? তাঁদের কিছুতেই বোঝাতে পারিনি যে এটি

আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি, এবং ছুরি দিয়ে গাছ কেটে সেখান থেকে ভাঁজে ভাঁজে এই ছাল বের করাটা ছিল আমাদের অন্যতম প্রিয় খেলা। তাদের অনেক কষ্ট করে বোঝাতে হয়েছে যে ভূর্জপত্র নামটি আমাদের দেওয়া নয়। এই নাম যারা দিয়েছে তারা ভূর্জগাছ দেখেনি, তালপাতাতে লিখতে অভ্যস্ত এবং তালপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভূর্জপত্র নাম দিয়েছে।

শীত শেষ হতেই আমরা পয়ারের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করতাম এবং পক্ষকালের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যেতাম। আমাদের গ্রীষ্মকালীন আবাসস্থলে পশুখাদ্যের তেমন অভাব ছিল না, তবুও এই পয়ারে পশুচারণা আমাদের সমাজে বহুকাল ধরে চলে আসছে। এই পয়ারে দীর্ঘাকৃতির ঘাসের অরণ্যের মাঝে মাঝে বুনো গম গাছ যার দানা আমাদের চাষের গমের দানার চেয়ে আকারে ছোট কিন্তু স্বাদে গন্ধে ছিল একই রকমের। পয়ারে একটাই সমস্যা ছিল সেটা হলো জ্বালানি কাঠের। কাঠ আনতে তিন চার ক্রোশ নিচে নামতে হতো। পয়ার ভূমিতে নির্দিষ্ট করে সীমারেখা চিহ্নিত করা না থাকলেও সমস্ত পরিবারই আপন আপন সীমানা জানত। এখানকার বাসস্থান ছিল সামুদায়িক। আহার্য ইত্যাদি একই সঙ্গে তৈরি হতো, তবে উৎপাদিত মাখন আলাদা আলাদা করে রাখা হতো। গ্রাম থেকে আমাদের জন্য আসত আটা, ছাতু, নুন এবং সব্জী। পক্ষকাল থেকে একমাসের ব্যবধানে এই রসদ আসত আর সেই সঙ্গে সঞ্চিত মাখন, সঞ্চিত মাংস, চামড়া ইত্যাদি পাঠিয়ে দেওয়া হতো। ভেড়ার পশম অবশ্য গ্রামে ফিরে-গিয়ে ছাঁটা হতো। এখানে আমাদের দুধ, দৈ, মাখন, মাংসের অভাব ছিলনা, তেমনই পশুদেরও ঘাসের অভাব ছিলনা।

পয়ারের জীবন আমার কাছে খুবই আকর্ষক ছিল। যেবার বর্ষায় প্রথম বার ওখানে যাই, তখন থেকে আজ সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত সেই স্মৃতি মনে করে ঈর্ষান্বিত হই আর ভাবি আজও কি পয়ারের জীবন তেমন আনন্দ হট্টগোলে ভরা আছে? এখানে পশুদের সকালেই খুলে দেওয়া হতো, আর দিনের শেষে তারা নিজেরাই ডেরায় ফিরে আসত। যার দুধ দোয়ার থাকত তাকে সকালেই দোয়া হতো। আমরা ছেলের দল প্রাতরাশ সেরে পশুপালদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। পশুদের অবশ্য চালনা করার প্রয়োজন হতো না, তারা তৃণভূমিতে গিয়েই আহারে মন দিত। গ্রামের মতো এখানেও পশুপালের ঘাসের অভাব ছিল না। তুষার চিতা কোনো পশুকে দলছুট অবস্থায় পেলে মেরে ফেলত। তবে সংঘবদ্ধ অবস্থায় আমাদের বড়ো বড়ো শিংওয়ালা গাভী, ষাঁড় আর বলদের দল চিতাবাঘ সিংহ কাউকে কাছে ঘেঁসতে দিতনা। তবে আমাদের পশুপালের সবচেয়ে কঠিন শত্রু ছিল নেকড়ের দল। তাদের আক্রমণ থেকে পশুপালদের রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল আমাদের কুকুরদের ওপরে। কুকুরদের আমরা পালিত পশু মনে না করে পরিবারভুক্ত একজন বলে মনে করতাম। সকালে তারাও আমাদের সঙ্গেই প্রাতরাশ খেত। কালো, লম্বা লোমাচ্ছাদিত শরীর, পীতাভ চোখ, আকারে নেকড়েদেরই মতো, এ ধরনের কুকুরকে সকলেই ভয় পেত।

দুপুরের আহারের জন্য ডেরায় ফেরার কথা থাকলেও অধিকাংশ দিনই ফেরা হতো না। এর কারণ এটা নয় যে চারণভূমি আস্তানা থেকে অনেক দূরে ছিল। আসলে ওটাই

ছিল আমাদের খেলাধূলার সময়। খেলা ছেড়ে কে আর খেতে যায়। তাছাড়া পিঠের থলিতে গমভাজা, সিদ্ধ মাংস কিংবা রুটি থাকত, ক্ষুধা বোধ হলে এক জায়গায় বসে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করা হতো। এখানে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধুমাত্র আমাদের পরিবার বা গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতনা, অন্য গ্রামের ছেলেরাও আমাদের পংক্তি-ভোজে সামিল হয়ে বন্ধু হয়ে যেত। এভাবেই বিভিন্ন বয়স অনুসারে মণ্ডলী গড়ে উঠত। মেয়েরা কখনো নিজেদের পৃথক মণ্ডলী গড়ত কখনো বা তারা আমাদের মণ্ডলীতেই থাকত। আমাদের পশুপাল বিচরণ করত আপন মনে, কখনো ঘাস খেত, কখনো বা বিশ্রাম নিত। চারপাশ ঘিরে আমাদের পোষা কুকুরেরা তাদের পাহারা দিত। বিপদের আভাস পাওয়া মাত্রই তারা ডেকে উঠত এবং আমরা তখন আমাদের সমস্ত আলস্য ত্যাগ করে সেদিকে দৌড়াতাম। আমাদের কাছে আগুন জ্বালাবার চকমকি পাথর থাকত। মাঝে মধ্যে আমরা আমাদের কুকুরদের সহায়তায় খরগোস শিকার করতাম। শিকারে সাফল্য লাভ করলে সকলেরই খুব আনন্দ হতো এবং আগুনে ঝলসে শিকারলব্ধ খরগোসের মাংস খাওয়া হতো। সঠিক নিশানায় তীর নিক্ষেপ করা আমরা খেলার মধ্যে দিয়েই আয়ত্ত করেছিলাম। আমার লক্ষ্য ততটা সঠিক হতো না যতটা হওয়া উচিত, তবে আমার সঙ্গী ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই ছিল নির্ভুল নিশানাভেদে দক্ষ। দিনান্তে আমাদের বড়োরা নাচগানের আসর বসাত যেখানে অঢেল পানীয়েরও ব্যবস্থা থাকত। ওরকম আসরে আমাদের অংশ গ্রহণের অনুমতি ছিলনা, সেজন্য দিনমানে চারণভূমিতেই আমরা আমাদের গীতবাদ্যের আসর বসাতাম। আমরা ছেলেরা সকলেই অল্পবিস্তর বাঁশি বাজাতে জানতাম, আর গলায় সুর থাকুক না থাকুক, সকলের সঙ্গে স্বর মেলাতে কখনও পিছপা হতাম না। পশুচারণের সময় আমাদের আরেকটি কাজ করতে হতো সেটা হলো অবসর সময়ে পশমের সুতো কাটা। এমন এক জায়গায় বসে তকলি দিয়ে পশমের সুতো কাটা হতো যেখান থেকে পশুপালের দিকেও দৃষ্টি রাখা যায়। আমরা তকলি কাটতে কাটতে গলা ছেড়ে সুরে বেসুরে গান গাইতাম। আমাদের উদ্যানীদের কণ্ঠস্বরের মাধুর্যের খ্যাতি ছিল। বস্তুত শৈশব থেকেই গান আমাদের জীবনে জড়িয়ে থাকত। আমাদের সমবেত কণ্ঠের গান বহুদূর পর্যন্ত গুঞ্জরিত হতো।

ঋতুর হিসাবে সে সময়টা ছিল বর্ষাকাল। হঠাৎ হঠাৎ করে বৃষ্টি নামত। আমাদের সঙ্গে যে সমস্ত তাঁবু ছিল তা হয় ভেড়ার লোমের কিংবা ঘোড়ার চুলে বোনা থান দিয়ে তৈরি। একটানা বর্ষা হলে হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়ত। বুনো জন্তুর হামলার ভয়ও এসময়েই বেশি থাকত। প্রতিবছরই এভাবে কিছু পশু আমাদের খোয়াতে হতো, যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও সব কটিকে ফিরিয়ে আনতে পারা যেত না। তবে কখনো কখনো এমন হয়েছে যে আমাদের হৈ-হট্টগোল এবং আমাদের কুকুরদের তাড়া খেয়ে হামলাকারী জানোয়ার শিকার ফেলে রেখেই পালাতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের মধ্যে কিছু ধর্মভীরু মানুষ অন্য জন্তুর দ্বারা হত পশুর মাংসকে অধিকতর শুদ্ধ মনে করতেন, কারণ সেই মাংসে কোনো মানুষের প্রত্যক্ষ হিংসা জড়ানো নেই। তথাগতর অনেক উপদেশ আমরা ভিক্ষুদের মুখে শুনতাম, তা থেকেই বোধহয় এরকম ধরনের ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। এ

ধরনের মাংসের পরিমাণ বেশি হলে সকলকে ডেকে বিরাট ভোজসভা বসত। সেখানে মাংসের সঙ্গে চামড়ার চষকে ভরা গম অথবা জই থেকে তৈরি কাঁচা মদের অঢেল যোগান থাকত। তুর্কদের আগমনের আগ পর্যন্ত আমরা জানতাম না যে ঘোড়ার দুধের ঘোল থেকেও মদ তৈরি হয়। আমাদের প্রচুর ঘোড়া ছিল। যদিও তারা আকৃতির দিক থেকে কম্বোজ ঘোড়াদের মতো উন্নত ছিল না, কিন্তু তারা যথেষ্ট মজবুত এবং পরিশ্রমী ছিল। পাহাড়ের চড়াই পথে ঘোড়ার চেয়ে উপযোগী আর কিছু ছিলনা। আমরা চমরী পালন করতাম না। আমি পরবর্তীকালে শীত সমুদ্রের (বৈকাল হ্রদ) অঞ্চলে এই প্রাণীটিকে বহুল পালিত হতে দেখেছি। প্রথমে চমরীকে আমি হরিণ জাতীয় কোনো প্রাণী ভেবেছিলাম পরে জেনেছি ওগুলো মধ্যমণ্ডলের গৃহপালিত জন্তু মোষের সমগোত্রীয়।

পয়ারের জীবন কেবল পশুপালন কিংবা খেলাধূলার মধ্যেই সীমিত ছিল না। মাঝে মধ্যে ভদন্ত ভিক্ষুরা আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে আসতেন এবং আমাদের তথাগতর অমৃতমধুর উপদেশ শোনাতেন। এই ভিক্ষুদের অনেকে হয়তো কৈশোর জীবনে এই পয়ার ভূমিতে কাটিয়েছেন, তাই পরিণত বয়সে আমাদের আহ্বানে চড়াই ভেঙে পয়ার ভূমিতে আসতে তাঁরা সানন্দে রাজি হতেন। তাঁদের জন্য বিশেষ তাঁবু সংরক্ষিত রাখা হতো এবং আমরা তাঁদের আগমনে পঞ্চপ্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বাগত জানাতাম। বর্ষাকালে ভিক্ষুদের সাধারণভাবে পরিব্রাজনা নিষিদ্ধ, তবে এ ক্ষেত্রে নিয়ম কিছুটা শিথিল থাকত।

পয়ারের জীবন চার থেকে পাঁচ মাস পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হতো। আমাদের মনে হতো, এই সময় যেন চোখের নিমেষে কেটে গেলো। আস্তে আস্তে এক সময় বর্ষার ইতি ঘটত। বর্ষার তৃতীয় মাসের শেষ দিকে বাতাসে হিলের পরশ আমাদের জানিয়ে দিত যে এবছরের মতো পয়ার জীবন শেষ। সবুজ ঘাসের অরণ্যে এক আধটু হরিদ্রাভা দেখা দিলেই আমরা এখানকার পাট ওঠাবার কথা ভাবতে আরম্ভ করতাম। পয়ার জীবনে আমরা থাকতাম একটা বিশাল পরিবারের সদস্য হয়ে, কিন্তু গ্রামে ফিরে গেলে আবার আমরা খণ্ডিত হয়ে যেতাম। এই চার-পাঁচ মাসের উন্মুক্ত জীবন যাত্রার পর গ্রামের বাড়িতে সীমাবদ্ধ জীবন আমার ভালো লাগত না। সেই জন্য শীতের দিনে নিচে না নেমে আমি আমার মামার বাড়িতে চলে যেতে চাইতাম। পয়ার জীবনের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মাস ছিল অপার আনন্দের। এ সময় চারদিকে অনেক ফুলের বাগান সৃষ্টি হতো, যেখানে ছিল নানা রঙের মেলা। এক নীল রঙের মধ্যেই হয়তো দেখা যেত পঞ্চাশ রকমের বৈচিত্র্য অথবা লালের মধ্যে আরও বিশ ধরনের লালিমা। বিচিত্র ধরনের ফুল, বিচিত্র তাদের গঠন। কোনো ফুলে মদির সুগন্ধ, কেউ বা হয়তো গন্ধহীন, কিন্তু সৌন্দর্যে সকলেই ছিল অনুপম। কোনো কোনো ফুলের পত্রপল্লবের মধ্যেও বিচিত্র সুগন্ধ। আমরা এই ফুল নিয়ে খেলতাম, একে অপরকে বনদেবীর পুত্রকন্যারূপে সাজাতাম। শীতের আধিক্যের কারণে আমরা উদ্যানীরা নিয়মিত স্নান করতাম না। পরবর্তীকালে আমাদের এই অভ্যাসের জন্য অন্যদের কাছে অনেক বিদ্রূপ বাক্য শুনেছি। তাঁরা কেউ বুঝতে চাননি যে কী ভয়ঙ্কর শীত পড়ে উদ্যানে। সেই শীতের মধ্যে বাস করলে বিদ্রূপকারীরা হয়তো জীবনে কখনোই স্নান করতেন না। তবে পয়ারে

বৃষ্টির জন্য মাঝে মধ্যেই আমাদের অনিচ্ছাতেই স্নান হয়ে যেত। স্নানের পর আমাদের ত্বকের গোলাপি বর্ণ আরও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠত। চতুর্থ মাসের প্রারম্ভে যখন এই মনোরম ভূমি পরিত্যাগ করার কথা উঠত তখন আমরা দুঃখে অধীর হতাম। তবে আমাদের এই পয়ার জীবনের অবসান হঠাৎ একদিন হতো না। চতুর্থ মাসে আরম্ভ হয়ে পঞ্চম মাসের শেষাবধি ধরে চলত। প্রথমে নামত গাড়ি, বৃষ এবং বলদের দল, তারপর অশ্বপাল। সবার শেষে নামানো হতো মেষপালকে এবং সেই সঙ্গে অবশিষ্ট ডেরাডাণ্ডা গুটিয়ে নিচে নেমে আসা হতো। আমরা অনেক অনুনয় বিনয়, কান্নাকাটি করেও শেষ দলে থাকার অনুমতি পেতাম না, মেয়েরা নেমে যেত প্রথম পর্যায়ে, তারপর থেকে সমস্ত কাজই করতে হতো পুরুষদের। তাছাড়া রসদের পরিমাণও যেত কমে, অতএব লোকসংখ্যা যত কম রাখা যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হতো। হাতের কাছে থাকত ছাগল, ভেড়ার দুধ আর কিছু মাখন এবং মাংস। খাদ্যবস্তু বেঁচে গেলে তাকে বয়ে নিচে আনা হতো না। ওখানেই মাটিতে গর্ত করে, ভূর্জছাল বিছিয়ে তার মধ্যে রেখে আবার মাটি চাপা দেওয়া হতো। পরের মরশুমে যারা প্রথম দলে আসত, তারা এই খাবারকে যথাযথ অবস্থাতেই পেত। নিচে নামতে দেরি হলে আচমকা তুষারবৃষ্টি এসে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ত। অনেকবার এমনও হয়েছে যে আমরা নেমে আসার পরদিন থেকেই হিমবর্ষা শুরু হয়েছে। যে বছর আমাদের একটি পশুও না হারিয়ে আমরা সকলে নিরাপদে ফিরে আসতাম, সে বছর গ্রামে এই উপলক্ষে আনন্দ উৎসবের আয়োজন হতো।

প্রেম (৫৩৪–৫৩৫ খ্রিঃ)

পয়ারের জীবন, ভবিষ্যতে আমার ভবঘুরে জীবনে পাঠশালার কাজ করেছিল বলা যায়। মহাচীনে এসে এবং আসার পথে আমি কয়েক সহস্র ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। তাঁদের অনেকে দুর্গম মরুপথ, তরঙ্গ সঙ্কুল সমুদ্রপথ কিংবা দুর্লঙ্ঘ্য গিরিপথে বহু যোজন পথ অতিক্রম করেছেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনকেই পেয়েছি, যাঁদের আমার মতো পয়ার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল। অধিকাংশ ভিক্ষুরই জন্মস্থান কোনো নগর কিংবা তার উপকণ্ঠে এবং বাল্যে নিকটস্থ কোনো সংঘারামে বিদ্যাভ্যাস করেছেন। পরবর্তীকালে তাঁরা তাঁদের পরিচিত গণ্ডির বাইরে পদক্ষেপ করে দূর দূরান্তে পরিব্রাজনা করেছেন। পরিব্রাজনায় বের হয়ার আগে পর্যন্ত তাঁদের জীবন মোটামুটি একটা ছকে বাঁধা ছিল, বিপরীতে আমাদের উদ্যানীদের জীবন প্রথম থেকেই ছিল পরিশ্রমের এবং পর্যটনের। ছেলেবেলা থেকেই পিঠে বোঝা নিয়ে পাহাড়ি পথে ক্রোশের পর ক্রোশ পথ হাঁটা আমাদের কাছে ছিল নিত্ত-নৈমিত্তিক ব্যাপার। যত বড় হয়েছি পিঠে বোঝার পরিমাণও সেই অনুপাতে বেড়েছে। পয়ারের উচ্চতায় আমাদের শ্বাসকষ্ট হতো কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখের হাসি অমলিন থাকত।

আমি তখন শৈশব, বাল্য অতিক্রম করে তারুণ্যের ধাপে পা রেখেছি। অন্য সকলের মতো আমার জীবনযাত্রাও নিস্তরঙ্গ গতিতে প্রবাহিত হচ্ছিল। শীতে আমরা সপরিবারে যখন নিচে নেমে যেতাম তখন আমার ভিক্ষু কাকা জিনবর্মা সংঘারাম ছেড়ে

আমাদের বাড়িতে থাকতেন। তিনিই আমাকে অক্ষর পরিচয় করিয়ে কিছু পুঁথিপত্র পড়িয়েছিলেন। পয়ারে থাকার সময়ে সামান্য কিছু ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে পরিচিতি ঘটেছিল। কাকার মনোগত ইচ্ছা ছিল যে আমিও তাঁর মতো একজন ভিক্ষু হই। প্রথমদিকে ভিক্ষু জীবন আমারও অপছন্দের ছিল না। বিশেষত যখন জেনেছিলাম যে তথাগত নিজে এই জীবন পছন্দ করতেন, কিন্তু ঘটনাচক্রে সে দিকে আকর্ষণ কমে যায়। সব দেশেরই নিজস্ব রীতি রেওয়াজ আছে, এক দেশে যে রীতি বন্দিত আরেক দেশে সেটাই হয়তো নিন্দিত। পারসিক দেশে নিজ জননীকে বিবাহ করার প্রথা আছে। এমন বহুদেশ আছে যেখানে সহোদর ভ্রাতা ভগ্নীর বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। আমি ধর্মগ্রন্তে পড়েছি তথাগতর নিজের বংশও মূলত ভ্রাতা ভগ্নী বিবাহজাত সন্তানদের বংশ। সমস্ত ভাইদের একটি মাত্র স্ত্রী কেবল মহাভারতের কাহিনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই প্রথা আজও বহাল তবিয়তে বর্তমান, এমন দেশ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এই সব দেখার পর বিভিন্ন দেশের সংস্কার সম্বন্ধে আমার কোনো বিরূপ মনোভাব নেই। আমাদের উদ্যানের সরল স্বচ্ছন্দ জীবনে তরুণ তরুণীদের অবাধ মেলামেশায় কোনো বাধা ছিলনা। আগেই বলেছি যে সঙ্গীত আমাদের জীবনে শ্বাস প্রশ্বাসের মতোই প্রয়োজনীয় অনুভূত হতো। গানে আমি সুকণ্ঠ আর তেমন পারদর্শী না হলেও মোটামুটি নাচ জানতাম। তবে আমার ত্রুটি ছিল একটাই, আমি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মিতভাষী ছিলাম, সেই সঙ্গে কিছুটা লাজুক প্রকৃতির। এটা কোনো ত্রুটি কিনা জানিনা, তথাগতর উপদেশে একে আবার একটি মহৎ গুণ বলা হয়েছে, তবে তারুণ্যের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে লজ্জা, সংকোচ সেখানে বেশীক্ষণ বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। শরীরে, সামর্থে আমি আমার সঙ্গীদের চেয়ে এগিয়ে ছিলামনা ঠিকই তবে পিছিয়েও ছিলাম না। আমি আমার সমবয়সী বন্ধুদের পরিচালক ছিলামনা, কিন্তু তাদের ভালোবাসার একজন অবশ্যই ছিলাম।

সেটা বোধহয় বর্ষার তৃতীয় মাস। পয়ারে ঘাসের জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও পুষ্পোদ্যান সৃষ্টি হতো। আমরা ছেলেমেয়েরা সেরকম একটা পুষ্পোদ্যানের মধ্যে গানের আসর বসিয়েছিলাম। প্রেমিক প্রেমিকাদের গান গাওয়া চলছিল। বাদ প্রতিবাদের আকারে দুজনে গায় এই গান। সেদিন আমি আর ভদ্রা গান গাইছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম কুকুরের ডাক, এবং সেই সঙ্গে মেষপালের মধ্যে চাঞ্চল্যের শব্দ। আমরা গান ফেলে সেদিকে দৌড়ালাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। ভদ্রা এবং আমি দুজনেই গানের মধ্যে এত বেশি নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম যে বাস্তবে ফিরতে অন্যদের তুলনায় আমাদের কিছু বেশি সময় লেগে গেলো। ভেড়ার পালের পিছনে দৌড়তে দৌড়তেই ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়া আরম্ভ হয়ে গেলো। এরকম পরিস্থিতিতে পশুরা মানুষের মতোই উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দেয়। ভেড়ার দল ইতস্ততভাবে এদিকে ওদিকে পড়ে থাকা শিলাখণ্ডের আড়ালে আশ্রয় নিল। আমরাও তাদেরই মতো সুবিধাজনক শিলাখণ্ডের চাল খুঁজে নিলাম। আমার এবং ভদ্রার অন্য সঙ্গীদের জন্য উৎকণ্ঠিত হবার কোনো কারণ নেই, কারণ তারা নিশ্চয়ই যে যার মতো আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ছিল আর সেই সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। এই উদ্দাম প্রকৃতির মধ্যে আমরা

দুজনে নীরব। হঠাৎ তীব্র এক বিদ্যুৎ ঝলক এবং সেই সঙ্গে কড় কড় শব্দে বজ্রপাত। ভদ্রা ভয় পেয়ে আমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। আমি তার কাঁধে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে একটু সাহস যোগাবার চেষ্টা করলাম। তার শরীর স্পর্শ করা মাত্র আমার মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হলো। হঠাৎ করে আগুনে হাত পড়ার মতো অনুভূতি নয়, কারণ এর মধ্যে কোনো যন্ত্রণা ছিলনা, ছিল শুধু ভাষায় প্রকাশ করা যায়না এমন একটা ভাব। নানা ধরনের প্রেম কাহিনিতে শুনেছি যে তরুণ তরুণীদের মধ্যে এভাবেই হঠাৎ করে প্রেমের উন্মেষ ঘটে যায়। মধু নিয়ে সহস্রবার আলোচনা করলেও মধু কি বস্তু বোঝা যায় না, জিহ্বা যখন মধুর স্পর্শ পায় তখনই তার সুমধুর স্বাদের পরিচয় পায়। আমার হাতের স্পর্শ পাওয়া মাত্রই ভদ্রার সমস্ত উদ্বেগ শান্ত হয়ে গেলো। আমরা দুজন তারপর সেখানেই বসে পড়লাম, স্পর্শই সেদিন আমাদের মধ্যে বাণীর ভূমিকা পালন করেছিল।

উদ্যানে কয়েকটি অন্য জাতির লোক বাস করত, তারা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলত। এদের মধ্যে প্রধান ছিল খস্। তার পরের সংখ্যা শকদের তাছাড়া কিছু যেথাও ছিল। মিহিরকুল তোরমান জাতির লোক বলে এদের কিছু অভিমান ছিল, আবার সেই জন্যই শক এবং খস্ জাতির লোক যেথাদের সঙ্গে আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করত না। ভদ্রা ছিল শককুলের মেয়ে। উদ্যানের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল বৌদ্ধ। ভদ্রাদের কুলও তথাগতের উপাসক ছিল। শক এবং খস্ কুলের ভিক্ষুরা একই সংঘারামে থাকার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি শকদের প্রতি সম্ভ্রমশীল ছিলাম। পরবর্তী কালে ধর্মরাজ কণিষ্ক ও অন্যান্য শক রাজন্যবর্গের প্রতিষ্ঠিত সংঘারাম চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদি দর্শন করে সেই সম্ভ্রমবোধ আরও গাঢ় হয়েছিল। আদিতে শক এবং খস্ দুই ভিন্ন জাতি হলেও উভয় সম্প্রদায়ের ভাষা এক এবং পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধও প্রচলিত ছিল। শকরা খস্দের তুলনায় বেশি ফর্সা ছিল। অধিকাংশ শক কুমারীদের মতো ভদ্রাও ছিল নীলাক্ষী। বুদ্ধের রূপ বর্ণনায় তাঁকে বলা হয়েছে অপরাজিত ফুলের মতো নীলাক্ষ। সেজন্য শকদের আমি শাক্যদের গোষ্ঠীভুক্ত কোনো জাতি মনে করতাম। ভদ্রা অসাধারণ সুন্দরী ছিল। তাঁর মতো সুন্দরী সারা উদ্যানে অন্য কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। সে ছিল উদ্যানের জনপদ কল্যাণী। তখন তার বয়স চৌদ্দ বছর, কৈশোরের চাপল্যে ভরপুর। ওর গলা ছিল আমার চেয়ে সুরেলা, আমরা দুজনে মিলে গান গাইতাম। পরবর্তীকালে আমাদের সঙ্গীরা আমাদের জুটিটিকে স্থায়ী করে দেয়।

শিলাখণ্ডের আড়ালে বসে এসমস্ত কথা আমার মনে উদয় হচ্ছিল। সেই ঝড় তুফানের মধ্যে আমরা দুজনে নীরবে বসে। বাইরের মতো আমার হৃদয়েও তখন এক তুফান বইছিল। আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, ভদ্রার স্পর্শ আজ কেন আমার অন্য রকম মনে হলো? ভদ্রার ঠোঁটে এক রহস্যময় মৃদু হাসি। তার অরুণ কপোল অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি লাল। ভদ্রা এমনিতেই হাসিখুশি কিন্তু তার ঠোঁটের হাসিতে যেন কিছু রহস্যের আভাস ছিল। আমাদের মধ্যেকার নীরবতা ভেঙ্গে আমিই জিজ্ঞেস করলাম–

–কি ব্যাপার বলো তো ভদ্রা, আজ তোমার শরীরের ছোঁয়া আমার মনের মধ্যে অন্য রকম একটা ভাবনা আনল কেন?

–নরেন্দ্র তোমার কি সত্যি সত্যি এরকম মনে হলো? আমার মনও জানিনা কেন আজ ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যাঁদের প্রেমগীতি আমরা গাইছিলাম, তাঁরাই আমাদের ওপরে ভর করেননিতো?

মানুষের ওপরে ভূত, প্রেত কিংবা দেবতাদের ভর হওয়া আমাদের দেশের এক প্রচলিত বিশ্বাস। যেমন বৈশ্রবণ (কুবের) ও তাঁর পত্নী হারিতীদেবী আমাদের দেশের ওঝাদের সঙ্গে যখন তখন বাক্যালাপ করেন, ভর করেন। আমাদের দুজনের ওপরেও কি তেমন কেউ ভর করল? আমরা আমাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্যকে উপলব্ধি করার জন্য আরেকবার পরস্পরকে স্পর্শ করলাম, কিন্তু মনের অস্থির ভাব বিন্দুমাত্র কমলোনা, বরং খানিকটা বেড়ে গেলো। আমাদের তুলনায় ভদ্রাদের পরিবার ছিল ছোট। তারা আমাদের মতো অর্ধযাযাবর ছিলনা, পয়ারে না থাকলে তারা তাদের স্থায়ী গ্রামে থাকত। সে কখনও উদ্যানের রাজধানী দেখেনি। আমি অবশ্য আমাদের রাজধানী ছাড়াও আমার মায়ের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে কপিশা, পুরুষপুর, তক্ষশিলার মতো নগরী দেখে এসেছিলাম। কিন্তু ভদ্রার কাছে এই পয়ার আর তাদের গ্রামই ছিল পৃথিবী। আমি কিছু কিছু প্রেমের কাহিনি পড়েছিলাম। ভদ্রার সঙ্গ, তার মধুর স্পর্শ, তার সঙ্গে কথা বলা সমস্ত কিছুই যেন কোনো বিশেষ দিকে ইঙ্গিত করে আমাকে বোঝাতে চাইছিল যে মানুষের জীবনের মধুরতম মুহূর্তের দিকে আমি পৌঁছে গিয়েছি। দুজনে দুজনের দিকে অপলকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমাদের কপাল পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়েছে এবং আমাদের অজান্তেই পরস্পরের ওষ্ঠ একে অপরের সঙ্গে মিলিত হলো। আর আমার কোনো সংশয় ছিলনা, আমরা পরস্পরের কাছে আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিলাম।

আমাদের দেশে পাত্র পাত্রী স্বয়ং তাদের বিবাহ স্থির করে, তবে পরিবারের ভূমিকাও সেখানে খুব গৌণ থাকেনা। আমাদের প্রণয় কাহিনি আমরা বেশিদিন লুকিয়ে রাখতে পারিনি। প্রেম আমাদের সমাজে কোনো নিষিদ্ধ বস্তু নয়, অতএব আমাদের প্রণয় সকলের কাছে স্বাভাবিক এক ঘটনা বলেই গৃহীত হয়েছিল। তবে সকলের সামনে ভদ্রার সঙ্গে মিলিতভাবে গান গাইতে কিছুটা সংকোচ বোধ হতো। আমরা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে একান্তে মিলিত হতাম। সেখানে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে নানা রকম কল্পনার জাল বুনতাম। আমার কাকা জিনবর্মা আমাকে ভিক্ষু করতে চাইতেন এবং প্রথম দিকে আমারও সেদিকে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। কিন্তু ভদ্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার পর সংঘারামের ঘন্টাধ্বনি কিংবা কাষায় বর্ণের চীবরের প্রতি আর কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না। কারণ তখন আমি আমার জীবনের অধিকারী হিসেবে আমার পরিবর্তে ভদ্রাকে বসিয়ে ফেলেছি। আমাকে ভিক্ষু করার জন্য আমার পরিবারের আগ্রহ ভদ্রার জানা ছিল, সে কারণে মাঝে মধ্যে তার কপালে আশঙ্কার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখতাম।

তখন আমার বয়স সতেরো বছর। বর্ষার পয়ারবাস চলছিল। তখন জানতাম না যে সেটাই আমার শেষ পয়ারবাস। কাঠ সংগ্রহের জন্য একদিন প্রায় চার ক্রোশ দূরের এক অরণ্যে যেতে হয়েছিল। আশা ছিল সূর্য অস্ত যাবার আগেই ফিরে আসব। কাঠ বহন করার জন্য সঙ্গে কিছু ঘোড়া এবং গাধা নেওয়া হয়েছিল, তাছাড়া কিছু কাঠ

আমরা নিজেরাও বহন করতাম। যারা ঘোড়া বা গাধা নিয়ে গিয়েছিল তারা আরও দূরের অরণ্যে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করল, কারণ সেই অরণ্যে প্রচুর ডালাপালা শোভিত গাছ পাওয়া যায় যার অর্থ স্বল্পায়াসে বেশি কাঠ পাওয়া যেতে পারে। যারা নিজেরা বহন করবে তারা অতদূরে যেতে রাজি হলো না। আমরা দূরের অরণ্যের দিকেই গিয়েছিলাম। ভদ্রার ছোট একটি ভাই ছিল আমাদের দলে। কুড়ুল দিয়ে কাঠ কেটে, তাকে এক জায়গায় জড় করে। তারপর সেগুলিকে বন্য লতার সাহায্যে বেঁধে, এবং সবশেষে তাকে ঘোড়া বা গাধার পিঠে চড়ানো, এই ছিল কাজ। কাঠ জোগাড়ের কাজ শেষ করে আমরা দুজনে এক দেবদারু গাছের ছায়ায় বসেছিলাম। ভদ্রার অনুরোধেই বসা হয়েছিল, এবং বসেছিলামও একটু নিভৃতে। আমার মনে হচ্ছিল ভদ্রা বোধহয় আমাকে একান্তে কিছু বলতে চায়। কুড়ুল চালিয়ে কাঠ কাটা যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য কাজ। আমার কপালের ঘাম তখনও শুকোয়নি। উন্মুক্ত দেহে কাঠ কাটছিলাম। ভদ্রা অপাঙ্গে আমার দুই সবল পেশিবহুল বাহু এবং প্রশস্ত বক্ষের দিকে তাকিয়েছিল। আমিও তার পরিশ্রমের ফলে লাল হয়ে যাওয়া মুখ এবং সুন্দর সুঠাম তনুদেহের দিকে তাকিয়েছিলাম। আমার চোখে তার মুখটি এক প্রস্ফুটিত পদ্মফুল সদৃশ মনে হচ্ছিল যার মধ্যে শরতের মেঘের ঈষৎ ছায়া পড়েছে। তার ঠোঁটের কোণের মৃদু হাসির আভা এখন অন্তর্হিত। কপালে অবসাদ জনিত মালিন্য। চোখ তার এখনো স্ফীত ও সুন্দর কিন্তু চোখের নীল তারা যেন খানিকটা সংকুচিত। এই সমস্ত পরিবর্তনই ঘটছিল অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। আমার কিছু বলার আগেই ভদ্রা মুখ খুলল।

শুনলাম তুমি নাকি ভিক্ষু হতে চাও। ভদ্রার কণ্ঠ আমার কানে কেমন যেন ম্রিয়মাণ ঠেকল। হঠাৎ এই প্রশ্ন আমি আশা করিনি। ভদ্রার মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম যে কোনো অপ্রিয় চিন্তা তার মনে ঝড় তুলেছে। আত্মীয় পরিজনের মধ্যে নরেন্দ্রর ভিক্ষু হওয়া নিয়ে নানা আলোচনা হলেও নরেন্দ্র নিজে আর তাতে উৎসাহী নয়। কিন্তু এই কথা কটি ভদ্রার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হবেনা ভেবে তার কাঁধে হাত রাখলাম। তার নীল অক্ষিগোলকের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললাম– কে বলেছে তোমায়? এ সময় এরকম একটা ইচ্ছা আমার মধ্যে ছিল না তা নয় কিন্তু যখন থেকে ভদ্রা আমার হৃদয়ের অধিকারিণী হয়েছে তখন থেকেই সেই ভাবনা আমি পরিত্যাগ করেছি।

আমার কথা শুনে ভদ্রার মুখে স্বস্তির ভাব দেখা গেলো। সে আমার বুকে মাথা রেখে বলল, আমার ভালোবাসায় তোমার আস্থা আছে?

–নিশ্চয়ই। আমার শরীর এবং মন উভয়কেই আমি তোমার কাছে সমর্পণ করেছি, তুমি তোমার হৃদয় দিয়ে আমার হৃদয়ের কথা শুনে নাও।

– সবাই আমাকে বলে যে আগামী বছর নরেন্দ্রর কাকা ভিক্ষু জিনবর্মা নরেন্দ্রকে ভিক্ষু দীক্ষা দিয়ে সংঘারামে নিয়ে যাবেন, আর সেই কথা শুনে শুনে আমি ভাবনায় অধীর হই।

–ভদ্রা তুমি শুনে সুখী হবে যে আমার পরিবারের অন্যরাও এখন আর আমাকে ভিক্ষুরূপে দেখতে চাননা, পরিবর্তে তাঁরা তোমাকেই তাঁদের কুলের বধূ হিসেবে পেতে চান। ভিক্ষু জিনবর্মা নিজেও আশা ত্যাগ করে আমার অনুজকে নিয়ে ভাবনা শুরু করেছেন।

আমাদের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ভদ্রা তার উজ্জ্বল চেহারাতে ফিরে গেলো। এরপর আমাদের কথাবার্তার বিষয় পাল্টে গেলো। আগামী দিনে যখন পতি পত্নী রূপে আমরা নতুন জীবনে প্রবেশ করব তখন আমরা কি কি করব সে বিষয়ে আলোচনা করতে আরম্ভ করলাম। আমাদের পৈত্রিক বাড়িটিকে আমাদের পরিবারের তুলনায় আমার বেশ ছোট মনে হতো, সেজন্যই আমরা ঠিক করলাম যে বিয়ের পর একটা আলাদা ঘর তৈরি করব। সাধারণভাবে যে সমস্ত গুণের জন্য বিমাতারা নিন্দিত, আমার বিমাতার মধ্যে সে সমস্ত গুণ বিশেষ ছিল না, কিন্তু যে কোনো কারণে আমার পিতামহীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ বনিবনা হতো না। সে সব দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আমার বিয়ের পর একটা পৃথক বাড়ি হলে ভালো হয়। সে কথা উত্থাপন করে বললাম–

–ভদ্রা, আমি শুধু কুড়ুল চালাতেই শিখিনি। কোনো কুশলী দারুশিল্পীর মতো আমিও কাঠের ওপরে খোদাই করার কাজ শিখে ফেলেছি। কাঠের ওপরে অনায়াসে ফুল কিংবা পত্র পল্লব ফুটিয়ে তুলতে পারি।

– বেশ। তাহলে আমরা দুজনে কাঠের শিল্পকার হয়ে উদ্যানপুরীতে চলে যাব। সেখানে আমরা নিশ্চই আরও ভালো জীবিকার সন্ধান পাব।

উদ্যানপুরীর নাম শুনেই জানিনা কেন, আমার মধ্যে একটা আশঙ্কার ছায়া পড়ল। ভদ্রা অসাধারণ সুন্দরী, রাজধানীতে গেলে যদি তার ওপরে কারও দৃষ্টি পড়ে। প্রসঙ্গ পাল্টে আমি বললাম– না উদ্যানপুরী আমার পছন্দ নয়। অরণ্য সেখান থেকে অনেক দূরে এবং সেখানে ভীষণ গরম। অতদূরে চলে গেলে প্রতি বর্ষায় এই পয়ারে আসব কি করে?

আমি জানতাম যে ভদ্রারও এই পয়ারের জীবন আমারই মতো পছন্দের। তাই সহজেই ভদ্রা আমার সঙ্গে সহমত হলো।

– তুমি ঠিকই বলেছ নরেন্দ্র। আমাদের পয়ার দেবভূমির কাছাকাছি। এখান থেকে দেখা যায়, ওই যে উত্তরের হিমশিখর। ওখানেই দেবতাদের বাস।

–দেবস্থানের এত কাছাকাছি থাকার জন্যই হয়তো তুমি এত সুন্দরী হয়েছ। শুনেছি গর্ভাবস্থায় মায়ের ওপরে যদি আকাশচারিণী কোনো দেবীর ছায়া পড়ে তাহলে গর্ভস্থ সন্তান সুন্দর হয়।

–তাহলে তোমার মায়ের ওপরেও নিশ্চয়ই কোনো দেবতার ছায়া পড়েছিল। কথাটা বলেই ভদ্রা চুপ হয়ে গেলো। ছেলেবেলাতেই আমি আমার মাকে হারিয়েছি, কিন্তু এখনো তাঁর কথা উঠলে আমার দুচোখ জলে ভরে আসে। আমার এ দুর্বলতার কথা ভদ্রার অজানা ছিল না।

আমি তার অস্বস্তি দূর করার জন্য বললাম–

–তা হতে পারে কিন্তু সেই দেবতা অত সুন্দর ছিল না, যেমনটি ছিল সেই দেবী, যাঁর ছায়া তোমার মায়ের ওপরে পড়েছিল।

ভদ্রা আমার মনোভাব বুঝে বলল–শুনেছি স্বর্গে গিয়েও আমাদের স্বজনেরা তাঁদের সন্তানদের সুখ আনন্দের কথা ভুলতে পারেননা। তোমার মাও হয়তো ওই দূরের শ্বেত শিখরগুলির কোনো একটিতে বসে সস্নেহে আমাদের দেখছেন।

জীবিত থেকে তোমার মতো পুত্রবধূর সুন্দর মুখতো আমার মা দেখতে পেলেন না, তবে দূর থেকেও নিশ্চয়ই আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

পাহাড়ি পথের বাঁকের মতো জীবনের পথেও অনেক বাঁক থাকে। পথের বাঁকের কথা মানুষের জানা থাকে, কিন্তু জীবনপথের বাঁক? কিছুক্ষণ আগে আমি আর ভদ্রা এক দেবদারু গাছের নিচে বসে আমাদের কল্পনার ডালি উজার করে দিয়েছিলাম। আমাদের সেই জগতে জীবিতদের সঙ্গে মৃতরাও উপস্থিত ছিল। আমি আঠারো বছর অতিক্রম করে ফেলায় ভিক্ষু জিনবর্মা আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে আমার অনুজের প্রতি মনযোগী হয়েছিলেন। তাঁর বয়স তখন পঞ্চাশ। কিন্তু সেই বয়সেই তিনি নিজেকে এত বৃদ্ধ ভাবতে শুরু করে দেন যে তাঁর জীবদ্দশায় আমার ভাইয়ের শিক্ষাদীক্ষা সম্পূর্ণ হবে কিনা সেই চিন্তায় বিচলিত থাকতেন। আমার জীবনও এরপর এক অন্তসলিলা নদীর মতো মাটির বুক থেকে হারিয়ে গিয়ে একদিন যখন আবার প্রকট হলো তখন তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উভয়ই পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে।

ভদ্রা অসাধারণ সুন্দরী ছিল। কিন্তু আমাদের জানা ছিল না যে তার এই অনুপম সৌন্দর্যের খ্যাতি আমাদের এই ক্ষুদ্র পয়ারভূমি ছাড়িয়ে অনেক দূর দূরান্তরে পৌঁছে গেছে। কাশ্মীরের রাজা মিহিরকুলের রনিবাসে সুন্দরী নারীর অভাব ছিলনা। নানা দেশ থেকে সুন্দরী নারীদের সেখানে আনা হয়েছিল। কিন্তু রাজাদের কোনো কিছুতেই তৃপ্তি হয়না। তোরমান ছিলেন মহান সম্রাট। তাঁর রাজত্ব মধ্যমণ্ডলের বিশাল অঞ্চলেও প্রসারিত ছিল। প্রবল প্রতাপান্বিত গুপ্ত সম্রাটেরাও তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পুত্র মিহিরকুল ভাগ্যের সহায়তা পায়নি। আমার যখন ন'বছর বয়স, তখন একবার মিহিরকুল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে কাশ্মীরে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে মিহিরকুলের রাজত্ব তার পিতার তুলনায় খুবই ক্ষুদ্র কিন্তু তা সত্ত্বেও সে রাজাদের রাজা। শরীরের জরা এবং পূর্ব পরাজয়ের তিক্ত স্মৃতি তাকে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে দূরে রেখেছিল পরিবর্তে সে বিলাস ব্যসন আর কামকলাতেই অধিক সময় ব্যয় করত। তার গুপ্তচরেরা ইদানীং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের সামরিক গোপন খবরের সন্ধান না করে কোথায় কে সুন্দরী রমণী আছে তার সন্ধান করত। যে যত বেশি সুন্দরী সংগ্রহ করতে পারত সে সেভাবে পুরস্কৃত হতো। উদ্যান মিহিরকুলের অনেক আগে থেকেই তার সুন্দরীদের জন্য বিখ্যাত, ফলে মিহিরকুলের লোভের দৃষ্টি এই উদ্যানেই বেশি নিবদ্ধ থাকত। উদ্যানপুরীতে অবস্থানকারী তার প্রতিনিধি, সীমান্ত অঞ্চলের সেনাপ্রধান, ইত্যাদি সকলেরই কাজ ছিল বিভিন্ন অঞ্চলের সুন্দরীদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। এরকম অবস্থায় ভদ্রার সৌন্দর্যের কথা কিভাবে গোপন থাকতে পারে? তখন শীতকাল। ভদ্রাদের পরিবার তাদের গ্রামে ফিরে গিয়েছে। আমিও আমাদের হেমন্তকালীন বাসভবনে ছিলাম। রাজধানীর রাজপ্রতিনিধি ভদ্রার সন্ধান পাওয়া মাত্রই তার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তাঁকে জানিয়ে দেয় যে ভদ্রা রাজাধিরাজ মিহিরকুলের জন্য নির্দিষ্ট। ভদ্রার পরিবারের কাছে এই প্রস্তাব এক রকম বিরল সৌভাগ্যের মতোই ছিল; কারণ ভদ্রা মহারানী হবে। ভদ্রার সেখানে করার কিছু ছিল না। সে তার সাধ্যমতো প্রতিবাদ করেছে কিন্তু একজনকেও তার স্বপক্ষে পায়নি। আমি যখন এই সংবাদ পাই

তখন বৎসর অতিক্রান্ত প্রায়। ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত থাকলে জীবন থাকা পর্যন্ত ভদ্রাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ নিয়ে যেতে পারতনা।

ভদ্রা মিহিরকুলের রনিবাসে (অন্তঃপুর) চলে গেলো। অনেকদিন পর্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাটালাম। মিহিরকুলের রনিবাস থেকে ভদ্রাকে উদ্ধার করা কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। আমার প্রেম আমাকে এতটাই উতলা করে তুলেছিল যে জীবনকে এক বোঝা মনে হতো। মাঝে মধ্যে মনে হতো নিজেই নিজের জীবনের ইতি ঘটাই। আবার তখনই মনে পড়ত বিভিন্ন গ্রন্থে পড়েছি, আত্মহত্যা কাপুরুষোচিত কাজ, তখন নিবৃত্ত হয়েছি। অবশেষে আমি জীবনের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনা শুরু করলাম। ভদ্রার সঙ্গে পরিচয়ের আগে আমার যে স্বপ্ন ছিল তাকেই সাকার করার লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করলাম।

ভিক্ষু (৫৩৬–৫৪০ খ্রিঃ)

এক মুহূর্তের বিদ্যুৎ চমকের মতোই ভদ্রা আমার জীবনে এসেছিল। তারপর তাকে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়া হয় মিহিরকুলের অন্তঃপুরে। তারপর আমার সম্বন্ধে তার স্মৃতিতে কিছু ছিল কিনা জানিনা, কিন্তু আমার স্মৃতি থেকে ভদ্রা একটু একটু করে লোপ পেয়ে গেলো। পরবর্তীকালে আমি কাশ্মীরের রাজধানীতে গিয়েছি কিন্তু ভদ্রার সন্ধান করার কোনো চেষ্টাই করিনি।

অন্তিম পয়ার বাসের পর আমি আমাদের শীতকালীন আবাসে না গিয়ে, সুবাস্তুর উৎস মুখের দিকে অর্থাৎ উত্তরের দিকে চলতে শুরু করি। সেখানেই এক সংঘারামে থাকতেন ভিক্ষু জিনবর্মা। আমার বাবা আমার সঙ্গী ছিলেন। এবং আমরা দুজনে তিন দিনের দিন সেই সংঘারামে গিয়ে পৌছালাম। ভদন্ত জিনবর্মা আমাদের আসার সংবাদ আগে থেকে অবহিত ছিলেন না। তিনি যখন জানলেন আমি প্রবজ্যা নেবার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। সংঘারামের চারদিক অতীব মনোরম। এখান থেকে মাত্র একদিনের পথ অতিক্রম করলেই পাওয়া যাবে সুবাস্তু (শ্বাত) নদীর উৎস স্থল। অবশ্য এই এক দিনের পথেই অনেক কল্লোলিনী জলধারা সুবাস্তুর মধ্যে নিজেকে বিলীন করেছে। সুবাস্তু এখানে বেশি প্রশস্ত না হলেও খরস্রোতা। তবে সাবধানে পাথরে পা রেখে অতিক্রম করা যায়। উত্তরে অবস্থান হলেও দুটি পাহাড়ের ব্যবধানের কারণে অন্য অঞ্চলের চেয়ে এখানে সূর্যকিরণ বেশি সময় ধরে থাকে, এবং তাপমানও কিছু অধিক। লোকে সঠিকভাবেই জায়গাটার নাম দিয়েছে সুভূমি। আর জায়গার নামেই সংঘারামের নামও হয়েছে সুভূমি। হেমবন্তের আচার্য ক্যশ্যপ নিজে এই বিহারের স্থাপনা করেছিলেন। কাছেই একটি বড়ো আকারের গ্রাম আছে যেখানে বাস করে সামান্য কয়েক ঘর কৃষিজীবী আর বাকি সকলেই প্রায় পশুপালক। নদী পারাপারের জন্য গ্রামের কাছে একটি কাষ্ঠনির্মিত সেতু আছে যেটা শীতে তুষারস্রোতে ভেসে যায়, শীত চলে গেলে আবার নতুন করে গড়া হয়। শীতে নদী পারাপারের জন্য সেতুর প্রয়োজন হয়না, কারণ তখন নদীর জল জমাট বরফ হয়ে যায়। আমাদের

গ্রামের মতো এখানকার গ্রামবাসীরাও শীতকালে অন্যত্র চলে যায় কিন্তু সুভূমি বিহারের ভিক্ষু সংখ্যা শীতেও কম হতোনা বরং কখনো কখনো বেড়ে যেত। বিহারের একতলা তুষারে ঢাকা পড়ত। ঠাণ্ডায় ভিক্ষুদের পরিধেয় ছিল চামড়ার মোটা পোশাকের ওপরে পুরু পশমের চীবর, পায়ে পশমের মোজা এবং চামড়ার জুতো। মধ্যমণ্ডলে শির আচ্ছাদিত ভিক্ষু কদাচিৎ চোখে পড়বে কিন্তু এখানে ভিক্ষুরা কানঢাকা টুপি পরতেন। বিহারের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ছিল এবং সে জন্য আগে থেকেই শুকনো কাঠ সংগ্রহ করা থাকত। আহার্যের জন্য শীতে, সঞ্চিত সামগ্রীর ওপরেই নির্ভর করতে হতো। তাছাড়া বিহারের উত্তর এবং দক্ষিণের সমভূমিতে সুন্দর আঙুর ফলতো। বিহারের উত্তরে অনেকগুলো হিমাচ্ছাদিত শৃঙ্গের মধ্যে এখানকার লোক বিশেষ তিনটিকে বেছে নিয়ে তার মধ্যে বুদ্ধের ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, সংঘ, ধর্ম) আরোপ করে সেগুলিকে চৈত্য জ্ঞানে পূজা করত।

আমি আমার পরবর্তী জীবনে অসংখ্য বিহার দেখেছি, কিন্তু কোনোটিকেই সুভূমির তুল্য মনে হয়নি। শীতে বিহারের কয়েকজন ভিক্ষু ছাড়া সমস্ত এলাকা থাকত জনশূন্য। রোদ উঠত, খুব কম সময়ের জন্য। আমরা রোদ পোহাতে পোহাতে তুষারের গালিচা ঢাকা পথে হাঁটতাম। লেখাপড়ার জন্য এটি ছিল প্রকৃষ্ট সময়। কখনো কখনো আবহাওয়া অনুকূল থাকলে হাঁটতে হাঁটতে দেবদারু আর ভূর্জগাছের অরণ্য পার হয়ে কোনো পয়ারে চলে যেতাম। তুষারে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হয়ে চোখ অন্ধ করে দিতে পারে সে জন্য আমাদের টুপির মধ্যে কচি দেবদারুর পাতা গুঁজে চোখের সামনে ঝুলিয়ে রাখতাম।

সংঘারামে স্থায়ী ভিক্ষুর সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশো। শীতে এই সংখ্যা বেড়ে যেত। বিহারের মহাস্থবির ছিলেন গুণবর্ধন। তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি উদ্যানের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। গুণবর্ধনের জন্ম কম্বোজে কিন্তু কর্মস্থল এই সুভূমি বিহার। তাঁর স্বভাব ছিল অত্যন্ত মধুর। আমি নিজে কখনো তাঁকে কোনো অবস্থাতেই উচ্চকণ্ঠ হতে শুনিনি।

সুভূমি প্রাচীন বিহার। বয়স কম করেও সাত-আটশো বছর হবে। অন্যান্য বিহারের তুলনায় এর নির্মাণ শৈলীতেও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মধ্যে এক বিশাল পাষাণ স্তূপ যাকে কেন্দ্র করে তিনতলা পর্যন্ত প্রকোষ্ঠের সারি। বিহারের এই অংশটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। মহাস্থবির গুণবর্ধন ছাড়া আরও অনেক বিদ্যাবিদ শ্রমণ বিহারে বাস করতেন। যাদের একজন ছিলেন আমার কাকা ভিক্ষু জিনবর্মা। আমি ছিলাম তাঁরই অন্ত বাসী (শিষ্য) সেজন্য তাঁর পাশেই আমার থাকার জায়গা হয়েছিল। মূল বিহার থেকে কিছু দূরে আরও তিনটি বিহার ভবন ছিল এবং বিহারগুলির মধ্যে যাতায়াতের পথ ছিল পাথর দিয়ে বাঁধানো, ফলে বর্ষাতেও পায়ে কাদা লাগত না।

ভদন্ত জিনবর্মার কাছ থেকে মহাস্থবির গুণবর্ধন আমার মেধা সম্বন্ধে একটু অতিরঞ্জিত সংবাদ পেয়েছিলেন। আমার প্রাথমিক দীক্ষার সময় তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন মরশুমের প্রথম তুষারপাত হয়েছিল। এখন শুধু মহাচৈত্য আর ইমারতের উঁচু জায়গাগুলি বাদ দিলে সর্বত্র তুষারের ছড়াছড়ি।

ভিক্ষু সংঘের খাদ্য-সামগ্রী তৈরি ও অন্যান্য কাজের জন্য কিছু দাস ও কর্মকার বিহারে ছিল, বাকি গ্রাম জনশূন্য। আমি আসার দুদিন পরই আমার প্রবজ্যার দিন ধার্য হয়। আমার মাথার স্বর্ণাভ কেশ মুড়িয়ে দেওয়া হয়। আমার মা তাঁর পুত্রের জন্য নিজের হাতে সুতো কেটে, একটি পশমী ধুসা (দোশালা) তৈরি করেছিলেন, সেটিই আমার পরিধান ছিল। সেই শুভ্র দোশালাটিকে খুলে নিয়ে প্রথমে টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া হলো। তারপর কোনো গাছের রসে অরুণ রঙে রঞ্জিত করা হলো। অতঃপর সেটিকে ধানের শীষের মতো করে সেলাই করে পরিধান যোগ্য করা হলো। পোশাকের নিচে অল্প উষ্ণ অন্তর্বাস। ডান হাতের উপরিভাগ নগ্ন রেখে ফতুয়ার মতো অসংকুট তার ওপরে ঢিলে চীবর। বাঁ-কাঁধে অতিরিক্ত একটি চীবর বা সংঘাটি ভাঁজ করে রাখা, কোমরে বন্ধনী। লৌহ নির্মিত একটি ভিক্ষা পাত্র আমার জন্য রক্ষিত ছিল। অষ্ট পরিষ্কার সহ আমি মহাচৈত্যের ছায়ায় প্রবেশ করলাম। ডানদিকে মহাস্থবির গুণবর্ধন এবং বাঁদিকে একটু নিচে বসে ছিলেন ভিক্ষু জিনবর্মা। আমি ভদন্ত জিনবর্মাকে পঞ্চপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানালাম এবং পরে হাঁটু গেড়ে বসে প্রবজ্যা ভিক্ষা করলাম। তিনি আমাকে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের শরণ নেবার শপথ বাক্য পাঠ করালেন। তারপর জীব হিংসা ইত্যাদি দশটি নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়ে আমাকে সংঘের শরণে নিলেন। এবং আমার নতুন জীবন আরম্ভ হলো।

এখন আমার নাম শ্রমণের নরেন্দ্র যশ। কুড়ি বছর পূর্ণ হতে এখনো দুবছর বাকি। সেজন্য উপসম্পদা প্রাপ্ত ভিক্ষু আমি নই। আমার সমবয়সী যারা সাত-আট বছর বয়সেই শ্রমণের হয়েছিল শিক্ষা-দীক্ষায় তারা অবশ্যই কিছুটা এগিয়ে ছিল, কিন্তু আমার মনে হলো একটু চেষ্টা করলেই এই ব্যবধান কমিয়ে ফেলতে পারব। এই প্রচেষ্টার মধ্যে আমি কুড়ি বছর বয়সে পদার্পণ করলাম।

বর্ষার প্রথম মাস (৫৩৮ খ্রিঃ)। ইতিপূর্বে যে সমস্ত ভিক্ষু বসন্ত এবং গ্রীষ্মে চারিকার জন্য অন্যত্র গিয়েছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ফিরে এসেছেন। বর্ষাকালে ভিক্ষুদের যাত্রা পরিত্যাজ্য। বর্ষার তিনমাস এক জায়গায় থেকে সাংঘিক জীবন কাটিয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় আপন আপন শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞাকে আরও উন্নত করার কথা বুদ্ধের উপদেশে বলা হয়েছে। তাছাড়া বর্ষা ঋতুতেই অপেক্ষমান প্রার্থীদের ভিক্ষু দীক্ষা দেওয়া হয়। এখন জনবসতি পরিপূর্ণ। চারিদিকের দৃশ্য সবুজ, নয়নাভিরাম। সুবাস্তুর ফেনিল জলস্রোতে নতুন উচ্ছ্বাস। রাত্রিতে গ্রাম থেকে সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্যের ক্ষীণ শব্দ ভেসে আসত। বর্ষোপনায়িকার (আষাঢ় পূর্ণিমা) মহিমা আমাদের উদ্যানের মহাপ্রবারণার (আশ্বিন পূর্ণিমা) দিনের মতোই উল্লেখযোগ্য। সেদিন থেকেই ভিক্ষু সংঘের বর্ষাবাস আরম্ভ হয়। সুভূমি বিহারের চতুষ্পার্শ্বে যত গ্রাম ছিল, তার সকলেই ছিল ভিক্ষু সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, বুদ্ধের উপাসক, তারা প্রাণ খুলে বিহারে আহার্য, বস্ত্র, ভেষজ এবং অন্যান্য বস্তু দান স্বরূপ পাঠাত।

শ্রাবণ মাসের প্রথম পক্ষের প্রথম তিথিতে অনেক শ্রমণেরকে উপসম্পন্ন করা হলো। সৌভাগ্যবশত আমিও তাঁদের মধ্যে ছিলাম। সেদিন প্রত্যুষে আমাদের কাষায় বর্ণের চীবর খুলে পরিবর্তে উদ্যান রাজকুমারের পোশাক পরানো হলো। এর জন্য

বহুমূল্য চোগা ইত্যাদি প্রস্তুত ছিল। তারপর রাজকুমারদের মতো আমাদের মাথাতেও পরানো হলো সুবর্ণমণ্ডিত মুকুট। কটিবন্ধে তরবারি। তারপর উদ্যান থেকে বাছাই করে আনা সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শোভাযাত্রা সহকারে আমরা বাইরে এলাম। সমগ্র সুভূমি প্রদক্ষিণ করা হলো। শোভাযাত্রার সঙ্গে বেণু, পটহ (ঢাক) ইত্যাদি বাজনা। মাঝে মধ্যে কোথাও কোথাও শোভাযাত্রার সাময়িক বিরতি ঘটছিল। সে সব জায়গাতে স্থানীয় স্ত্রী-পুরুষ সকলে সুসজ্জিত পোশাকে নাচ গান করে শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানাচ্ছিল। কোথাও কোথাও আমাদের ওপরে পুষ্প বৃষ্টি হচ্ছিল। সব কিছু দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো রাজপুত্রের বিবাহের শোভাযাত্রা। গার্হস্থ জীবনকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করার আগে তার একটা চরম রূপের সঙ্গে ভিক্ষুদের পরিচয় করানো হয়। পরিক্রমা শেষে মহাচৈত্যের কাছে অশ্ব থেকে নেমে আমরা যে যার ঘরে গেলাম। সেখানে এই রাজপোশাক খুলে আবার আমাদের ভিক্ষু চীবর পরানো হলো। বিহারের প্রধান উপাসনাকক্ষটি ছিল বিশাল, যেখানে পাঁচটি পংক্তিতে অনায়াসে পাঁচশো ভিক্ষু বসতে পারে। এখানে এক একজন করে শ্রমণের এল। আমি ছিলাম সর্বপ্রথম। ওপরের এক বিশিষ্ট আসনে (ধর্মাসন) মহাস্থবির গুণবর্ধন আসীন ছিলেন। সামনের তিন সারিতে প্রায় তিনশো ভিক্ষু, তাদের কে কবে ভিক্ষু হয়েছেন সেই ক্রমানুসারে তাঁরা বসেছেন। সমস্ত বাতাবরণই যেন শান্ত সমাহিত। এরকম নৈঃশব্দ সাধারণত এখানে শীতের ঋতুতেই দেখা যেত। দরজার কাছ থেকে দুজন ভিক্ষু আমার সঙ্গ নিলেন। কি করতে হবে তা আগে থেকেই শেখানো হয়েছিল, তবু কোনো ভুলচুক যেন না হয়, সেই ভেবে এই ভিক্ষুদ্বয় আমাকে আবার সেগুলো স্মরণ করালেন। উচ্চতায় প্রায় আমার সমান কিন্তু জ্ঞানে, মহত্ত্বে আমার চেয়ে অনেক বড়ো মহাস্থবির গুণবর্ধনের ধর্মাসনের কাছে গিয়ে আমি হাঁটু গেড়ে বসে পঞ্চপ্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানালাম এবং সংঘ থেকে উপসম্পদা পাওয়ার ভিক্ষা করলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমার বয়স কুড়ি বছর হয়েছে? তোমার মা-বাবা তোমাকে ভিক্ষু হবার অনুমতি দিয়েছেন? তোমার কোনো বংশানুক্রমিক দুরারোগ্য ব্যাধি নেই তো? উত্তর সন্তোষজনক হওয়ার পর মহাস্থবির গুণবর্ধন হলেন আমার উপাধ্যায় এবং ভিক্ষু জিনবর্মা হলেন আচার্য। আমি এখন সম্পূর্ণরূপে ভিক্ষু হয়ে সংঘের একজন। সুভূমি বিহারে বিনয়ের নিয়মগুলি কঠোরভাবে পালিত হতো। তথাগত তাঁর বিনয়পিটকে যে সমস্ত নিয়মের বর্ণনা দিয়েছেন আমাদের সংঘ সেই সমস্ত নিয়মকে যথানুসারে পালন করত। অন্যান্য বিহারে ভিক্ষুদের সোনা রূপো স্পর্শ করার বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু সুভূমিতে সেই নিয়ম যথেষ্ট কঠোরতার সঙ্গে পালিত হয়। আমাদের সংঘে এমন অনেক ভিক্ষু আছেন যাঁরা নতুন কাপড়ের চীবর পর্যন্ত পরেননা। প্রবাদ আছে যে বিহারের মূল সংস্থাপক আচার্য কাশ্যপও নতুন কাপড়ের চীবর পরতেন না। তিনি সেই প্রেরণা পেয়েছিলেন তথাগতর অন্যতম শিষ্য মহাকাশ্যপের কাছ থেকে। কথিত আছে যে তথাগত একবার তাঁরই মতো সুন্দর দেহের অধিকারী মহাকাশ্যপের অঙ্গে এক সুন্দর চীবর দেখে ভাবলেন, ওই চীবরে মহাকাশ্যপকে আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে, এর ফলে অনেকের লোলুপ দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়বে। সে জন্য তিনি বলেছিলেন,–

'মহাকশ্যপ তোমার চীবর বড় সুন্দর।' নতুন তথাগতর সান্নিধ্যে আসা মহাকাশ্যপ ভাবলেন, বোধহয় তথাগতর চীবরটি খুব পছন্দ হয়েছে, তাই তিনি সেটা তথাগতকে দিতে চাইলেন। তথাগত বললেন, 'তাহলে তুমি কি পরবে?' মহাকাশ্যপ বললেন, 'ভগবান যদি কৃপা করেন তাহলে আপনার চীবরটি পরতে পারি।' তথাগতর শরীরে তখন পাঁশুকুলের একটি চীবর। অপ্রয়োজনীয় বিধায় ফেলে দেওয়া পুরানো কাপড়ের টুকরো সেলাই করে তৈরি। সহস্র টুকরোর এক বেঢপ চীবর। তথাগত বললেন, কিন্তু একবার এই চীবর পরলে সারা জীবন এরকম চীবরই পরতে হবে। মহাকশ্যপ তথাগতর আদেশে আজীবন পাঁশুকুলিক হয়ে ছিলেন।

আমার নবজন্মের পথে শ্রমণের ছিল একটি ধাপ কিন্তু ভিক্ষু হওয়ার পর সত্যিই আমি এক অন্য জীবনে প্রবেশ করলাম। ব্যক্তিগতভাবে যদিও তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, পরিবর্তন যা কিছু হয়েছে মনে। আমি এখন ভিক্ষুদের সারিতে বসে আহারের অধিকারী ছিলাম। ভিক্ষু সংঘের কোনো বিষয়ে গুরুতর মতপার্থক্য হলে আমারও ছন্দের (রায়) অধিকার ছিল। আমার সবসময় মনে হতো ভগবান তথাগতর প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘ যা হাজার বছর ধরে চলে আসছে, আমিও সেই মহান পরম্পরার একজন। সুভূমি বিহারের অনুশাসন খুব কঠোর ছিল। যারা সেই কঠোর অনুশাসন মেনে চলতে পারবেননা, সে সমস্ত ভিক্ষুরা সুভূমিতে আসার সাহসই করতেন না। প্রথম প্রথম আমারও পাঁশুকুলিক হবার ইচ্ছে জেগেছিল। মহাকাশ্যপের মতো শুধুই পিণ্ডপাতিক থাকব, অর্থাৎ কোনোরকম নিমন্ত্রণ স্বীকার না করে শুধুমাত্র ভিক্ষান্নেই জীবন ধারণ করব। কোনো রকম অর্থসম্পদ স্পর্শ করবনা। কিন্তু পরবর্তীকালে আমার ভবঘুরে জীবনে দেখেছি অত কঠোর নিয়ম পালন সর্বত্র সম্ভব নয়। ভিক্ষু হবার পরেও আমার বিদ্যাশিক্ষা অবিচ্ছিন্নভাবে চলছিল। এরপর চার বছর উপাধ্যায় ও আচার্যের আশ্রমে থাকার কথা কিন্তু আমার পা দুখানি এক জায়গায় থেমে থাকতে চাইছিলনা। বিহারের স্বাভাবিক নিয়মের শিক্ষা গ্রহণ আমার সমাপ্ত হয়েছিল, এবং মাঝে মধ্যে আমাকে তরুণ শ্রমণেরদের মধ্যে অধ্যাপনাও করতে হতো। বিহারে যে সমস্ত বিদেশী ভিক্ষুরা আসতেন তাঁদের কাছে আমি বৌদ্ধ নীতি শাস্ত্র ছাড়াও তাঁদের দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতাম। তুষার দেশের ভিক্ষুর কাছে জেনেছিলাম যে কিভাবে একের পর এক গিরিসঙ্কট অতিক্রম করে তাঁরা এদেশে আসেন। পথে হয়তো দীর্ঘকাল কোনো জনমানবের দেখাও পাননি। কুচা এবং কাংস দেশের ভিক্ষুদের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। সেখানে বহুদূর পর্যন্ত পৃথিবী বালুতে ঢাকা। এক টুকরো সবুজ দর্শনের জন্য চোখ আকুলি বিকুলি করে। পথে জল ও খাদ্যের প্রচণ্ড অভাব। সবচেয়ে আতঙ্কের ব্যাপার হলো রাস্তায় ভূতপ্রেতের উপদ্রব। দক্ষিণদেশ ভ্রমণ করে আসা ভিক্ষুদের কাছে শুনতাম সেখানকার প্রচণ্ড উত্তাপের কথা। ভগবান তথাগতর জন্মস্থান দর্শন ছিল প্রতিটি ভিক্ষুর মনোবাসনা। বলা বাহুল্য আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

প্রথমবার মানুষ যখন ভ্রমণের জন্য পা বাড়ায় তখন কি তার জানা থাকে কবে কোথায় এর ইতি ঘটবে। সুভূমি বিহারের অন্তিম বর্ষে আমি এটুকুই শুধু জানতাম যে আমাকে তথাগতর পূণ্য জন্মস্থান দর্শন করতেই হবে। 'অবদান' ও 'জাতক' কাহিনি

পড়ে আমি মনে মনে এই প্রেরণাই পেয়েছিলাম যে অন্যের দুঃখ কষ্ট মোচনের জন্য আমি আমার এই নশ্বর শরীর উৎসর্গ করব। রোগ ব্যাধি মানুষের জীবনে বড়ো দুঃখের অন্তর্গত। রোগপীড়িত ব্যক্তির যন্ত্রণার উপশম সুবচনের মাধ্যমে সম্ভব নয় তার জন্য ভেষজের প্রয়োজন হয়। বিনয়পিটকে 'ভৈষজ্য-স্কন্ধক' পড়ার সময় জেনেছি যে তথাগত শুধু মানসিক নয় শারীরিক চিকিৎসাতেও পারঙ্গম ছিলেন। আমাদের বিহারের এক প্রতিমা গৃহে ভৈষজ্যগুরু রূপে তথাগতর প্রতিমা স্থাপিত আছে। প্রতিমার এক হাতে ঔষধের প্রতীক হিসাবে কিছু ভেষজ রাখা আছে। আমি বিভিন্ন ভিক্ষুর কাছ থেকে জেনেছি যে প্রায় সমস্ত ভিক্ষুরাই খানিকটা চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করে। পরিব্রাজনার সময় এই জ্ঞান খুব সহায়ক হয়। ভাষা, রীতি, রেওয়াজ না জানা অপরিচিত কোনো দেশেও চিকিৎসার জ্ঞান পাথেয়র কাজ করে। আমি নিজেও 'ভৈষজ্য-স্কন্ধক' সমাপ্ত করে নিজের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা শাস্ত্রের আরও উন্নত গ্রন্থের সন্ধানে ছিলাম।

সুভূমি বিহারে বাসের দিন সমাপ্ত হয়ে আসছিল। তৃতীয় বর্ষের মাঝামাঝি থেকেই আমার মনে চিরস্থায়ী ভবঘুরে বৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছা জেগেছিল। অন্তিম ছ'মাসে, মূল বিহার থেকে কিছু দূরে যে শাখা বিহার ছিল সেখানেই বেশি সময় কাটিয়েছি। সেখানে উদ্যানের এক প্রসিদ্ধ বৈদ্য ভিক্ষু থাকতেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে প্রথাগতভাবে সমস্ত চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি চারিকারির (ভ্রমণকারি) জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে চাই এবং এই শিক্ষাও হবে আমার আচার্য ও উপাধ্যায়ের অগোচরে। বৈদ্য ভিক্ষু নিজেও একসময় প্রচুর ভ্রমণ করেছেন, এখন বয়সের ভারে অপারগ, তিনি আমার কথা বুঝলেন। আমাকে তিনি বিভিন্ন ঔষধি গাছ গাছড়ার সঙ্গে পরিচয় করালেন। হাতে কলমে শেখার জন্য আমাকে দিয়ে ঔষধ প্রস্তুত করালেন, এছাড়া বিভিন্ন দেশের ঔষধি সম্বন্ধেও কিছু অভিজ্ঞতার কথা জানালেন। ফলে চিকিৎসা বিদ্যার যতটুকু আমার আয়ত্তে এসেছিল, তাতে আমার অসন্তোষের কোনো কারণ ছিলনা।

গান্ধার – কাশ্মীর (৫৪১-৫৪২ খ্রিঃ)

আমি তেইশ বছর বয়সে পদার্পণ করেছি। আমার বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে আমাকে উচ্চতর শিক্ষা দেবার মতো গুরুর অভাব উদ্যানে ছিল; কিন্তু হ্রদ যত বড়ই হোকনা কেন, সমুদ্রের আকর্ষণ তার মধ্যে থাকেনা। আমাদের উদ্যানের যশস্বী পণ্ডিতেরাও জ্ঞানলাভের জন্য মধ্যমণ্ডলে বহুকাল অতিবাহিত করেছেন। আমাদের প্রতিবেশী দেশ কপিশা, গান্ধার এবং কাশ্মীর তথাগতর চরণধূলিতে ধন্য হয়েছে, এরকমই কিংবদন্তি। আবার বিনয়পিটক কিংবা সূত্রপিটকে এমন কিছুই পাওয়া যায়না যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভগবান বুদ্ধ মধ্যমণ্ডলের বাইরে কোথাও বিহার করেছেন। আমাদের উদ্যানী মহাপণ্ডিত বিনয় ধর, লক্ষণ শাস্ত্রীদের কাছে কাশ্মীর গান্ধার ছিল বাড়ির মতো। ছেলেবেলায় একবার আমি আমার মায়ের সঙ্গে গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুর (পেশোয়ার) বেড়িয়ে এসেছিলাম। তবে তা নেহাতই ছেলেবেলার কথা। যেহেতু

আমাদের বাস শীত প্রধান অঞ্চলে, সেজন্যে মধ্যমণ্ডলের উত্তাপের কথা শুনে ভয় পেতাম। তাছাড়া আরও শুনেছিলাম, উষ্ণতার কারণে ওখানে প্রচুর সরীসৃপ, যাদের স্পর্শ মানেই মৃত্যু। কিন্তু আমার আচার্য যিনি বহুকাল মধ্যমণ্ডলে কাটিয়েছেন তিনি স্বশরীরে আমার সামনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদি জীবিতাবস্থায় মধ্যমণ্ডল থেকে ফিরে আসতে পারেন, তবে আমিই বা কেন প্রতিপদে মৃত্যুকে দেখব।

তখন বসন্ত কাল। এরপরই গ্রীষ্ম। মধ্যমণ্ডলের উদ্দেশে বের হতে হলে শীতই ছিল শ্রেয় কিন্তু কপিশা পাহাড়ি এবং ঠাণ্ডা অঞ্চল। সেখানকার ঠাণ্ডা আমাদের দেশের অনুরূপ না হলেও তাকে শীত প্রধান দেশই বলা চলে। বিহার থেকে বের হয়ে একটি ছোট এবং দুটি বড়ো গিরিসংকট অতিক্রম করে আমি সুবাস্তুর ভগ্নী কুনর নদীর তীরে এসে পৌছালাম। কুনর বেশ বড়ো নদী এবং এর দুই তট সবুজে শ্যামলে পরিপূর্ণ। আমাদের সঙ্গে একটি তীর্থযাত্রীদের দলও ছিল। চার-পাঁচজনের অতিরিক্ত সহযাত্রী আমার পছন্দের ছিলনা, এবং তাও হবে ভিক্ষুদের। উপাসক (গৃহস্থ) সহযাত্রী হলে অসুবিধা এই যে তাদের ঘর সংসার, পরিবার পরিজন থাকে, যাবার তাড়া থাকে। আমরা ভিক্ষুরা এ সমস্ত থেকে মুক্ত। ইচ্ছে হলে কোনো জায়গায় দুদিন বেশি থাকলাম, ইচ্ছে না হলে না আমরা ভিক্ষুরা প্রয়োজনে পশুপালকের ডেরাতে, বনজঙ্গলেও থেকে যেতে পারি।

কুনর নদীর তটভূমির অপার সৌন্দর্য বহুকাল আমার মনকে আবিষ্ট করে রেখেছিল। দু-তিন দিনের মধ্যেই আমরা কুনর তটবর্তী নগরীতে গিয়ে পৌছালাম। যে কোনো বড়ো ধরনের গ্রাম, যেখানে পাঁচ-দশটি দোকান, একটি বিহার এবং ছোটখাটো একটি হাট থাকে তাকেই আমরা নগর আখ্যা দিই। এই নগরী খুবই ছোট কোনো উপনগরীও নয়। কিন্তু আমি তখনো সজ্ঞানে কোনো বড়ো নগরী দেখিনি। আমাদের সহযাত্রী উপাসক উপাসিকারা নগরীর যথেষ্ট প্রশংসা করছিলেন। উপাসকদের মণ্ডলীতে চলার একটা সুবিধা এই যে ভিক্ষান্নের জন্য অন্যত্র যেতে হয় না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লঘু আহার যা আমাদের মতো একাহারী ভিক্ষুদের কাছে পূর্ণ আহারের সমতুল ছিল– তৈরি অবস্থায় পেয়ে যেতাম। এরপর মণ্ডলীর যাত্রা শুরু। নদীর নিম্ন অববাহিকায় আমরা যতই অগ্রসর হচ্ছি, ততই তাপমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা সকালে এবং সন্ধ্যাবেলায় চলা পছন্দ করতাম। কুনর একটি ভালো নগরী। বোধ হয় নদীর নামেই নগরীরও নামকরণ হয়েছে। সুবাস্তুওতো এভাবেই একাধারে নদী এবং প্রদেশ। নগরহার পর্যন্ত এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। নগরহারের অনেক আগেই পাহাড়গুলি পত্রপল্লবহীন নগ্ন। বৃক্ষবনস্পতি-বিহীন যে কোনো পাহাড় হতে পারে সেটা আমি এই প্রথম জানলাম। আমার সহযাত্রীরা নগরীর বিশালতা, পণ্য সজ্জিত বিপণি, স্বর্ণছত্র মন্দির ইত্যাদি দেখে পথশ্রম ভুলে গেলো। কিছুক্ষণ আগে দেখা নগ্ন, শ্রীহীন পাহাড় আমার মনের মধ্যে এক বিষণ্ণতার সৃষ্টি করেছিল। পাহাড়ের সানুদেশে ফলের বাগান। ফলের আস্বাদ উদ্যানের চেয়ে ভালো। এখানকার চালও খুব উন্নতমানের। যদি আমরা আরও শীতের দেশ থেকে না আসতাম, তাহলে এখানকার জলবায়ুকে উত্তম, সুখদায়ক বলতে পারতাম। নগরীর অধিবাসীরা স্বভাবে সৌম্য কিন্তু প্রয়োজনে

বীরত্বে ঝলসে উঠতে জানে। বিদ্যা, কলা ইত্যাদির প্রতি যথার্থ অনুরাগ কাকে বলে তা এখানে এসে শিখলাম।

নগরহার (জালালাবাদ, ১৯৬০ ফুট)

নগরহার আমাদের কাছে পুরুষপুরের মতোই একটি পুণ্যস্থান। এখানকার বিহার, চৈত্য, প্রতিমালয়, পুরুষপুরের মতো অত বিশাল এবং বৈভবশালী না হলেও খুব কম নয়। এখানে তথাগতর শরীরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অনেক বস্তু রক্ষিত আছে। যখন পুরুষোত্তম তথাগত পৃথিবীতে তাঁর অমূল্য উপদেশ দিয়ে মানুষকে কৃতার্থ করে চলেছিলেন, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর বাণী শুনেছে, সে সমস্তই আজ সহস্র বছর আগেকার কথা। কিন্তু আজও তাঁর উপদেশ শোনার জন্য মানুষ উদগ্রীব, যা লিখিত আকারে আমাদের মধ্যে থেকে গেছে। নগরহারে বুদ্ধের গ্রীবাস্থি রক্ষিত আছে। 'তিন আঙ্গুল লম্বা, আড়াই আঙ্গুল চওড়া, মোটা, পীতাভ বর্ণ, দেখতে মধুচ্ছত্রের মতো।' এটিইতো সেই পুণ্যাস্থি যা কোনোকালে তথাগতর শরীরের অংশ বিশেষ ছিল। এরপর যে বিহারে ভগবান বুদ্ধের সংঘাটি (চীবর) রক্ষিত আছে সেইটিও দর্শন করলাম। এখানে রক্ষিত সংঘাটি তেরোটি কাপড়ের টুকরো সেলাই করে তৈরি হয়েছিল। সংঘাটির সঙ্গে ভগবান তথাগতর একটি দণ্ড এখানে রক্ষিত আছে। কোনো কালে দণ্ডটি তথাগতকে চলতে ফিরতে সাহায্য করত। এসমস্ত পবিত্র বস্তুর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কিছুটা অতিরঞ্জন সৃষ্টি করে। এরকম অতিরঞ্জন এখানকার দণ্ডটি সম্বন্ধেও আছে। দণ্ডটি একটি স্বর্ণখচিত কাঠের আধারে রাখা আছে। প্রবাদ যে একশত লোক একযোগে চেষ্টা করেও দণ্ডটিকে তুলতে পারেনা, আবার কখনো কোনো একাকী বালক দণ্ডটিকে অবহেলা ভরে তুলে ধরে। আরেকটি বিহারে ভগবানের দণ্ড ও কেশ রক্ষিত আছে এবং সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত সেগুলির পূজার্চনা করা হয়। কেবলমাত্র তখনই দর্শনার্থীরা ওগুলিকে দেখবার সুযোগ পায়। ধর্ম ব্যবসায়ীরা মানুষের এই সরল বিশ্বাসের সুযোগ নেয় এবং অর্থের বিনিময়ে দর্শনের ব্যবস্থা করে দেয়। সমস্ত কিছুকে চোখ বুজে বিশ্বাস করা আমার মতো শ্রদ্ধালুর পক্ষেও অসম্ভব, বিশেষ করে কেশ সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ আমার জ্ঞান মতো তথাগত কখনো তাঁর কেশ কাটিয়েছিলেন এমন তথ্য পাইনি। ভিক্ষু হবার পর তিনি তরবারির সাহায্যে তাঁর কেশ ছেদন করেছিলেন যা দেবেন্দ্র শক্র দেবলোকে নিয়ে যান। কুশীনারাতে যখন তাঁর শরীরকে অগ্নিতে সমর্পণ করা হয় তখন ভস্ম ও অস্থির অবশিষ্টাংশ সংগ্রহ করে সকলের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সেখানে কেশের কোনো উল্লেখ নেই। তাছাড়া আগুনে কেশ অন্তত পুড়বেই। যাই হোক, চারদিকে যখন মূঢ় শ্রদ্ধালুদের ভীড় তখন যুক্তির কথা বলার অর্থই হলো অসময়ে রাগিণীর আলাপ করা।

আমাদের দলটি তিন চারদিন নগরহারে থাকবে জেনে আমার খুব আনন্দ হলো। আমরা উপাসকদের তাদের জন্য নির্মিত উপাশ্রয় বা অতিথিশালাতে পৌঁছে দিয়ে নিজেরা বিহারে আশ্রয় নিতাম। আমাদের পক্ষ থেকে এটাই ছিল শিষ্টাচারসম্মত কাজ। নগরহারের বিহারে অনেক জ্ঞানী ভিক্ষুর বাস। একবার আমার ইচ্ছে হচ্ছিল এখানে

থেকে গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে কিছু জ্ঞান লাভ করি। পরক্ষণেই মনে হলো নগরহারতো উদ্যানের কাছেই। এখন আমাকে অনেক দেশ দেখতে হবে। আমার সামান্য যেটুকু জ্ঞান ছিল তাতেই বিহারের নায়ক স্থবির মুগ্ধ হয়েছিলেন। যদি আমি আগ্রহ প্রকাশ করতাম তাহলে অবশ্যই তিনি আমার প্রস্তাব সানন্দে লুফে নিতেন।

নগরহারের চারদিকে আরও অনেক বিহার আছে। তার মধ্যে কয়েকটি পাহাড়ের অভ্যন্তরে গুহার মধ্যে। এখানকার গোপ গুহা একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। কথিত আছে তথাগত মনুষ্যলোকে বিহারের সময় এখানে তাঁর ছায়া রেখে গিয়েছিলেন, যা নাকি এখনো দেখা যায়। নগর থেকে প্রায় অর্ধ যোজন দূরে এই গুহা। গুহাটি পশ্চিমমুখি। দূর থেকে দেখলে তথাগতর সুবর্ণময় রূপ দেখা যায় কিন্তু যত কাছে যাওয়া যায় ততই মূর্তি ছায়ার মতো আবছা হয়ে যায়। অনেক কুশলী চিত্রকারেরা মূর্তির এই পরিবর্তন চিত্রে ধরে রাখার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে।

নগর থেকে যোজন দূরে উপত্যকার মুখে অন্য একটি বিহারে তথাগতর চন্দনের দণ্ড রক্ষিত আছে। চন্দনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গোশীর্ষ চন্দন থেকে এই দণ্ড প্রস্তুত হয়েছে। দণ্ডটি একটি ১৬/১৭ হাত কাঠের আধারে রক্ষিত আছে। আর সংঘাটি রক্ষিত আছে পশ্চিমের বিহারে। লোকে বিশ্বাস করে যে অনাবৃষ্টির সময় এই দণ্ড এবং সংঘাটির শোভাযাত্রা বের করে পূজার্চনা করা হলে বৃষ্টি নামে।

নগরহার থেকে এক যোজন দক্ষিণপূর্বে অস্থিনগর (হাড্ডি-হাড্ডা)। এই নগরীতে তথাগতর অস্থিসমূহ রক্ষিত আছে।

কপিশা

নগরহার ছেড়ে আমরা পশ্চিমে চলতে শুরু করলাম। নগরের কাছেই কুভা (কাবুল) নদী। কুভা নদী কপিশা থেকেই আসছে, একথা জানা ছিল কিন্তু নদী পথ সর্বত্র সুগম্য নয় অতএব আমরা কখনো নদীর কিনারা ধরে কখনো বা ছোট বড়ো পাহাড় অতিক্রম করে চলা আরম্ভ করলাম। নগরহার অঞ্চলের চেয়ে এখানে শীত কিছু বেশি। পাহাড়ের উপরিভাগ এখানেও নগ্ন শুধু ইতস্তত কিছু ভূর্জগাছ। একটা বড় গিরিসংকট অতিক্রম করে আমরা কপিশার রাজধানীতে (বেগ্রাম, কোহদামন) পৌছে গেলাম। কপিশার আঙুর তার সৌন্দর্য ও স্বাদের জন্য জগদ্বিখ্যাত। এতকাল কপিশার আঙুর শুকনো অবস্থাতেই খেয়েছি, এই প্রথম তাজা অবস্থায় খেলাম। যদিও এটা আঙুরের মরসুম নয়, গাছে সবে নতুন পাতা গজাচ্ছে কিন্তু কপিশার লোকেরা এক অপূর্ব উপায়ে আঙুরকে সংরক্ষণ করতে জানে যার ফলে সেগুলি গাছ থেকে সদ্য সংগ্রহ করা আঙুরের মতোই তাজা থাকে। পাকা আঙুরকে সাবধানে সংগ্রহ করে সতর্কতার সঙ্গে কাঁচামাটির পাত্রে রেখে, ঢাকনা এঁটে চারদিক মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এরপর এক বছর পরেও সেই পিটারি খুললে সদ্য সংগৃহীত আঙুরের মতোই স্বাদ লাগে। পাণ্ডুবর্ণ, দুই থেকে আড়াই আঙুল আকৃতির শুধু দর্শনেই সুন্দর নয় স্বাদেও অনুপম।

নগরহার, কপিশা রাজার অধীন। কপিশার উত্তরের হিমাচ্ছাদিত গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করলে বাহ্লীক (বল্‌খ) ভূমি। কপিশা নামের অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার ছিলনা।

কপিশা বাসর এবং লাল মিশ্রিত হলুদ রঙের এখানে কি সম্পর্ক? পরে কপিশাবাসীর পিঙ্গলবর্ণ এবং পিঙ্গলকেশ দেখে মনে হলো এই জন্যই এদের কপি এবং এদের বাসস্থানকে কপিশা বলা হয়েছে। কপিশাতে ঠাণ্ডা পেলাম, তবে তা কোনো মতেই উদ্যান কিংবা সুভূমি বিহারের মতো নয়। বিশাল প্রসারিত উপত্যকার বুক চিরে কুভা প্রবাহিত। রাজধানী খুব বড়ো নয়, আধযোজন স্থান জুড়ে এর ব্যাপ্তি। বাড়ি ঘর অধিকাংশই কাঠের তৈরি, এবং দেখতে সুন্দর। এখানকার প্রধান শস্য গম এবং জৌ। তবে আঙুরের জন্যই কপিশার খ্যাতি। তাছাড়া কপিশার জাফরান এবং অশ্বও বিখ্যাত। অধিবাসীদের স্বভাবে একটু উগ্রভাব আছে, অনেকটা উত্তরের তুখারদের মতো। এদের পোশাক নিচে সুথন (সালোয়ার) আর ওপরে মাথা গলিয়ে পরার জামা, মাথায় পাগড়ি। তবে এখানকার শাসক যেথাদের পোশাক ভিন্ন। কপিশাতে শতাধিক বিহার আছে। গ্রামে গ্রামে সুঅলংকৃত চৈত্য দেখে মনে হয় তথাগতর ধর্ম এখানে সুসমাদৃত। তবে অন্য ধর্মের মন্দির, উপাসনালয়ও বেশ কিছু আছে।

কপিশার রাজধানী বেগ্রাম এখন ছোট এক রাজার অধীনে রয়েছে। নগরীর চারপাশের ভগ্নস্তূপ দেখলে মনে হয় একসময় এই নগর আরও অনেক বিস্তৃত ছিল। শ্বেতহুণদের আক্রমণে কপিশার প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল এবং সেদিনের ধ্বংসলীলার বেশ কিছু প্রত্যক্ষদর্শী আজও জীবিত। কপিশা এখন মহারাজ মিহিরকুলের দখলে তবে প্রতাপ অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। মহারাজ কণিষ্কের একাধিক রাজধানীর মধ্যে কপিশা ছিল অন্যতম। এখানকার রাজবিহারের নির্মাণ তাঁর রাজত্বকালেই আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে ইতিহাস মিশ্রিত একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। কণিষ্কের সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের বাইরেও পশ্চিমে সীতা ও পূর্বে পীত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোনো এক সময় সম্রাট কণিষ্কের সঙ্গে চীনের শাসকদের যুদ্ধ হয় এবং পরাজিত চীনের রাজা প্রতিভূ হিসাবে একজন রাজপুত্রকে সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। কণিষ্কও সেই রাজকুমারকে তাঁর যোগ্য মর্যাদা দিয়েছিলেন। ঋতুর তারতম্যের কারণে চৈনিক রাজকুমার গ্রীষ্মে কপিশা, শরতে গান্ধার এবং শীতে ভারতে বাস করতেন। তাঁর জীবন নির্বাহের জন্য সম্রাট তাঁকে একটি প্রদেশ দান করেছিলেন, আজও সেই জায়গা চীনভুক্তি নামে পরিচিত। কপিশার রাজবিহার সেই রাজকুমারই নির্মাণ করেন। রাজবিহারের গায়ে যে দেয়াল চিত্র আছে তার বেশ কয়েকটি সেই রাজকুমারের অঙ্কিত বলে মনে হয় এবং সেই কারণেই কাহিনির সত্যতা কিছুটা প্রমাণিত হয়।

কপিশা পারস্য, বাহ্লিক, তুখার, জম্বুদ্বীপ প্রভৃতি দেশের বণিক ও ভ্রমণকারীদের সম্মিলন স্থান। এখানকার রাজবিহারে প্রচুর ভিক্ষুর বাস। আমরা বিহারে বসে কপিশার কাহিনি শুনছিলাম। শ্রোতাদের মধ্যে বুদ্ধিলও ছিল। তার বয়স আমার চেয়ে তিন-চার বছর বেশি। কাহিনি শুনতে শুনতে মৃদু মৃদু হাসছিল বুদ্ধিল। বুদ্ধিলের বুদ্ধি ঝলকিত চোখ আর তেজস্বী চেহারা দেখেই মনে হতো সে অসাধারণ প্রতিভাবান। তার কথা বলার ধরনটিও ছিল মধুর। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। জীবনে আমি অনেক বন্ধু পেয়েছি, কিন্তু বুদ্ধিলের সমকক্ষ কেউ ছিল না। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তার ছিল অপরিমেয় বুদ্ধি কিন্তু যার কোনো

বাড়াবাড়ি ধরনের বহিঃপ্রকাশ ছিলনা। অনেক বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতান্তর হতো কিন্তু তা কখনোই মনান্তরে পরিণত হয়নি। আমরা উভয়েই রাজবিহারে থাকতাম। বিহারের উত্তরে কয়েকটি গুহা ছিল যেখানে চীন রাজকুমার ধ্যান করতেন। কোনো একটি গুহাতে এক যক্ষের প্রহরায় চীনা রাজকুমার কিছু ধনসম্পদ পুঁতে রেখেছিলেন। বুদ্ধিল বলল– তথাগতর পরিগ্রহ থেকে বঞ্চিত ভিক্ষুরা ধনের জন্য কতইনা লালায়িত। তাঁরা স্বপ্নেও শুধু এই কিংবদন্তির গুপ্তধনই দেখেন। আমি বাধা দিয়ে কিছু বলতে চাইলে সে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল–সিংহল থেকে তুখার পর্যন্ত আমি ঘুরেছি, সর্বত্রই এ ধরনের কাহিনি শুনেছি। শুধু স্থান ভেদে সামান্য পরিবর্তন পেয়েছি, কোথাও হয়তো যক্ষের পরিবর্তে রাক্ষস, কোথাও হয়তো রাজপুত্রের বদলে শ্রেষ্ঠী। আমি অবাক হলাম যে সে এই বয়সেই এত দেশ পরিভ্রমণ করেছে। আমার বিস্ময় দেখে সে মৃদু হেসে বলল– আমার গুরু শ্রীধর্মলাভ ভবঘুরে জীবনই কাটান। তিনি প্রচণ্ড জ্ঞানী কিন্তু ছ'মাসের বেশি কোনো জায়গাতে বাস করতেন না। আমার সৌভাগ্য যে বারো বছর বয়স থেকেই আমি তাঁর সঙ্গে লেগে আছি। তুমি হয়তো ভাবছ নরেন্দ্র, যে এর ফলে আমার লেখা পড়ার ক্ষতি হয়েছে। না, পরিব্রাজনার মধ্যেও আমার উপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল যাতে আমার জ্ঞানার্জনে কোনো ত্রুটি না থাকে। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্র, আমার প্রতি তাঁর কৃপা ছিল তাই আজ আমি দু'অক্ষর পড়তে পারি। বুদ্ধিলকে যে বিদ্যার অভিমান স্পর্শ করেনি তা তার মুখের 'দু'অক্ষর' শুনেই বোঝা যায়। অথচ তার এক একটি অক্ষরে লক্ষ শ্লোকের জ্ঞান ছিল। সাত বছর তার সঙ্গে কাটিয়েছি এবং তারই মধ্যে অন্যান্য আচার্যদের কাছেও কিছু পাঠ নিয়েছি কিন্তু বুদ্ধিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে প্রকৃতপক্ষে সেই ছিল আমার আচার্য। তার জ্ঞানের পরিধি আমাকে অবাক করত। বহু নাম করা তার্কিক পণ্ডিত তার কাছে নিমেষে হার মেনেছে এমনও দেখেছি কিন্তু পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বির সঙ্গে তার ব্যবহার ছিল এমন, যেন সেই পরাজিত।

কপিশার বিভিন্ন বেড়াবার জায়গাতে আমরা দুজনে এক সঙ্গে যেতাম। বর্ষাবাসে চারিকা নিষেধ, তাই এই সময়টা আমরা এখানে কাটানো মনস্থ করেছিলাম। আমার উদ্যানের সহযাত্রীরা আগেই ফিরে গিয়েছে। রাজধানী থেকে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দক্ষিণ পূর্বে রাহুলবিহার একটি বড় বিহার। তবে এটি বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ পুত্র রাহুলের নামে নির্মিত হয়নি। রাহুল নামের এক রাজঅমাত্য এটির নির্মাতা। রাজধানর দক্ষিণে কিছুদূরে একটি জায়গার নাম স্ফীতফল। এখানকার লোকের বিশ্বাস সর্বত্র যখন ভূকম্প হয় তখনো এখানকার মৃত্তিকা স্থির থাকে। একটি পর্বত সম্বন্ধে কাহিনি প্রচলিত আছে যে এটি প্রতি বছর বেশ কয়েক হাত বেশি উঁচু হয় এবং কাছের শূনাসীর (শূন্যদেবতা) পর্বতের দিকে হেলে যায়, আবার সময়ে ঠিক হয়ে যায়। স্থানীয় গল্পকার কাহিনি শোনাচ্ছিল– কোনো এক সময় শূন্য দেবতা পথক্লান্ত হয়ে এই পাহাড়ে বিশ্রাম নেবার জন্য বসেছিলেন। পাহাড়ের দেবতা ভাবল, এই দেবতা যদি চিরস্থায়ীভাবে আমার ওপরে বসে থাকে তাই সে জোরে হেলতে থাকে। শূন্য-দেবতা বিরক্ত হয়ে বললেন, তুমি এ সমস্ত করছ আমাকে এখানে বিশ্রাম না করতে দেওয়ার জন্য। অথচ তুমি যদি মুহূর্তের জন্যও আমাকে অতিথি রূপে গণ্য করতে তাহলে তোমাকে আমি ধন সম্পদে

পরিপূর্ণ করে দিতাম। এখন আমি চৌকুট দেশে শূন্য শিলা পর্বতে যাচ্ছি। সেখানকার রাজা এবং রাজামাত্য প্রতিবছর আমার পূজার্চনা করবে আর তুমি এখানে আমার অধীনস্থ হয়ে থাকবে। তারপর থেকেই পর্বত মাঝে মাঝে উঁচু হয় আবার শূন্যদেবের পূজা দিলেই স্বাভাবিক উচ্চতায় ফিরে আসে।

বুদ্ধিল এই সমস্ত কল্পকাহিনি কিংবদন্তি খুব মনোযোগ সহকারে শুনত। দেখে মনে হতো এ সমস্ত সে বিশ্বাস করে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে এই সব কল্পকথা বিশ্বাস করত না। সে বলত এ সমস্ত কল্পকাহিনি প্রচারে আমাদের ভিক্ষুদের অবদানও কিন্তু কম নয়। কপিশার উত্তরে আছে এক বিশাল হ্রদ। সেই হ্রদেরও এক কাহিনি আছে। কথিত আছে যে এই হ্রদে একদা এক নাগরাজের বাস ছিল। কণিষ্কের সময়ে সেই নাগরাজ খুব উপদ্রব শুরু করে। নাগরাজ পূর্বজন্মে এক ভিক্ষু ছিল। তার স্বভাব ছিল ক্রোধী। যার ফলে পরবর্তী নাগজন্মেও তার মধ্যে ক্রোধের ভাব থেকেই যায়। একবার এই নাগরাজ এমন বর্ষণ নিয়ে এল, যার ফলে সমস্ত বৃক্ষ বনস্পতি মাটি থেকে উপড়ে গেলো, পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত বিহারে ধ্বস নামল। সংবাদ পেয়ে রাজা কণিষ্ক এলেন এবং বললেন, আমি সমস্ত সরোবরকেই উপড়ে ফেলব। লক্ষ লক্ষ লোক লাগল সেই কাজে। তখন নাগরাজ বুঝল এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। সরোবরই যদি না থাকে তাহলে সে থাকবে কোথায়। অতঃপর সে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধরে কণিষ্কের কাছে যায় এবং কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। কণিষ্ক তাকে বলেন যে তোমাকে বিহারের পুনর্নির্মাণ করতে হবে এবং সেখানে একটি স্তূপ স্থাপনা করবে। বিহারের অধিবাসীদের বলা হলো যে তাদের মধ্যে কেউ একজন যেন সর্বদা সরোবরের দিকে দৃষ্টি রাখে। যদি সেখানে কোনো কালো মেঘের উদ্ভব দেখে তাহলে যেন সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজায়। আজ পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত আছে। আপন ক্রোধের কারণে কখনো যদি নাগরাজ কালো মেঘের সৃষ্টি করে তখনি ঘণ্টা বাজানো হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে কণিষ্কের কাছে করা প্রতিজ্ঞার কথা নাগরাজের মনে পড়ে যায় এবং সে শান্ত হয়ে যায়।

রাজধানীর পশ্চিমোত্তরে, নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত পুরানো বিহারটিকে একদিন দেখতে গেলাম। এখানে দেড় আঙুল পরিমাণ দুটি দাঁত আছে। বলা হয় ও দুটি শাক্যমুনির দুধের দাঁত। তাছাড়া তথাগতর উষ্ণীষ (করোটি), ধাতুপাত্র এবং কেশ রক্ষিত আছে। উপসোথের দিন রাজা এবং তার অমাত্যের দল এখানে পূজা দেন। বিহারের দক্ষিণে রানীবিহার। সেখানে ষাট হাত উঁচু সোনার পাতে মোড়া তামার স্তম্ভ আছে। তার মধ্যেও নাকি বুদ্ধের নানা ধাতু আছে বলে শোনা যায়। কোনো জায়গা দেখার ব্যাপারে বুদ্ধিলের উৎসাহ ছিল আমার চেয়ে বেশি। সে বলে তথাগতর নির্বাণের পর এক হাজার বছর কেটে গেছে তাতেই এই অবস্থা। আরও হাজার দেড় হাজার বছর কাটুক সারা পৃথিবীতে অসংখ্য স্তূপ গড়ে উঠবে এবং সেই সব স্তূপে এত কেশ ও অস্থি ধাতু জমা হবে যা দিয়ে সারা মধ্যমণ্ডলকে ঢেকে ফেলা যাবে।

রাজধানীর দক্ষিণে পীলু পাহাড়। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি পাহাড় আছে দূর থেকে যেগুলিকে কোনো জন্তুর আকৃতির মতো মনে হয়। এই পাহাড়টির আকৃতি অনেকটা পীলু অর্থাৎ হাতির মতো দেখতে। এর কাহিনি হলো যখন লোকনায়ক (তথাগত)

পৃথিবীতে ছিলেন তখন এই পীলু দেবতা তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভগবান তাঁর বারোশত শিষ্যসহ এখানে এসেছিলেন। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে পাহাড়ে দেবতা একটি বড়ো শিলার ওপরে তাঁর আসন স্থির করেন এবং ভিক্ষা দেন। এই শিলার ওপরে সম্রাট অশোক একটি ষাট হাত উঁচু স্তূপ নির্মাণ করেন। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধের ধাতু (শরীরের অস্থি ইত্যাদি) রক্ষিত আছে। পাহাড়ের কাছেই আছে একটি নাগঝর্ণা। তথাগত এবং তাঁর বারোশত শিষ্য এই নাগঝর্ণাতেই দন্ত ধাবন করে মুখ টুখ ধুয়েছিলেন। তাঁদের ইতস্তত নিক্ষিপ্ত দাঁতনগুলিই পরবর্তীকালে বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে।

বর্ষা শেষ হওয়ার মুখে। মহাপ্রবারণার জন্য শুধুমাত্র রাজধানী নয় সমগ্র কপিশার অধিবাসীরাই উৎসব এবং দানের আয়োজন করে। রাজবিহারে চৈনিক রাজপুত্রের পাঁচ শতাব্দী আগের দানের কাহিনিকে আবার স্মরণ করা হয়। সেদিন দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা নৃত্যগীত-বাদ্যসহযোগে শোভাযাত্রা করে রাজবিহারে এল। মধ্যাহ্নে নানা ধরনের সুখাদ্য দিয়ে ভিক্ষুদের আপ্যায়িত করা হলো। এটা ছিল এমন একটা সময় যখন ক্ষেত থেকে ফসল কেটে ঘরে তোলা হয়েছে এবং বাগানে বাগানে নানা ধরনের ফল ফলে রয়েছে। বিহারে বেশ ছোটখাটো একটি আঙুরের স্তূপ তৈরি হয়েছে। দেয়ালে আঙুর শুকানোর পর্ব চলছে।

মহাপ্রবারণা শেষ হলেই আমরা দুজনে ওখান থেকে গান্ধার এবং কাশ্মীরের পথে রওনা হব, ঠিক করলাম।

বুদ্ধিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াটা আমার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের হয়েছিল। কারণ আমি পাহাড়ের অধিবাসী। স্বভাবে একেবারে কূপমন্ডূক। গরমের ভয়ে কদাচিৎ নিচে নামতাম। পৃথিবীতে পাহাড় পর্বত ছাড়া কোনো সমতল ভূমিও হয় এরকম অবিশ্বাস্য কথা আমাদের উদ্যানের অনেকেই বিশ্বাস করেনা। বিদেশ সম্বন্ধে নানা সত্য মিথ্যা কাহিনি শুনে এক ধরনের শংকা মনের মধ্যে আসন গেড়ে বসেছিল। বুদ্ধিল ছিল উজ্জয়িনীর অধিবাসী। তাছাড়া সে তার উপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় সমস্ত মধ্যমণ্ডল পরিভ্রমণ করেছে। প্রথম যখন ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নিই, সেটা ছিল অন্ধকারে আন্দাজে লাফ দেওয়ার মতো। কিন্তু বুদ্ধিলের সঙ্গে পরিচয়ের পর ভ্রমণ এখন অনেক পরিকল্পিত। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য গান্ধার। বর্ষার তিনমাসের অবসরে যাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছি। আমাদের দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সম্বন্ধে এটুকুই বলতে পারি যে একে বলা যায় অটল বন্ধুত্ব।

কপিশা থেকে পরিচিত পথে আবার নগরহারে ফিরলাম। নগরহারে পূর্বদিকের পার্বত্য পথে চলতে হবে আমাদের। বিশ যোজন পথ চলার পর গান্ধার সীমান্ত পাওয়া গেলো। গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুর আমাদের উদ্যানীদের কাছে অপরিচিত নয়। বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) কিংবা জেতবন দর্শনের সৌভাগ্য অনেকের হয়না, কিন্তু পুরুষপুরের মতো পুণ্য নগরী কাছে হওয়ার জন্য অনেকেই সেখানে যায়। একদা পুরুষপুর এক বিশাল নগরী ছিল। নগরীর বাইরের ধ্বংসস্তূপ দেখেই সেটা বোঝা যায়। একসময় পুরুষপুরে লক্ষাধিক পরিবারের বাস ছিল এখন বোধ হয় তার এক দশমাংস পরিবার বাস করে। ধর্মরাজ কণিষ্কের এটাই ছিল প্রধান রাজধানী। তথাগতর বাণী প্রচারের

ক্ষেত্রে কণিষ্ক ছিলেন দ্বিতীয় অশোক। তাঁর নির্মিত অসংখ্য বিহার ও চৈত্য আজও বর্তমান থেকে তাঁর কীর্তি ঘোষণা করে। পুরুষপুর নগর সমতল ভূমিতে অবস্থিত, যদিও দূরে মেঘের মতো পাহাড়শ্রেণী চোখে পড়বে। নগরহার থেকে এখানে আসার পথে এক গিরিপথ (খাইবার) পড়েছিল যেখানে বেশ কয়েকটি দুর্গ দেখতে পেয়েছিলাম। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে এখানকার গিরিপথগুলি খুব কাজে লাগে। কিন্তু শুধুমাত্র গিরিপথ আর তার কাছে নির্মিত দুর্গের ওপরে নির্ভর করে কি গোটা দেশকে রক্ষা করা যায়?

পুরুষপুর আমাদের কাছে প্রচণ্ড শ্রদ্ধার নগরী। একাধিক মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে এই নগর। আর্য অসঙ্গ এবং তাঁর অনুজ বসুবন্ধু এখানেই জন্মেছিলেন। ধর্মত্রাত, মনোরথ, পার্শা ইত্যাদি মহান ধর্মনায়কদের জন্মস্থানও এই পুরুষপুর। বুদ্ধিলের মধ্যে যুক্তিহীন ভক্তিভাব ছিলনা, কিন্তু প্রাচীন স্থান দেখতে তার ইতিহাস, কিংবদন্তি জানতে খুব উৎসাহ ছিল। যে ঘরে অসঙ্গ, বসুবন্ধু এবং বিরচি এই তিন ভাইয়ের জন্ম হয়েছিল এখন সেটি ধ্বংসস্তূপ। নাগরিকদের মতোই বিহারগুলিরও দৈন্য দশা। তাদের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে আর সেই জন্যই পুরাতন সৌধগুলির ঠিক মতো সংস্কার সম্ভব হচ্ছে না।

রাজধানী থেকে দেড় ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পূর্বে এক বিশাল আয়তনের পবিত্র বোধিবৃক্ষ (অশ্বত্থ) আছে যার উচ্চতা প্রায় ষাট হাত। তার ঘন শীতল ছায়া অন্তত এটুকু সান্ত্বনা দিলো যে সে পুরুষপুরের অন্যান্য স্মৃতি চিহ্নের মতো এখনো ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়নি। কিন্তু তার নিকটস্থ মন্দির এবং মন্দিরের প্রতিমা সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। বোধিবৃক্ষের চারদিকে চারটি ধ্যানাবস্থার বুদ্ধমূর্তি। বলা হয় এই বৃক্ষ তথাগতকে শীতল ছায়া প্রদান করেছিল। এই বৃক্ষের নিচে বসে দক্ষিণে মুখ করে তথাগত আনন্দকে বলেছিলেন– আমার নির্বাণের চারশত বছর পর কণিষ্ক রাজা হবে, সে এই জায়গার দক্ষিণে স্তূপ নির্মাণ করবে এবং সেখানে আমার অস্থি রক্ষিত থাকবে। বুদ্ধিল এই কাহিনি শুনে বলল– তথাগত মধ্যমণ্ডলের বাইরে কখনও কোথাও যাননি, এ নেহাতই কল্পকথা।

কণিষ্ক সমগ্র জম্বুদ্বীপের সম্রাট ছিলেন। তাঁর শকবংশ এদেশে বহিরাগত ছিল। শকেরা শৌর্য বীর্যে শ্রেষ্ঠ হলেও জ্ঞানের দিক থেকে পশ্চাৎপদ ছিল। আমাদের উদ্যানেও এখন প্রচুর শক বাস করে। বুদ্ধিল নিজেও উজ্জয়িনীর শক বংশে জন্মেছে। রঙের দিক থেকে খানিকটা বেশি ফর্সা হওয়া ছাড়া অন্যান্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে শকদের এখন আর বিশেষ তফাত করা যায় না। কণিষ্কের অনেক পাষাণ মূর্তি আমি দেখেছি যেখানে তাঁর হাঁটু পর্যন্ত জুতো পরা। ওই রকম জুতো সীতা উপত্যকা কিংবা তারও পিছনের অঞ্চলের যাযাবরদের পরতে দেখা যায়।

কণিষ্ক প্রথমে তথাগতর ধর্ম মানতেন না। একদা তিনি শিকারে গিয়েছিলেন। এক খরগোসের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে একসময় খরগোসটিকে হারিয়ে ফেললেন এবং সামনে এক গাছের নিচে এক রাখাল বালককে দেখলেন, মাটি দিয়ে সে হাত দুয়েক উঁচু এক স্তূপ নির্মাণ করছে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে বালক তথাগতর ভবিষ্যদ্বাণীর

পুনরুক্তি করে বলেছিল– তুমিই সেই রাজা। আমি নিজে যখন সেই মহান স্তূপটিকে পরিক্রমা করছিলাম তখন শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল। রাখাল বালকের সেই দুই হাত উঁচু স্তূপ ঘিরে আজ কত বিশাল স্তূপ নির্মিত হয়েছে। এই স্তূপ সম্বন্ধে এই রকম ভবিষ্যদ্বাণীও শোনা যায় যে এই স্তূপ সপ্তমবার আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যখন অষ্টমবার পুনর্নির্মিত হবে তখন পৃথিবী থেকে তথাগতর ধর্ম লুপ্ত হবে। ইতিমধ্যে স্তূপটি তিনবার পুড়ে গেছে শুনে বুদ্ধিল বলল, এখন থেকে আরও শ'চারেক বছর তথাগতর ধর্ম বিরাজমান থাকবে, তবে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, যেখানে তথাগতর ধর্ম লুপ্ত হবে, সেখানে মূর্খদের ধর্ম জাঁকিয়ে বসবে। তথাগত যে অনাত্মবাদ, প্রতীত্য সমুৎপাদ, সর্বানিত্যতাবাদ-এর দৃষ্টি মানব জাতিকে দিয়েছেন তা তখনই লুপ্ত হতে পারে যখন পৃথিবীতে শুধু মূঢ়দের ভীড় হবে এবং কোথাও কোনো জ্ঞানের চিহ্নমাত্র থাকবে না।

মহাস্তূপের পশ্চিমে কণিষ্ক একটি বহুতল বিহার নির্মাণ করেছিলেন। বিহারের ইমারত স্তূপের ইমারতের মতো সুদৃঢ় না থাকায় এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। সেই ভগ্ন বিহারেও বেশ কয়েকজন সর্বাস্তিবাদি ভিক্ষু বাস করেন। কণিষ্ক তাঁর গুরুদেব পার্শর জন্যও একটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন যেটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ওই বিহারের একটি ঘরে বসে আচার্য বসুবন্ধু তাঁর 'অভিধর্মকোষ' রচনা করেছিলেন। বসুবন্ধুর গুরু আচার্য মনোরথও এখানকার লোক ছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই বসুবন্ধু গুপ্ত সম্রাটদের কাছে সম্মানিত হয়েছিলেন। কণিষ্ক বিহারে তথাগতর ভিক্ষাপাত্র রক্ষিত ছিল। রাজা মিহিরকুল বুদ্ধ-অনুগতদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি ওই ভিক্ষাপাত্রটিকে ভেঙে ফেলেন, পরবর্তীকালে সেটিকে আবার মেরামত করা হয়। এবং সেটিকে মিহিরকুলের নাগালের বাইরে বাহ্লীক দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পুষ্কলাবর্তী (বর্তমানে হস্তনগর (অষ্টনগর), চারসদ্দা–পেশোয়ার থেকে আঠারো মাইল উত্তরে স্বাত পঞ্চকোশের ধারা লণ্ডী এবং কাবুল নদীর সঙ্গমের কাছে অবস্থিত)–কণিষ্ক চৈত্র থেকে দুই যোজন দূরে কুভা নদীর তীরে অবস্থিত নগরীতে আমরা গেলাম। পুষ্কলাবতী নগর হিসেবে পুরুষপুরের চেয়েও প্রাচীন, তবে গান্ধারের অন্যান্য নগরীর মতো এর অবস্থাও করুণ। পশ্চিম নগর দ্বারের বাইরে পশুপতি মন্দির আর পূর্বদিকে সম্রাট অশোক স্থাপিত ধর্মরাজিকা স্তূপ। এখানেও ভগ্নপ্রায় বিহারে কিছু সর্বাস্তিবাদি ভিক্ষুর বাস দেখতে পেলাম। এখানে ষাট হাত উঁচু এক স্তূপ আছে যাকে সবাই অশোক স্তূপ বলে। এই স্তূপের গায়ে কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি সুন্দর সুন্দর চিত্রলিপি উৎকীর্ণ আছে। এখানকার মানুষের বিশ্বাস যে বিগত জন্মে তথাগত সহস্রবার এখানে রাজা হয়ে জন্মেছিলেন এবং প্রতিবারই তাঁর চক্ষুদান করেছিলেন। এছাড়া আরও অনেক জায়গা আছে যেগুলো তথাগতর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

জাতক এবং অবদানে বর্ণিত বহু ঘটনার স্থান এই গান্ধার। আমার বন্ধু বলল, কণিষ্ক শাসনের অনেক আগেই গান্ধার বৌদ্ধ শাসনের এক সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। সেই কারণেই এখানকার বিভিন্ন জায়গাগুলোকে নিয়েই কাহিনি গড়ে উঠেছে। হারীতি চৈত্যের থেকে যোজন দুয়েক দূরে একটি জায়গাতে তথাগত বিগত জন্মে শাম নামে এক বালক হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁর মাতা পিতা উভয়েই ছিলেন অন্ধ এবং শাম ছিলেন

তাঁদের একমাত্র পুত্র। কোনো এক রাজা মৃগভ্রমে শামকে হত্যা করে। রাজা দশরথও ভুল করে অন্ধমুনির সন্তান শ্রবণকুমারকে হত্যা করেছিলেন। তবে শ্রবণকুমার আর জীবন ফিরে পায়নি কিন্তু ইন্দ্রের কৃপায় শাম পেয়েছিলেন।

শামস্তূপের আট যোজন দূরে উরসা নগরী। এখানে তথাগত বিগত জন্মে সুদাম বৈশন্তর রাজকুমার ছিলেন। এখানে একটি স্তূপ এবং একটি বিহার আছে। এই বিহার থেকে আচার্য ঈশ্বর তাঁর শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। নগরীর দক্ষিণ দ্বারের বাইরে একটি অশোক স্তম্ভ বর্তমান। এখানেই এক ব্রাহ্মণ, দানী বৈশন্তর কাছ থেকে তাঁর পুত্রকন্যাকে দান হিসাবে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। যেখানে সেই লোভী ব্রাহ্মণ বৈশন্তর পুত্রকন্যাকে পীড়ন করেছিল, তাদের রক্ত ঝরিয়েছিল, সেখানকার গাছের রঙ আজও লাল। এর কাছেই ছিল ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম। (বৈশন্তর জাতকে এই কাহিনি বিশদভাবে বর্ণিত আছে)

পাণিনির ব্যাকরণ আমার কিছুটা পড়া ছিল আর বুদ্ধিল ছিল এই শাস্ত্রে পণ্ডিত বিশেষ। এখান থেকে নয় যোজন দূরে সেই পাণিনির জন্মস্থান, শলাতুর। শলাতুর গ্রামটি আমাদের দেখবার বাসনা হলো। উরসা থেকে দুই যোজন দূরে উত্তরপূর্বে এক বড়ো পর্বত; সেখানে মহেশ্বরের পত্নী গৌরীদেবীর এক বিশাল দেবালয় আছে। গান্ধার, কপিশা এবং কাশ্মীরে বহুসংখ্যক পাশুপত্যের বাস আছে। তাঁদের কাছে এই দেবালয় অত্যন্ত পবিত্র। এখানে ভস্মধারী পাশুপত পরিব্রাজকদের জন্য একটি সুন্দর মঠ আছে। দেবী মন্দির থেকে ছয় যোজন দূরে উদভান্ড (ওহিন্দে) নগরী। এই নগরীর দক্ষিণে সিন্ধু নদ প্রবাহিত হয়েছে। গান্ধারের এই নগরীকে বেশ জমজমাট দেখলাম। বোধ হয় সিন্ধু নদের তীরে অবস্থানের কারণে বণিক সার্থদের প্রচুর যাতায়াত এখানে ঘটে থাকে।

উদভান্ড থেকে উত্তর পশ্চিমে স্বল্প দূরত্বে শলাতুর গ্রাম। পাণিনির ব্যাকরণ আমাদের কাছে যেন এক কল্পবৃক্ষ। আমরা আচার্যের জন্মস্থানটিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দর্শন করলাম। শলাতুর দর্শন সেরে আমরা আবার উদভান্ডতে ফিরে এলাম। উদভান্ডর কাছে সিন্ধু নদ প্রায় এক ক্রোশের মতো চওড়া। স্বচ্ছ নীলাভ রঙের জল। তবে বর্ষায় এই রঙ থাকে না। সিন্ধু নদ অতিক্রম করে তিনদিন চলার পর পৌঁছালাম তক্ষশিলায় (শাহজীদী ভেরী)। তক্ষশীলা আগে গান্ধারের অংশ ছিল, এখন আলাদা। তবে উভয়েই মিহিরকুলের শাসনাধীন। শ্বেতহুণ যেথাদের (শ্বেতহুণ) আক্রমণের আগে তক্ষশিলা খুবই সমৃদ্ধ নগর ছিল। এখানকার ভূমি উর্বর এবং অধিবাসীরা মিত্র মনোভাবাপন্ন। এখানে ধর্মরাজ অশোক এবং কণিষ্ক উভয়ের স্থাপিত অনেক স্তূপ ও বিহার আছে। অশোকের প্রতিষ্ঠিত মহাচৈত্য সম্বন্ধে অনেক কাহিনিও প্রচলিত আছে। এখানে তথাগত বিগত কোনো জন্মে আপন শির কেটে তাকে সহস্র জন্ম পর্যন্ত দান করেছিলেন। সেই জন্যই এই জায়গার নাম তক্ষশির যা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়ে তক্ষশিলা হয়েছে। সৌত্রান্তিক আচার্য কুমারলাত এখানেই জন্মেছিলেন। সম্রাট অশোকের পুত্র কুনাল তাঁর বিমাতার ছলনায় এখানেই অন্ধ হয়েছিলেন। কুনালের বিমাতার ইচ্ছা ছিল না যে অশোকের পর তাঁর অন্যতম পুত্র কুনাল জম্বুদ্বীপের শাসক হন। সেই জন্য রানি

কুনালের বিরুদ্ধে রাজকোষ থেকে ধন সম্পদ চুরির অভিযোগ আনেন এবং কুনালের দুই চোখ উপড়ে নেওয়ার শাস্তি বিধান করে রাজাজ্ঞা পাঠান। রাজাজ্ঞা পাওয়া মাত্রই, কুনাল নিজে তাঁর দুই চোখ উপড়ে দেন। আজও তাঁর স্মরণে নির্মিত স্তূপে চোখ ফিরে পাওয়ার বাসনায় অন্ধরা পূজা দেয়। আজ অশোক, কুনাল কেউ নেই, মৌর্য বংশের বৈভবের কালও গত হয়েছে বহুকাল, কিন্তু আজও দলে দলে লোক এই জায়গা দর্শন করতে আসে। এক সময় সুদূর কাশী, মগধ, বিদেহ, কোশল থেকে তরুণের দল জ্ঞানার্জনের জন্য তক্ষশিলায় আসত। আজ এই নগরীর শ্রীহীন অবস্থা দেখে সংসারের অনিত্যতার কথাই বারংবার মনে পড়তে লাগল। বুদ্ধিল বলল, নতুনের উন্মেষের জন্যই পুরাতনের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। ধ্বংস দেখে আমাদের দুঃখিত হওয়াই শেষ কথা নয় পাশাপাশি পৃথিবীতে যে নবনির্মাণ ঘটে চলেছে সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। যদি পুরাতন না সরে যায় তাহলে নবযুগের বসুবন্ধু-দিঙনাগের মতো জ্ঞানীদের আমরা কিভাবে পেতে পারি?

কাশ্মীর

তক্ষশিলা থেকে আমরা সোজাসুজি পূর্বদিকে যাত্রা করে; সমতল ভূমি পার করে শাকলা (শিয়ালকোট) হয়ে মধ্যমণ্ডলের দিকে অগ্রসর হতে পারতাম। মধ্যমণ্ডলের গ্রীষ্মের উত্তাপ আমাদের সহ্য করতে হবে, যদি সেখানে যেতে চাই। আবার কাছেই কাশ্মীর, সেই জায়গাটাও দেখার ইচ্ছে ছিল। কাশ্মীর ভ্রমণের মধ্যে গ্রীষ্মকালটাও কাটিয়ে দেওয়া যাবে। এই চিন্তাও ছিল। অতএব আমরা পূর্বোত্তর দিশাতে চলা শুরু করলাম। কাশ্মীর উপত্যকা অতি রমণীয়। ফুল, ফল, কুমকুম (বেসর), অশ্ব এবং নানা ধরনের ঔষধি গাছের জন্য এই উপত্যকা বিখ্যাত। এখানকার লোকের পোশাক পরিচ্ছদ আমাদের উদ্যানীদের মতো। বৌদ্ধ এবং পাশুপত এই দুই সম্প্রদায়ের লোকই এখানে অধিক সংখ্যায় বাস করে। উপত্যকায় কয়েকশো বিহার এবং কয়েক সহস্র ভিক্ষুর উপস্থিতি এই জানানই দিচ্ছে যে মিহিরকুল তত অত্যাচারী অসহিষ্ণু রাজা নন, যতটা তাঁর সম্বন্ধে প্রচারিত আছে। হয়তো যুবা বয়সে উক্ত দোষ তাঁর মধ্যে অনেক পরিমাণে ছিল, কিন্তু এখন সে সূর্য, পশুপতি এবং বুদ্ধকে একই দৃষ্টিতে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে দেখে থাকে। যার ফলে নিজ নিজ ধর্মে অটল থেকে লোকে এখানে স্বচ্ছন্দভাবে বাস করছে। মিহিরকুলের রাজধানীতে পৌঁছে আমার মধ্যে হাল্কা শিহরণ জেগেছিল। আমার তরুণ বয়সের প্রিয়তমা তখনও হয়তো মিহিরকুলের অন্তঃপুরেই ছিল। বুদ্ধিল আমার বাল্যপ্রেমের কাহিনি খুব সহানুভূতির সঙ্গে শুনল, কিন্তু তেমন বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখালনা, যাতে আমি আমার হারানো প্রেম সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠি।

কাশ্মীর চিরকালই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের ভূমি ছিল, আজও আছে। অতএব সবকিছু ভুলে এখানকার দর্শনীয় স্থান দর্শনেই মনোনিবেশ করলাম। প্রথমেই গেলাম কণিষ্ক পুত্র হুবিষ্ক বিহারে। বিহারের ভিক্ষু সংখ্যা নাকি আগের তুলনায় এখন অনেক কম। এই কাশ্মীরেই রাজা কণিষ্ক তথাগতর শিক্ষা সমূহকে একত্র করে তার একটু সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য এক মহাসংগীতি (মহাপরিষদ) আহ্বান করেছিলেন। অশোকের কালে তথাগতর

শিক্ষা যে অবস্থায় জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তার মধ্যে বেশ কিছু স্ববিরোধিতা ছিল। যার জন্য অশোক এক মহাসংগীতির আহ্বান করেছিলেন। সেই মহাসভায় মৌদগলিপুত্র তিস্যর তত্ত্বাবধানে বুদ্ধের উপদেশবলীর এক সংকলন হয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে আবার কণিষ্কের আমলে বৌদ্ধদের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয় তখন কণিষ্ক তাঁর গুরু পার্শকে অনুরূপ দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেন। এই মহাসংগীতিতে সারা মধ্যমণ্ডলি এবং সমগ্র গান্ধার থেকে বিভিন্ন পণ্ডিত ও ভিক্ষুরা এসেছিলেন। বসুমিত্র এই মহাসভায় অংশ নেননি তবে ভিক্ষু বেশে তিনি বিহারের দ্বার পর্যন্ত এসেছিলেন। বুদ্ধিল বলল, ভগবান তথাগতর নির্বাণের পর আয়ুষ্মান মহাকাশ্যপের সঞ্চালনায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহাতেও অনুরূপ এক মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানেও প্রথমে ভিক্ষু আনন্দ আমন্ত্রিত হননি পরে তাঁকেও আহ্বান করা হয়েছিল। দীর্ঘকাল ধরে আলোচনার পর বুদ্ধের উপদেশাবলীকে সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম এই তিন পিটকে সংগ্রহ করা হয়। এবং সমস্ত পিটক তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ করা হয়। আমার মনে হচ্ছিল যদি তাম্রপত্রগুলোকে পড়া যেত। কিন্তু হায়, কে বলতে পারে ওগুলো কোন স্তূপের মধ্যে রক্ষিত আছে। মহাসভার পর সমগ্র কাশ্মীরকে রাজা কণিষ্ক ভিক্ষু সংঘকে অর্পণ করেন। অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও বিহারে স্তূপে তথাগতর নানা ধাতু, যেমন অস্থি, দন্ত, কেশ পাত্র, চীবর, ইত্যাদি রক্ষিত আছে। তবে বুদ্ধিলের প্রভাবে এই সমস্ত ধাতুর বাস্তবতা সম্বন্ধে আমার মনেও আজকাল সন্দেহ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। বিভাষা এবং বৈভাষিক দর্শনের পীঠস্থান হওয়ার কারণে এখানে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে শিক্ষার্থী আসে। তবে এই সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বেশ কিছু বিহারতো ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়েছে। বৈভাষিকের দল সর্বাস্তিবাদী যাদের আমরা বলি হীনযানী এবং আমাদের মহাযানী। একমাত্র সিংহলকে বাদ দিলে সর্বত্র মহাযানীদের সংখ্যাই বেশি। যদিও পন্থার দিক থেকে আমি মহাযানী, কিন্তু হীনযানের বিনয়, তাঁদের ভিক্ষুদের বিনয় পালন এবং সরল বেশভূষা, সাদাসিধা পূজার্চনা, সর্বোপরি তাঁদের প্রাচীন পরম্পরা আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল। মূলত আমি শ্রদ্ধা প্রধান, বুদ্ধিলের মতো বুদ্ধি প্রধান নই। সেজন্যই তথাগতর স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলির জীর্ণ দশা দেখে আমার কষ্ট হয়; সেখানে বুদ্ধিল বলে, পুরাতনের গর্ভেই নবীনের জন্ম।

পুনচ–আশ্বিন পূর্ণিমা কাটিয়ে আমরা কাশ্মীর ত্যাগ করলাম। পাহাড় বা সমতল, বর্ষাতে কোথাও ভ্রমণ করা সুখকর নয়। পথ ভাঙা, সেতুর অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ, সর্বোপরি যে কোনো মুহূর্তে পাহাড় থেকে ধ্বস নামার আশংকা। এ সমস্ত কারণেই তথাগত ভিক্ষুদের বর্ষায় চারিকা নিষিদ্ধ করেছেন। কাশ্মীর চারদিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা, শুধুমাত্র একটা দিক উন্মুক্ত। ওই পথে নদীগুলি সমতল ভূমির দিকে বয়ে গেছে। আমরা নদীর গতিপথ ধরে নিচে নামলাম কিন্তু কিছুদূর চলার পর আবার পাহাড় পার হতে হলো। আমরা যদি আরো কিছুদিন দেরি করে আসতাম তাহলে পাহাড়ের মাথায় বরফ দেখতে পেতাম। আরও দুর্লজ্ঘ পাহাড় অতিক্রম করে রাজধানীর দক্ষিণে একটি ছোট প্রদেশে গিয়ে পৌছালাম। জায়গাটির নাম পুনচ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পুনচ কাশ্মীরের সমতুল্য না হলেও কাছাকাছি। তবে কাশ্মীরের চেয়ে এর উচ্চতা কিছু বেশি

সে জন্যই এখানে গাছে আমের ফলন দেখতে পেলাম। পুনচ থেকে নিচে নেমে আরেকটি পার্বত্য প্রদেশে পৌছালাম, নাম রাজপুরী (রাজৌরী)। রাজপুরীর পর থেকেই অন্য এক জগৎ, বিস্তৃত সমতলভূমি। কপিশা থেকে রাজপুরী পাহাড়ি এলাকা। পার্থক্যের মধ্যে আহার বিহার পোশাক পরিচ্ছদে কোথাও একটা ঐক্য দেখা যায়। পাহাড়ের অধিবাসীরা সোজা, সরল, ব্যবহারিক জীবনে কিঞ্চিৎ রুক্ষ, যুদ্ধ বিগ্রহে সকলের আগে, জ্ঞান চর্চায় কিছুটা পিছিয়ে, সর্বোপরি জীবনে কোনো কৃত্রিমতা নেই।

কান্যকুব্জক (৫৪২-৫৪৩ খ্রিঃ)

রাজপুরীর পর আমাদের যাত্রাপথ ছিল দক্ষিণপূর্ব দিশাতে। দুদিন চলার পর আমরা চন্দ্রভাগা নদীর তীরে এলাম এবং নদী অতিক্রম করে শাকলার দিকে অগ্রসর হলাম। শাকলা মিহিরকুলের অন্যতম রাজধানী ছিল, শীতে সে এখানে এসে বাস করত। মিহিরকুলের রাজ্যসীমা যখন যমুনা এবং নর্মদার তটভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, শাকলাও তখন আয়তনে বিশাল ছিল। মধ্যমণ্ডলে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মিহিরকুল কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে এবং তারপর থেকে সে অধিকাংশ সময় কাশ্মীরেই কাটায়। কথিত আছে মিহিরকুল শাকলাতে বাস করার সময় কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষুর ব্যবহারে রুষ্ট হয়। এবং তথাগতর ধর্মকে উচ্ছেদ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। তারপর সে প্রচুর বৌদ্ধবিহার এবং স্তূপ ধ্বংস করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দলে দলে প্রাণের ভয়ে দেশত্যাগী হয়। মিহিরকুল তার পিতা তোরমানের মতো দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষায় মধ্যমণ্ডলে অভিযান চালিয়েছিল। প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও পরে সে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বালাদিত্যের হাতে বন্দী হয়। বন্দী মিহিরকুলকে দেখে বালাদিত্যের মায়ের করুণা হয় এবং তাঁর কৃপাতেই মিহিরকুল প্রাণে বেঁচে যায় এবং মুক্ত হয়। রাজা বালাদিত্যের বাহিনীর বৌদ্ধ যোদ্ধারা মিহিরকুলের বিপক্ষে অসীম বীরত্বের পরিচয় রেখেছিল। মধ্যমণ্ডল ছাড়া গান্ধার, কাশ্মীর, কপিশার বৌদ্ধরাও বালাদিত্যের প্রতি অনুরক্ত ছিল। বলা বাহুল্য এই অবস্থা মিহিরকুলের ভালো লাগেনি, তাছাড়া তার মনে হয়েছিল যে তার সৈন্যবাহিনীর বৌদ্ধ সৈনিকেরা যথোচিত নিষ্ঠা সহকারে যুদ্ধ করেনি। তারপর থেকেই সে বৌদ্ধসংহারে মেতে ওঠে। পূর্বদিকে পরাজিত হয়ে মিহিরকুল শাকলাতে (শিয়ালকোট) এসে পৌঁছায়। এসে দেখে তার বন্দিত্বের সংবাদ পেয়ে ছোটভাই রাজ সিংহাসন দখল করে নিয়েছে। যুদ্ধ করে সিংহাসন পুনরুদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে সে কাশ্মীরে আশ্রয় নেয়। কাশ্মীরের রাজা তাকে আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ রাজ্যে আশ্রয় দেয়। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মিহিরকুল সুযোগ পেয়েই রাজাকে হত্যা করে এবং নিজে কাশ্মীরের রাজা হয়ে বসে।

শাকলা দেখে তার ঐতিহ্যশালী ইতিহাসের কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। মিহিরকুল এখানকার অন্তিম সংঘস্থবির সিংহকে হত্যা করেছিল। শাকলা কোনো এক সময় মিহিরকুলের চেয়ে অনেক শক্তিশালী রাজা মিলিন্দের (মিনান্দার) রাজধানী ছিল। মিলিন্দ যবন (গ্রিক) হওয়া সত্ত্বেও তথাগতর শাসনের প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন ছিলেন এবং সেই কারণে লোকে তাঁকে অশোক এবং কণিষ্কের সঙ্গে তুলনা করে ধর্মরাজ আখ্যা

দিয়েছে। পণ্ডিত নাগসেনের সঙ্গে মিলিন্দর ধর্মালোচনা 'মিলিন্দ প্রশ্ন' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। বুদ্ধিলের অনুগ্রহে গ্রন্থটি কাশ্মীরে থাকাকালীন সময়ে পড়েছিলাম। আজ সেই মহান রাজধানীকে স্বচক্ষে দেখলাম। এখানেই একদা আচার্য বসুবন্ধু 'পরমার্থ সত্ত্বশাস্ত্র' গ্রন্থের রচনা করেছিলেন। নাগসেন নিজেও এখানকার বিহারের অধিবাসী ছিলেন। ভদ্রকল্পের চার বুদ্ধ এখান থেকেই উপদেশ দিয়েছেন। এখনো তাঁদের পদচিহ্ন বর্তমান।

পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমতলে নামার পথ যথেষ্ট নিরাপদ নয়। বিশাল অঞ্চল জুড়ে গহন অরণ্য যেখানে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু জানোয়ার যথেচ্ছ বিচরণ করে। চতুষ্পদ শত্রুর চেয়েও ভয়ঙ্কর দ্বিপদ শত্রুর ভয়ও প্রতি পদে পদে। সেজন্য আমরা এমন সমস্ত সার্থবাহ (বণিক) দলের সঙ্গ নিতাম, যাদের সঙ্গে বেশ বড়ো সংখ্যায় সশস্ত্র রক্ষী দল থাকত। এমনও হতো যে বেশ কয়েকদিন চলার পরেও বনের শেষ হতো না। আমাদের দুজনকে জঙ্গলে বাঘ সিংহের মুখে পড়তে হয়নি আবার দস্যু তস্করের মুখোমুখিও হইনি, তবে এটা ছিল নেহাতই সংযোগের ব্যাপার। শাকলা থেকে রওনা হয়ে পৌছালাম চীনভুক্তিতে। তখনো জানিনা যে ভবিষ্যতে চীনের মাটিতেই আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়বে। চীনভুক্তি নামটি অদ্ভুত হলেও এই ইতিহাস জানা ছিল। কণিষ্কের দরবারের চীনা রাজকুমার এখানে অনেককাল কাটিয়েছিলেন। চীনভুক্তির বাসিন্দারা বেশ অবস্থাপন্ন। চীনভুক্তি থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কুড়ি যোজন দূরে এক পাহাড়ের অভ্যন্তরে তমসাবন সংঘারাম। তমসাবন বিহার অত্যন্ত প্রাচীন এবং বিখ্যাত। এখানে ধর্মরাজ অশোকের প্রতিষ্ঠা করা আট হাত উঁচু একটি স্তূপ আছে। তমসাবন থেকে ছয় যোজন দূরে জলন্ধর। গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুর প্রভাবে এই দেশ ধনধান্যে পরিপূর্ণ। এখানে অর্ধশতেরও বেশি সংঘারাম আছে। এখানকার কয়েক সহস্র ভিক্ষু মহাযান এবং হীনযান উভয় পন্থাকেই মান্য করে। বৌদ্ধ ছাড়া শৈব মতাবলম্বীদের সংখ্যাও প্রচুর। কাশ্মীর ও কেদারখণ্ডের মধ্যবর্তী হিমালয় ভূমির নামও জলন্ধর। এখান থেকে শতদ্রু (সতলেজ), বিপাশা (বিয়াস), ইরাবতী (রাভী) এবং চন্দ্রভাগা (চেনাব) ইত্যাদি প্রধান নদীগুলি উৎপন্ন হয়েছে। জলন্ধর থেকে দক্ষিণ পূর্বে চলে আমরা পৌছালাম যমুনা নদীর তীরে। আমরা এখন মধ্যমণ্ডলে পৌছে গেছি। মধ্যমণ্ডলে আমরা প্রথম পদার্পণ করলাম শ্রুঘ্ন (সুখ) নগরে। নগরীর অবস্থান যমুনার পশ্চিম তীরে। শ্রুঘ্ন নগরীর রাজ্যসীমা (সাহারানপুর) পূর্বদিকে গঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত। শ্রুঘ্নতে পাশুপত ও অন্য ধর্মের লোকই বেশি। সংঘারামের সংখ্যা খুবই কম এবং ভিক্ষুরা সকলেই হীনযানপন্থী। এখানকার পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কথিত আছে ভগবান তথাগত চারিকা (ভ্রমণ) করতে করতে একবার এখানে এসেছিলেন। শ্রুঘ্ন থেকে বত্রিশ যোজন দূরে গঙ্গা প্রবাহিত। এখানেই গঙ্গা হিমালয় থেকে সমতলভূমিতে প্রবাহিত হয়েছে। স্নানকে যারা ধর্ম পালনের অন্যতম অঙ্গ মনে করে তারা এখানে স্নান করে। বিগত জন্মের পাপক্ষালনের জন্য লোকে এখানে গঙ্গায় ডুবে প্রাণ পর্যন্ত দেয়। যাদের সেই সৌভাগ্য হয়না, মৃত্যুর পর তাদের অস্থি এখানে বিসর্জিত হয়। এর কাছেই কন্‌খল (মায়াপুরী) নগরী। যেটি পাশুপত ধর্মের অনুরাগীদের কাছে বিশেষ মহত্ত্বপূর্ণ।

শতদ্রুর পূর্বতীরে এসে আমার মন বিশেষ শ্রদ্ধালু হয়ে উঠল। আমি মধ্যমণ্ডলের সেই পুণ্যভূমিতে পদচারণা করছি যেখানে একদিন তথাগত নিজে বিচরণ করেছেন। এখানেই গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী অংশ কুরুভূমি। 'প্রতীত্য সমুৎপাদ' এবং 'মহানিদান'-এর মতো দর্শন-সারভূত সূত্র এখানেই উপদিষ্ট হয়েছিল। কুরুভূমি থেকে তথাগতর নিজ জন্মভূমি অনেক দূরে। পথে পড়ে শ্রাবস্তী বৈশালী, বারাণসী, রাজগৃহ। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ এখান থেকেই দিয়েছেন। বুদ্ধিল হীনযান ও মহাযান উভয় পন্থারই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশদভাবে জানত। ও বলল, প্রাচীন আচার্যরা তাঁদের সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন–কুরুদেশের ভূমি সুন্দর, এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত অনুকূল, যার জন্য এখানকার অধিবাসীরা বুদ্ধিমান ও জ্ঞানানুসন্ধানি হয়। এখানকার পানিহারিনরাও (জলবহনকারিণী) জলের ঘাটে বসে গম্ভীর দর্শনশাস্ত্র কিংবা ধর্মালোচনা করে। তাঁরা আরও বলেছেন যে ভূমিতে ভগবান তথাগত অনাত্মবাদের দর্শন প্রচার করেছেন, সেই ভূমিতেই কিছুকাল আগেও প্রবাহণ এবং যাজ্ঞবল্ক্য আত্মবাদের উপদেশ দিয়েছেন। যে ভূমিতে আত্মবাদ (উপনিষদের তত্ত্ব) বিকশিত হয়েছিল, সেই ভূমিতেই তথাগত অনাত্মবাদের সিংহনাদ করেছিলেন।

বুদ্ধিল যেহেতু ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেছিল সেই কারণে বৌদ্ধ শাস্ত্রাদি ছাড়া ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গেও সে ভালোভাবেই পরিচিত ছিল। সে নিজে মহাযান পন্থার অনুগামী হলেও হীনযানের অনেক নিকায় সম্পর্কে তার বিস্তৃত জ্ঞান ছিল। তার মধ্যে কোনো বিষয়েই অন্ধ বিশ্বাস ছিল না। বুদ্ধিল বলত, নরেন্দ্র, সত্যযুগ আমরা পিছনে ফেলে আসিনি আগামী দিনেই আসবে সেই যুগ। জ্ঞানের আলোকে মানুষের মনের অন্ধকার কেটে যাবে। যেমন যেমনভাবে মানুষের মন থেকে অজ্ঞানতা দূর হবে তেমন তেমন সেই জায়গায় লোকহিতকর চিন্তা স্থান গ্রহণ করবে।

শ্রুঘ্ন কুরু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর গঙ্গার ওপারে ছিল পাঞ্চাল দেশ। অনেক বৌদ্ধসূত্রে আমরা পাঞ্চালের নাম পেয়েছি। বুদ্ধিল আমাকে বলল, অনেক কাল আগে এই কুরু পাঞ্চাল একই জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জনগোষ্ঠী মাঝে মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হতো। ভূমস্য রাজা তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন। পাঁচপুত্রের আলয় হিসেবে এই জায়গার নাম হয় পাঞ্চাল। এই বংশের বড়ো ছেলের প্রপৌত্র ছিলেন রাজা দিবোদাস এবং তাঁর পুত্র সুদাস। ওই সময়কালেই বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজের মতো ঋষিদের জন্ম হয়েছিল, যারা বেদের প্রাচীন সূত্র রচনা করেছিলেন। বুদ্ধিল বলল, মধ্যমণ্ডলের একদা প্রভাবশালী রাজবংশ আরও পূর্বদিকে বসবাস করত। মগধ ও কৌশল ছিল তাদের প্রধান কেন্দ্র। ওখানেই নন্দ, মৌর্য, শুঙ্গ ও গুপ্ত বংশের মতো রাজবংশের উত্থান ঘটেছে। তারপর সময় আবার দিক পরিবর্তন করেছে যার ফলে পাঞ্চাল রাজ্য আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এখন পাঞ্চালে একই সঙ্গে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বাস করেন। কান্যকুব্জ (কনৌজ) এই পাঞ্চালেরই রাজধানী।

বুদ্ধিলের কাছে পাঞ্চাল রাজ্যের ইতিহাস শুনছিলাম। প্রথম দিকে উত্তরে হিমালয় থেকে আরম্ভ করে গঙ্গা যমুনার উভয় তট পর্যন্ত পাঞ্চাল রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পাণ্ডবদের

আমলে তাদের গুরু দ্রোণাচার্য যুদ্ধে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে পরাজিত করেন এবং পাঞ্চাল রাজ্যকে উত্তর দক্ষিণে ভাগ করে গুরু দ্রোণাচার্য উত্তর পাঞ্চালকে নিজের অধিকারে রাখেন। অহিছত্র এবং কাম্পিল্য যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ পাঞ্চালের রাজধানী হয়। পরবর্তী কালে কাম্পিল্য নগরীর গুরুত্ব নানা কারণে হ্রাস পায়। বর্তমান কান্যকুব্জ এখন শুধুমাত্র পাঞ্চালের রাজধানী নয়, সে সমগ্র মধ্যমণ্ডলেরই রাজধানী। বর্তমান কুরু পাঞ্চাল, কোশল, কাশী, বজ্জী, বিদেহ, বৎস, চেদী, সুবসেন (ব্রজ) এবং দর্শান (বুন্দেলখণ্ড) ইত্যাদি সমগ্র রাজ্যই কান্যকুব্জের রাজা মৌখারী বংশীয় ঈশ্বরবর্মার শাসনাধীন।

গঙ্গা পার হয়ে এবার আমাদের যাত্রাপথ ছিল উত্তর পাঞ্চালের (রোহিলখণ্ড) শস্য শ্যামল সমৃদ্ধ অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। শীতে মাঠ-ভরা গম আর জোয়ারের ফসল, মন্দ বাতাস সেখানে মাঝে মধ্যে ঢেউ তুলছে। একদা উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রে বর্তমানে কান্যকুব্জের অধীন একজন সামন্ত রাজার বাস। এখানেও দেখলাম পাশুপত ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকের বাস। সম্মিতিয় নিকায়ের এখানে দশটি সংঘারাম আছে। রাজধানীর বাইরে নাগ সরোবর, তার কাছে অশোক নির্মিত একটি স্তূপ বর্তমান। কথিত আছে, এখানে তথাগত সাতদিন ধরে নাগরাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন। একটি বিহার দেখলাম, যেটি নির্মাণ করেছিলেন শক ক্ষত্রপ ফরগুল। এখানে অনেকে দান করে। বুদ্ধিল একটি পাষাণ মূর্তিতে ক্ষোদিত– 'ভিক্ষুস্য ধর্মঘোষস্য ফরগুল বিহারো অহিছত্রায়া' পড়ে বলল, তথাগত ভিক্ষুদের অপরিগ্রাহী হতে বলেছিলেন। সোনারূপা স্পর্শ করা তাদের বারণ ছিল। কিন্তু ভিক্ষু ধর্মঘোষ তথাগতর শিক্ষাকে জলাঞ্জলি দিয়ে এই ফরগুলি বিহারের একটি প্রকোষ্ঠে ধনবৈভবের প্রদর্শনী করেছেন। আমরা ফরগুল বিহারেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। বিহারের ভিক্ষুরা অত্যন্ত আন্ত রিকতার সঙ্গে আমাদের গ্রহণ করেছিলেন। যদিও আমরা মহাযান অনুগামী ছিলাম, কিন্তু মহাযানের কোনো নিজস্ব বিনয় পিটক না থাকায় প্রয়োজনে আমরা হীনযান পিটককেই অনুসরণ করতাম। মহাযান মতের মধ্যে নিহিত উদারতা এবং আচার্য দিঙনাগ ও বসুবন্ধুর প্রমাণশাস্ত্র মানুষের মন থেকে সঙ্কীর্ণতা অনেকটা দূর করতে পেরেছিল। যার ফলে নিকায় সম্পর্কিত গোঁড়ামি থেকে আমরা মুক্ত হতে পেরেছিলাম। একই কথা এখানকার ভিক্ষুদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। ফরগুল বিহারের প্রাচীন স্তূপ, প্রতিমা গৃহ, প্রতিমার মূর্তি, সমস্তই লাল পাথরে তৈরি। বুদ্ধিল বলল, বিহার নির্মাতা শকক্ষত্রপের রাজধানী ছিল মথুরায়, যেখানে ওই পাথর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। গুপ্ত বংশের আমলে রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র ও সাকেত (অযোধ্যা) তখন বিন্ধ্য পর্বতের পাথর নির্মাণ কাজে বেশি ব্যবহৃত হতো। পুরানো নগর, তার শ্রীহীন বিহার আর স্তূপ দেখে আমার খুব কষ্ট হতো। অহিছত্রে থাকাকালীন আমি আর বুদ্ধিল অনেকবার পাশুপত পরিব্রাজকদের মঠে গিয়েছি। তাঁদের সঙ্গে আমাদের সহজ সরলভাবে আলোচনা হতো। পরিব্রাজক বুদ্ধ অনুগামী হোক কিংবা পাশুপত ধর্মের; সর্ব অবস্থাতেই তাঁরা পরিব্রাজক। বিভিন্ন দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁদের আছে। পর্যটন মানুষকে কাছে টানে ধর্মের ভেদাভেদ ভুলিয়ে দেয়। পাশুপত পরিব্রাজকেরা অঙ্গে ভস্ম

মেখে মাথায় জটা রেখে আপন তিতিক্ষা এবং ব্রতনে নিবিষ্ট থাকে। বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে উচ্চবর্ণের মধ্যে তাঁদের সম্মানও অনেক বেশি। বৌদ্ধদের তাঁরা হয়তো কিছুটা হীন দৃষ্টিতে দেখতেন, কিন্তু ব্যবহারে তার প্রকাশ পেতনা। কারণ একটা কথা তাঁরা উপলব্ধি করতেন যে সাধারণভাবে অধিকাংশ বৌদ্ধ ভিক্ষুই যথেষ্ট জ্ঞানী।

শুধু ফরগুল বিহারেই নয়, শকরা এরকম অনেক বিহার বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করেছে। শক এবং তাঁদের আগে আসা যবনেরা (গ্রিক) তথাগতর ধর্মের মধ্যেই সাম্য ও সমদর্শিতার রূপ দেখতে পেয়েছিল। ব্রাহ্মণেরা শাসক হিসেবে তাঁদের মানতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু তাঁদের সমান মর্যাদা দিতে রাজি হয়নি। বৌদ্ধদের মধ্যে জাতিভেদ না থাকায় একই বিহারে শক, যবন এবং অন্যান্য ভিক্ষুরা আত্মীয়ের মতো বাস করত। ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রমবাদীদের উগ্রতা কমতে আরম্ভ করল এবং শক ও যবনেরা দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিশে গেলো। তাদের মধ্য থেকে অনেকে ক্ষত্রিয় হয়ে গেলো, কিছু ব্রাহ্মণও হয়ে যায়, যারা সূর্য পূজা করত। সেইসব ব্রাহ্মণদের পূজিত সূর্যের হাঁটু পর্যন্ত জুতো পরা মূর্তি অনেক মন্দিরে শোভা পাচ্ছে। ঠাণ্ডার কারণেই শকেরা জুতো পরত। সেই জুতো পরা বিজয়ীর মূর্তিই রূপান্তরিত হয়েছে সূর্য মূর্তিতে, অথচ জুতো পায়ে সেই মূর্তির দর্শন নিষিদ্ধ। শক, যবন, এবং শ্বেতহুণদের বর্ণ গৌর ছিল। তাদের কেশ ছিল পিঙ্গল বর্ণের। পতঞ্জলি ব্রাহ্মণদেরও অনুরূপ আকৃতির কথা বলেছেন। 'গৌর শুচ্যাচারঃ কপিল পিঙ্গলকেশ ইত্যোমাদি অভ্যন্তরাণ ব্রাহ্মণ্যে গুণান কুর্বন্তি' (মহাভাষ্য ২/১২ খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক)। বুদ্ধিল নিজেও শক ব্রাহ্মণের বংশজাত। একটা সময়ের পর ব্রাহ্মণেরা বাধ্য হয়ে শকদের উচ্চকুলের মর্যাদা দেয়। শকরা প্রথম দিকে যাযাবর চরিত্রের ছিল কিন্তু দীর্ঘ শতাব্দী ধরে শাসন ক্ষমতায় থাকার ফলে ধীরে ধীরে তারা নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়।

অহিছত্রে আমাদের বেশ কিছুদিন থাকা হলো। এখান থেকে গঙ্গা অতিক্রম করে যে অঞ্চলে গিয়ে পৌছালাম সেটাই দক্ষিণ পাঞ্চাল। কাম্পিল্য এখন একটি গ্রাম মাত্র আর তার চারদিকে বহুদূর পর্যন্ত প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ ছড়ানো। এখান থেকে এগিয়ে আমরা পৌছালাম সংকাস্যতে (সংকিশ)। এখানেও দেখলাম অতীত বৈভবের ধ্বংসস্তূপ। সংকাস্যর গা ঘেঁসে একটি ছোট নদী বয়ে গেছে যেটি কান্যকুব্জের কাছে গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় এই নদী দিয়ে বড়ো বড়ো বাণিজ্য নৌকা যাতায়াত করতে না পারার ফলে সংকাস্যর উন্নতি থেমে আছে যেটা কান্যকুব্জতে নেই।

কান্যকুব্জ–সংকাস্য থেকে নদীর তীর ঘেঁসে আমরা কান্যকুব্জর উদ্দেশে চলা শুরু করলাম। উত্তর দক্ষিণ উভয় পাঞ্চালই সবুজ। শস্যশ্যামলা। চলার পথে কদাচিৎ আমরা অরণ্যের দেখা পেয়েছি। অধিকাংশ জায়গা জুড়েই হয় জনপদ না হয় ক্ষেতখামার। গ্রামের প্রবেশ পথে প্রায় সর্বত্রই বিশাল বিশাল বাগান। রাজধানী যত সমীপে আসছে তত বাগান, তার মধ্যে সুন্দর প্রাসাদ ইত্যাদির সংখ্যাও বাড়ছে। রাজধানীতে লক্ষ্মী অবশ্যই বাস করেন, আবার শত্রু আক্রমণের প্রথম আঘাত, মৃত্যু, হত্যালীলা, ধ্বংস সবই এই রাজধানীকেই বহন করতে হয়। একটি নগরী হিসেবে

কান্যকুব্জ বহুকাল থেকেই পরিচিত কিন্তু মৌখারি রাজবংশই একে রাজধানীর মর্যাদা দিয়েছে। বারাণসী, কৌশাম্বীর মতো জায়গা থাকতে মৌখারিরা সাকেত কিংবা পাটলিপুত্র ছেড়ে এখানে কেন রাজধানী করল? আমার প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধিল বলল, মধ্যমণ্ডলের সবচেয়ে কঠিন শত্রুরা পশ্চিম থেকেই এসেছে, অতএব এরকম শত্রু প্রতিরোধ করার জন্য রাজ্যের পশ্চিম ভাগকেই সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত রাখা উচিত। যবন (গ্রিক) এবং শকেরা পশ্চিম থেকেই এসেছিল। প্রাথমিকভাবেই তাদের রোধ করার পক্ষে রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল অনেক দূর। কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থানের কারণে কান্যকুব্জ অতি সহজেই একটি স্কন্ধাবার (সেনাছাউনি) হওয়ার উপযুক্ত স্থান ছিল। যুগে যুগে কান্যকুব্জ সেই ভূমিকাই পালন করে এসেছে যা আজ এক বৃহৎ নগরীর রূপ ধারণ করেছে। আমি বললাম, বুদ্ধিল তোমার কথা সত্যি হলে পূর্বাঞ্চলের কোনো নগরীই আর কখনও সম্পূর্ণ মধ্যমণ্ডলের রাজধানী হবেনা। কান্যকুব্জই তার অবস্থানের কারণে সেই গৌরব ভোগ করবে।

বুদ্ধিল বলল, নিয়তি কাউকেই চিরন্তন করে কিছু দিয়ে দেয়নি। তবে সাধারণ দৃষ্টিতেই দেখা যাচ্ছে যে সৈন্য সমাবেশ এবং বাণিজ্য উভয় দিক থেকেই কান্যকুব্জের কিছু সুবিধা আছে। মৌখারিদের সামরিক শক্তির কথাও চারদিকে বিদিত আছে। যদি কোনো আক্রমণ হয়ও তাহলে কান্যকুব্জের অদূরে স্থানীশ্বরেই তাকে প্রতিহত করা হবে। আর যতদিন গঙ্গা উজান ও ভাটিতে নৌপরিবহনের উপযুক্ত থাকবে ততদিন কান্যকুব্জও হয়তো মধ্যমণ্ডলের রাজধানী হয়ে থাকবে।

গুপ্ত সম্রাটেরা যখন হরিবর্মাকে তাঁদের পশ্চিম স্কন্ধাবারের মুখ্য সেনাপতি করে পাঠায় তখন কে জানত একদিন এই স্কন্ধাবার রাজধানীর রূপ নেবে। মূল রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়লে শক্তিশালী সেনাপতি কিংবা সামন্ত রাজা তাঁদের স্থান দখল করে এটা নতুন কোনো তথ্য নয়। হরিবর্মার পুত্র আদিত্যবর্মার স্ত্রী গুপ্ত বংশের কন্যা ছিলেন। তাঁদের পুত্র ঈশ্বর-বর্মা (৫২৪-৫৫০ খ্রিঃ) সম্পর্কে গুপ্ত বংশের দৌহিত্র ছিলেন। মিহিরকুলকে পরাজিত করার পিছনে মালবের রাজা যশোবর্মার সঙ্গে ঈশ্বরের ভূমিকাও কিছু কম ছিলনা। হুণদের পরাজয়ের পর কান্যকুব্জের দ্রুত উত্থান শুরু হয়। মগধে অবস্থিত গুপ্ত সম্রাট তৃতীয় কুমারগুপ্তের দাবি যে ঈশ্বরবর্মা এখনো গুপ্তদের একজন সামন্ত মাত্র। তবে রাজা আর সামন্তের প্রভূত্বের দাবি মৌখিকভাবে মেটেনা, মেটে সামরিক শক্তিতে। যশোবর্মার মৃত্যুর পর ঈশ্বরবর্মার শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়। কান্যকুব্জের যা কিছু বৈভব তা সবই মৌখারি বংশীয় হরিবর্মার আমল থেকে।

কান্যকুব্জে দ্রুত নগরায়ণ হচ্ছে। গঙ্গার তীর ঘেঁসে বহুদূর পর্যন্ত লোকালয় বিস্তৃত হয়ে চলেছে। নগরী উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দেখলাম, প্রচুর অট্টালিকা যা সাম্প্রতিক কালে তৈরি হয়েছে। উপনগরীর প্রাচীন উদ্যানগুলি এখন শ্রেষ্ঠী ও সামন্তদের অধিকারে। অধিকাংশ উদ্যানের মধ্যেই ছোট অথচ সুন্দর গড়নের বাড়ি, স্বচ্ছ দীর্ঘিকা (সরোবর) এবং পুষ্প-বিতান আছে। আমরা পাহাড় অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রকৃতির নিজের খেয়ালে সৃষ্ট সৌন্দর্য দেখতে অভ্যস্ত। সমতলের অধিবাসীরাও যথেষ্ট সৌন্দর্যপ্রেমী, কিন্তু এ বিষয়ে তারা সর্বার্থে প্রকৃতির ওপরে নির্ভর করেনা, নিজেরা

পরিশ্রম করেও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে নেয়। দেবালয়, বিহার ইত্যাদি যে কোনো নগরীরই শোভা, অতএব কান্যকুব্জতে এসমস্ত যথেষ্টই আছে। এখানে হীনযান এবং মহাযান এই দুই বৌদ্ধপন্থ ছাড়া নির্গ্রন্থ (জৈন) এবং পাশুপত দেবালয়ও অনেক। এই নগরীর কান্যকুব্জ নাম হওয়ার ইতিহাস শোনালেন কয়েকজন ভিক্ষু। কোনো এককালে পাঞ্চালের রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্তের কয়েকটি সুন্দরী কন্যা ছিল। কোনো কারণে রাজা এক ঋষিকে কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। ঋষি সুদর্শন ছিলেন না, উপরন্তু কুব্জ ছিলেন। রাজকুমারীরা কুদর্শন ঋষিকে বিবাহে সম্মত হননি, কেবলমাত্র কনিষ্ঠা কন্যা ঋষির অভিশাপের ভয়ে বিবাহে সম্মত হয়। ঋষি অন্য রাজকুমারীদের অনীহার কথা জানতে পেরে এই অভিসম্পাত দেন যে অচিরেই তারাও কুব্জা হবে। ঋষির অভিশাপে রাজা ব্রহ্মদত্তের কনিষ্ঠা কন্যা ব্যতিরেকে আর সব কন্যারাই কুব্জা হয়ে যায়। 'কন্যাকুব্জা' এই কথাটাই লোকমুখে কান্যকুব্জে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধিল বিনয় পিটক থেকে উদাহরণ দিয়ে বলল, তথাগতর সময়েও এই নগরীর নাম কান্যকুব্জই ছিল।

নগরীর পশ্চিম দিকেই তথাগত তাঁর ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন। সেখানে অনেক স্তূপ আছে। একটি ছোট স্তূপে তথাগতর নখ ও কেশ ধাতু রক্ষিত আছে। ছোট একটি নগরী থেকে কান্যকুব্জের এই মহান রাজধানী নগরে উন্নীত হওয়া কিন্তু বেশি দিনের ঘটনা নয়, মাত্র একশো বছরের। এর আগেও আমি বেশ কয়েকটি বর্ধিষ্ণু নগরী দেখেছি, কিন্তু কান্যকুব্জের বৈভবের কাছে সে সব নিতান্তই সাধারণ মানের। এখানকার রাজপথ, অট্টালিকা, উদ্যান-বাটি স্বর্গের অংশ বলে ভ্রম হয়। এই নগরীর নাগরিকদের উচ্চ শ্রেণীর শালীনতা, পরিচ্ছন্নতা বোধ, সাহিত্য, কলার প্রতি প্রেম এবং ধর্মের প্রতি অনুরাগ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বাইরের চাকচিক্য আমাকে এত বেশি মুগ্ধ করেছিল যে প্রদীপের নিচের অন্ধকারের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বুদ্ধিলের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। সে হৃদয়াবেগের চেয়ে বুদ্ধিকেই বেশি প্রাধান্য দিত। সে বলত, পৃথিবীতে অপার দুঃখ আছে একথা সত্য এবং স্বয়ং বুদ্ধ নিজেও তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই দুঃখ কোনো কারণের জন্যই অস্তিত্ব লাভ করে। তথাগতর এই বাণী অভ্রান্ত এবং মানুষের মনে আশার সঞ্চার করে। দুঃখ যদি কোনো কারণ ছাড়াই আসত তাহলে তাকে দূর করার চেষ্টাও বৃথা হতো। কিন্তু দুঃখের কোনো কারণ অবশ্যই আছে এবং পৃথিবীর সবকিছুই যখন অনিত্য তখন দুঃখও অনিত্য। অনিত্যতার কারণেই দুঃখের নাশ (নিরোধ) সম্ভব, এই সত্যটিও যথার্থ। দুঃখনাশের উপায় আছে। তথাগত তাঁর ধর্মকে বলেছিলেন, 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।' কিন্তু পৃথিবীতে আমরা কি দেখতে পাই। শতকরা সত্তরভাগ মানুষ দুঃখে নিমগ্ন। মুষ্টিমেয় কিছুলোক অতুল বৈভবের মধ্যে কাল কাটাচ্ছে, বলা হয় পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে তাঁদের এই সুখভোগ। অথচ তাঁদের সুখভোগে রাখার জন্য বিশাল সংখ্যক জনসমূহ ভারবাহী পশুর মতো উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে বাধ্য হয়, পশুর মতোই ক্রীত এবং বিক্রীত হয় এবং কর্মফলের কারণে এই বৈষম্য, তাহলে তথাগতর কথিত দুঃখ বিনাশের বাণী ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে। তথাগত শুধু মানুষকে নয়, সর্ব জীবকেই সেবা করার কথা বলেছেন, জাতকের কাহিনিতে আমরা সেই উদাহরণই পাই।

বুদ্ধিলকেই এজন্য ধন্যবাদ দিই যে এখন আমার চোখ শুধুমাত্র সুরম্য অট্টলিকার দিকে ধাবিত না হয়ে পর্ণকুটিরের দিকেও যায়। এই মহানগরীর অতুল বৈভবের পিছনে যাদের অক্লান্ত শ্রমের ভূমিকা আছে, তারাও আমাকে এখন আকৃষ্ট করে।

মগধের দিকে (৫৪৪-৫৪৫ খ্রিঃ)

কান্যকুব্জ থেকে যাবার পথে নামার পালা। গ্রীষ্মের দিন ছিল। আমরা পড়ন্ত বেলায় পথ চলতাম এবং অন্ধকার হওয়ার আগেই কোনো বিহারে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে বিভিন্ন ভিক্ষু ও পরিব্রাজকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের কাছ থেকেই আমাদের যাত্রাপথের খানিকটা পরিচয় আগাম পেয়েছিলাম। কান্যকুব্জের পর আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল কৌশাম্বী। কান্যকুব্জ, কাম্পিল্য, সংকাস্য, আলবিকা (আলংভিকা) প্রভৃতি জায়গাগুলো পাঞ্চালের অন্তর্গত। কৌশাম্বীর পথে আমাদের প্রথমে পড়বে আলবিকা। বুদ্ধিল বলল, এখানকার যক্ষ (দেবতা) আলবক পাঞ্চালচণ্ড নামে খ্যাত ছিল কারণ সে ছিল ভীষণ ক্রোধী। সে একবার তার ক্রোধকে বুদ্ধের ওপরে প্রয়োগের চেষ্টা করে কিন্তু হার মানতে বাধ্য হয়।

এতদিন আমরা শুধু স্থলপথেই যাত্রা করেছি। কিন্তু কৌশাম্বীর পথে আমরা ঠিক করলাম যে যমুনার তীরে পৌঁছে জলপথে যাত্রা করব। সেজন্যই আমরা আলবিকার পর থেকে যমুনা অভিমুখী পথ ধরলাম। গঙ্গার পথ ধরলে প্রয়াগে পৌঁছে আবার উজানে যমুনার পথ ধরতে হতো। মধ্যমণ্ডলের লোক সাধারণভাবে ভিক্ষুদের বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করে। বাণিজ্য সার্থ (ক্যারাভান) স্থলপথ হোক বা জলপথ, সর্বত্রই প্রবজ্যিদের (সাধু) তারা যথাসাধ্য সহায়তা করত। আলবিকা থেকে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে চলছিলাম। গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্তী অংশ অত্যন্ত সম্পদশালী, একথা আগেই বলেছি। এজন্য এই অঞ্চলের লোকের মধ্যে সামান্য অহমিকা বোধও আছে। এই পথে হাঁটতে আমার বারবার উদ্যানের কথা মনে হচ্ছিল। সেই সরল, সোজা মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো চিরহরিৎ দেবদারু গাছ, কলকল শব্দে প্রবাহিতা খরস্রোতা নদী। এখানকার গরম আমার কাছে অসহনীয় বলে মনে হলেও স্থানীয় লোকজনের কাছে তা সহনীয়ই ছিল। গরম বাতাসে শুধু অসুস্থ হওয়াই নয় মৃত্যুও ঘটতে পারত। এক সপ্তাহ ধরে অল্প অল্প করে পথ চলে, অবশেষে আমরা যমুনা তীরে এসে পৌঁছালাম। স্থলপথে যাত্রাকালে আমরা ভিক্ষুরা কোনো ঘোড়া, শকট কিংবা পালকি ব্যবহার করতে পারিনা। ব্যবহার করার বিধি থাকলেও হয়তো আমি করতাম না, কারণ আমার পায়ে হেঁটে ভ্রমণেই আনন্দ লাগে। পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করলে সারা পৃথিবীকে নিজের পায়ের মাপে মাপা যায়। নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের রস একান্তে গ্রহণ করা যায়। ভ্রমণ সম্বন্ধে বুদ্ধিল ও আমার রুচিবোধ ছিল একই ধরনের। যমুনার তীরে যে জায়গাটিতে গিয়ে আমরা পৌঁছেছিলাম, যতদূর মনে হয় জায়গাটার নাম ছিল চন্দ্রপুর। যমুনা এখানে গঙ্গার মতোই বিশাল এবং তটভূমি বেশ উঁচু। চন্দ্রপুর একটা বড়ো ধরনের গঞ্জ, ছোট বড়ো বাণিজ্যের নৌযানের অক্লান্ত যাতায়াত চলে এখানে। আমরা নিশ্চিন্তে ছিলাম যে এখান থেকে ভাঁটির দিকে কৌশাম্বীমুখি কোনো নৌকা অবশ্যই পেয়ে যাব। এখানে আসার

পথে দেখেছি যে গো শকট বোঝাই করে পণ্য দ্রব্য আসছে, লক্ষ্য চন্দ্রপুরের ঘাট। যেখানে সামন্ত কিংবা শ্রেষ্ঠীরা বাস করে তার কাছাকাছি সংঘারাম বা বিহার একটি দুটি অবশ্যই থাকে, চন্দ্রপুরেও ছিল। বিহারের ভিক্ষুরা কিছু স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়ে আমাদের বললেন, এখানে শুধু শাক্যমুনিই নয় ভদ্রকল্প ইত্যাদি আরও কয়েকজন বুদ্ধ এসেছিলেন। সর্বত্রই প্রায় এ সমস্ত কথা শুনেছি। ইদানীং বুদ্ধিলের সৎসঙ্গের ফলে এ সমস্ত কথায় ততটা বিশ্বাস নেই। বুদ্ধিল যুক্তিবাদী হলেও অপরের মনে আঘাত দিয়ে কখনও কথা বলতনা। সে কথা বলত কম, শুনত বেশি, যার ফলে তার সঙ্গে আমি কারও বিরোধ হতে দেখিনি। আমরা যে সমস্ত বিহারে আশ্রয় নিতাম, সেখানকার ভিক্ষুরা বুদ্ধিলের মধুর ব্যবহারে সহজেই আমাদের আপন হয়ে যেতেন। একজন প্রকৃত পর্যটকের যে ধরনের স্বভাব হওয়া উচিত, বুদ্ধিল ছিল সেই স্বভাবের মানুষ। বুদ্ধিলের সঙ্গে থাকার ফলে আমিও তার মতো হওয়ার চেষ্টা করতাম।

চন্দ্রপুরের আবাসিক ভিক্ষুরা চেষ্টা করছিলেন যে আমরা যেন এমন এক সার্থবাহর নৌযান পেয়ে যাই যাতে আমরা স্বল্পায়াসেই কৌশাম্বী যেতে পারি। কৌশাম্বীর নাম করা শ্রেষ্ঠীদের অন্যতম ছিলেন সুফল শ্রেষ্ঠী। তাঁর পণ্যদ্রব্য বোঝাই নৌযান পূর্বসমুদ্র (বঙ্গোপসাগর) থেকে আরম্ভ করে গঙ্গা, যমুনা, সরযু, অচিরবতী (রাপ্তী) মহী (গণ্ডক) নদীতে চলাচল করত। সমগ্র বড়ো বড়ো নগরেই তাঁর ব্যবসায়ের কর্মচারী ছিল। চন্দ্রপুর বিহারের স্থবির আমাদের জানালেন যে সুফল শ্রেষ্ঠী মথুরা থেকে ফিরে তখন চন্দ্রপুরেই বাস করছেন। স্থবির আমাদের দুজনের সম্বন্ধে অনেকটা অতিরঞ্জিত করেই শ্রেষ্ঠীর কাছে বলেছিলেন, শ্রেষ্ঠী নিজেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভক্ত ছিলেন। সুফল শ্রেষ্ঠীর মনে মনে একটা গর্ব ছিল যে তিনি ঘোষিত শ্রেষ্ঠীদের বংশধর যিনি তথাগতকে বহুবার আপ্যায়ন করেছেন, এবং ঘোষিতারাম (সংঘারাম) নির্মাণ করে ভিক্ষু সংঘকে দান করেছেন। সুফল শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে আমাদের দুজনের জন্য পরদিন দ্বিপ্রাহরিক আহারের নিমন্ত্রণ এল। সেই আমন্ত্রণের সঙ্গে তিনি আরও অনুরোধ করলেন যে আমরা যেন কৌশাম্বী যাত্রায় তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করি। শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে এক সপ্তাহের নৌযাত্রা যে যথেষ্ট আরামপ্রদ হয়েছিল সে কথা বলার আবশ্যকতা রাখেনা, তবে এই যাত্রা আমার পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান বর্ধকও হয়েছিল।

সূর্যোদয়ের পূর্বে আমাদের নৌকা যমুনা স্রোতে যাত্রা শুরু করল। নদীতে স্রোত এবং বাতাসের আনুকূল্য থাকায় দাঁড় টানার আবশ্যকতা ছিল না। নৌকার পাল খাটানো ছিল। গ্রীষ্মকালে জলযাত্রাও বিশেষ সুখকর হয় না, তবে শ্রেষ্ঠীর নৌকাটি ছিল ছোটখাটো প্রাসাদ বিশেষ। সেখানে সমস্ত ধরনের আরামের ব্যবস্থা ছিল। রোদের তাপ বাড়লে নৌকার ছাউনির ওপরে খস্‌খস্ বিছিয়ে তাতে জল ছেটানো হতো। দরজা, গবাক্ষ ইত্যাদিতেও খসখস লাগানো ছিল। সুফল শ্রেষ্ঠীর বয়স প্রায় পঞ্চাশ, তাঁর পত্নী তাঁর চেয়ে পাঁচ সাত বছরের ছোট ছিলেন। ঘরের দায়িত্ব শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে ন্যস্ত থাকায় শ্রেষ্ঠী নিশ্চিন্তে তাঁর সার্থের সঙ্গে ঘুরতে পারতেন। শ্রেষ্ঠী-পত্নী একজন তথাগতের ধর্মের অনুরাগিণী ছিলেন এবং ভিক্ষুদের সাধ্যমতো সাহায্য করতেন। শ্রেষ্ঠীর নৌকার অনুগামী হয়ে অনেকগুলি নৌকা চলছিল যার মধ্যে কয়েকটিতে রক্ষী

বাহিনীর লোকজনও ছিল। যদিও মৌখারি শাসনের প্রতাপে দেশে দস্যু তস্করের উপদ্রব কম, কিন্তু যতদিন সুখসম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে জমা থাকবে ততদিন দস্যু তস্করের উপদ্রব একেবারে নির্মূল হতে পারে না। তাছাড়া বাণিজ্য সার্থের একটা নিজস্ব গতি প্রকৃতি আছে। অনুকূল এবং প্রতিকূল, উভয় অবস্থাতেই তাকে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়।

শ্রেষ্ঠীর কাছে শুনছিলাম– শীত গ্রীষ্মের তুলনায় বর্ষায় নৌযাত্রা অনেক বেশি বিপদ সঙ্কুল। তখন নদীর স্রোতের তীব্রতা অনেক বেশি থাকে। তাছাড়া বন্যায় অরণ্য ধ্বংস হয়ে বড়ো বড়ো গাছ নদীতে ভেসে আসে যা নৌকার পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তবে বর্ষার কিছু সুবিধাও আছে। তখন ছোট বড়ো সব নদীই ভরা থাকে। প্রয়োজনে ছোট নদীগুলিকে ব্যবহার করে যাত্রা সংক্ষেপ করা যায়। আর পণ্য পরিবহনে সময় সংক্ষেপ করার অর্থই হলো লাভ।

শ্রেষ্ঠীর নৌকা কোথাও বিনা প্রয়োজনে থামত না। চন্দ্রপুর থেকে কৌশাম্বী পর্যন্ত পথে থামার জায়গাও কম। তবে নিয়ম করে সকাল সন্ধ্যায় কিছুক্ষণের জন্য নৌকাকে তীরে ভেড়ানো হতো। গ্রীষ্মের খরতাপে নৌকার মধ্যে কোনো বটবৃক্ষের শীতল ছায়ার আশা করা বৃথা অতএব আমরা আমাদের কুঠুরির মধ্যে কৃত্রিমভাবে ঠাণ্ডা করা পরিবেশের মধ্যেই বেশিরভাগ সময় কাটাতাম। শ্রেষ্ঠী তাঁর নৌকার একটি কুঠুরি আমাদের দুজনের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। সন্ধ্যায় শ্রেষ্ঠী কিংবা তাঁর পত্নী আমার অথবা বুদ্ধিলের কাছ থেকে কথকতা শুনতেন। শ্রেষ্ঠী-পত্নীর বিশেষ আগ্রহ ছিল তথাগতর জীবন কাহিনির প্রতি। বুদ্ধিলের কণ্ঠে মহাকবি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত্রের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনে তিনি এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে প্রতিদিনই তাঁকে বুদ্ধচরিত শোনাতে হতো। শ্রেষ্ঠী নিজেও তাঁর শিক্ষা দীক্ষা মতো জাতক অবদান, সূত্র ইত্যাদির পারায়ণ (পাঠ) করতেন।

ঘটনা এই যে আমাদের সমস্ত ঐতিহ্য পরম্পরার সঙ্গে বুদ্ধিলের সব কথাকে সবসময় মেলাতে পারতাম না। আমার প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধিল বলেছিল– এই যমুনা নদী উত্তরের প্রাচীন হিমবাহ থেকে উৎপন্ন পার্বত্য পথে অট্টহাসি হাসতে হাসতে প্রবাহিত হয়েছে। যমুনার সেই রূপের সঙ্গে তুমি তোমাদের সুবাস্তুর অনেক মিল হয়তো খুঁজে পাবে। কিন্তু সমতলে নেমে যমুনার রূপ ভিন্ন, তার সঙ্গে অন্য কত নদী এসে মিলিত হয়েছে, সেও মিলিত হয়েছে গঙ্গায়। পরম্পরা বিষয়টিও অনেকটা সেই ধরনের। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন পরম্পরা ঐতিহ্য পরম্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে, সম্পর্কে নতুন করে সৃষ্ট হয়। সিংহল মহাবিহারের লিখিত পরম্পরার কথাই ধরা যাক। তারা কাশ্মীর গান্ধারের সর্বাস্তিবাদী ঐতিহ্যের সঙ্গে সহমত নয়। আবার এই দুটি পরম্পরাকে মহাযান পরম্পরার সঙ্গে তুলনা করলে পরিবর্তন আরও স্পষ্ট হবে। অথচ সবকটির মধ্যেই কিছু না কিছু সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যটুকুই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ঐতিহ্য বা পরম্পরা। বুদ্ধিল স্থবিরবাদ (মহাবিহার) এবং সর্বাস্তিবাদের পিটক আর অর্থকথার বিভাষার যথেষ্ট পারায়ণ (পাঠ) করেছিল তদুপরি সে সম্মিতিয় মহাসাংঘিক প্রভৃতি নিকায়ের সম্বন্ধেও যথেষ্ট পড়াশোনা করেছিল। মহাযান বিষয়ে তো তাকে পণ্ডিত বলা

চলে। আচার্য দিঙনাগ ছিলেন তার আদর্শ। তাঁর ভাষাতেই সেও বলত–পুঁথি ও পরম্পরার অন্ধ অনুকরণ না করে আমাদের উচিত বিবেক বুদ্ধির পথ অনুসরণ করা। বুদ্ধচরিত ব্যাখ্যাকালে তাকে কখনও অলৌকিক কোনো উপমার আশ্রয় নিতে দেখিনি। তার ফলে তথাগত মুখ মণ্ডলের চারপাশে ছড়ানো দিব্যপ্রভা খানিকটা হয়তো হ্রাস পেত, কিন্তু তাতে তথাগত কোনোভাবেই খর্ব হতেন না বরং তাঁর পুরুষোত্তম রূপ আরও স্বাভাবিক হয়ে উঠত। বুদ্ধিল তার কথকতার মধ্যে কপিলাবস্তু ও বৈশালীর বর্ণনা করতে গিয়ে সেখানকার রাজাহীন গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার উল্লেখ করত। শ্রেষ্ঠী এবং শ্রেষ্ঠী-পত্নী তো বিশেষ আশ্চর্য হলেন যখন শুনলেন যে বুদ্ধের সময়কার বেশভূষা, আচার ব্যবহার, ভাষা ইত্যাদির সঙ্গে বর্তমানের বেশভূষা, ভাষা ইত্যাদির প্রচুর পার্থক্য বর্তমান। বুদ্ধিলের ভাস্কর্য শিল্পে ভালোমতো জ্ঞান ছিল। সে কাদা মাটি দিয়ে যুদ্ধযুগের প্রতিমূর্তি, সাঁচীর (বিদিশা) স্তূপ ইত্যাদি তৈরি করে শ্রেষ্ঠী দম্পতিকে দেখানোর পর তাঁদের প্রতীতি হলো যে এই তরুণ ভিক্ষুর বক্তব্য সঠিক।

সাতদিনের নৌকা যাত্রা আমাকে এবং বুদ্ধিলকে বাদ দিলে আর সকলের কাছেই অপ্রিয় লেগেছিল। কৌশাম্বীতে পৌছাবার পর শ্রেষ্ঠী এবং শ্রেষ্ঠী-পত্নীর আগ্রহে সেখানকার ঘোষিতারামে (সংঘারাম) এক সপ্তাহের বদলে এক পক্ষকাল কাটাতে হলো। কৌশাম্বী এক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। অনেক কাহিনির নায়ক বৎসরাজ উদয়ন এই কৌশাম্বীতেই বাস করতেন। কান্যকুব্জ আর প্রয়াগের উত্থানের ফলে কৌশাম্বী এখন পূর্বের অবস্থাতে নেই। তবু যেহেতু এই নগরীর অবস্থান একটি বাণিজ্যিক জলপথের তীরে, তাই কোনোক্রমে টিকে আছে নাহলে হয়তো কবেই ইতিহাসের গর্ভে বিলীন হয়ে যেত। একদা উদয়নের অন্তপুর এখন ধ্বংসস্তূপ। চল্লিশ হাত উঁচু একটি বুদ্ধ মন্দির এখনো টিকে আছে। তার ভিতরের চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে রাজা উদয়ন বুদ্ধের জীবদ্দশায় তাঁকে দেখে শিল্পীদের দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন। বুদ্ধিলের অবশ্য ভিন্ন মত। সে বলে প্রাচীন বৈদিশগিরি এবং অন্যান্য চৈত্যে বুদ্ধমূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না, সেখানে পীঠাসন কিংবা চরণচিহ্ন ধরে বুদ্ধের কল্পনা করা হয়েছে। অতএব উদয়নের কালে অর্থাৎ তথাগতর জীবদ্দশায় এরকম মূর্তি নির্মাণ অসম্ভব। নগরীর দক্ষিণ পূর্ব কোণে শ্রেষ্ঠী ঘোষিতের আবাস। শ্রেষ্ঠী ঘোষিতের তৈরি ঘোষিতারামটি নগরীর বাইরে অবস্থিত। তথাগত বহুবার এই আরামে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন এটা সত্য। এখানে একটি কুঠুরিতে বসে আচার্য বসুবন্ধু তাঁর 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধি' (বিংশিকা-ত্রিংশিকা) রচনা করেছিলেন। ঘোষিতারামের কাছেই একটি আমবাগান আছে। এখানেই একটি কুটিরে বসে আচার্য অসঙ্গ তাঁর মহান গ্রন্থ 'যোগাচার ভূমি' রচনা করেছিলেন। আমাদের শ্রেষ্ঠী যথেষ্ট উদারতার সঙ্গে সংঘারামগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকেন, কিন্তু একা একজন শ্রেষ্ঠী কতদিন কৌশাম্বীর অতীত গৌরব ধরে রাখবেন, বিশেষত তাঁরও এক পা যখন কান্যকুব্জের দিকে প্রসারিত।

কৌশাম্বী থেকে প্রয়াগের দূরত্ব সাত যোজন। এই দূরত্ব আমরা জলপথেই যেতে পারতাম কিন্তু আমরা স্থলপথই নির্বাচন করলাম, পথ গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে গেছে

যেখানে প্রচুর বাঘ, সিংহ এবং হাতি আছে। কখনো হয়তো এই পথে পরিব্রাজকদের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, এখন সে সবই ইতিহাস। অতীতে প্রয়াগ অরণ্য বেষ্টিত ছোট একটি গ্রাম ছিল, বাল্মিকী রামায়ণ থেকে আমরা এই তথ্য জানতে পারি। তবে বর্তমানে প্রয়াগের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কারণ এর অবস্থান গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে। স্নান ধর্মপালনে বিশ্বাসীরা লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় প্রতিবছর বিভিন্ন তিথিতে এখানে স্নান করে। এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দাপট অন্যান্য ধর্মের তুলনায় বেশি। সঙ্গমের কাছে একটি বটবৃক্ষ আছে যার উচ্চতম ডালে উঠে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটি স্বীকৃত প্রথা। বিশ্বাসীরা মনে করে এভাবে মৃত্যু বরণ করলে পাপমোচন হবে এবং স্বর্গীয় বিমান এসে তাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। বুদ্ধিল বিরক্ত হয়ে বলে–এ কেমন ধর্ম যা মানুষের আত্মহননকে পুণ্য কাজ মনে করে এবং মানুষকে অজ্ঞ তৈরি করে।

আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য বারাণসী। তথাগতর জীবনের সঙ্গে যে চারটি জায়গার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, বারাণসী তাদের অন্যতম। এবার আমাদের পথ পূর্বমুখী। যেহেতু এটি রাজপথ, সেজন্য এর দুপাশে আমগাছের সারি। গাছের ফলের আকারও বেশ বড়ো হয়েছে। যা দেখে বোঝা যাচ্ছিল বর্ষা আগত প্রায়। বর্ষাবাসের জন্য আমাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হবে। বর্ষার তিনমাস আমরা শ্রাবস্তীর জেত বনে কাটাব মনস্থ করে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিন যোজন পথ অতিক্রম করতাম। বারাণসী কোনো রাজধানী নগর না হওয়া সত্ত্বেও বিশাল এক নগরী। সুপ্রাচীন বারাণসী একটি বাণিজ্য কেন্দ্রই শুধু নয়, বৌদ্ধ, জৈন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশিষ্ট তীর্থস্থানও বটে। নগরীতে একটি বিশিষ্ট পশুপতির মন্দির আছে, যেটি সর্বদা ভক্ত সমাগমে পূর্ণ থাকে। বারাণসীর শিল্পীরা সুন্দর বস্ত্রবয়ন এবং অন্যান্য কারুশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কান্যকুব্জ, পাটলিপুত্র তথা অন্যান্য কোনো নগরীই বারাণসীর মতো দীর্ঘকাল বৈভবের মধ্যে অবস্থান করতে পারেনি। আমরা বারাণসীর ধর্মচক্রপ্রবর্তন (সারনাথ) বিহারে আশ্রয় নিয়েছিলাম। এই স্থানটিই প্রাচীন ঋষিপত্তন মৃগদাব। এখানেই তথাগত তাঁর আদি, মধ্য ও পর্যাবসান কল্যাণ ধর্মের প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন। সুদূর মহাচীন থেকে আরম্ভ করে আরও কত দ্বীপদ্বীপান্তর নিবাসী ভক্তরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে এই আশায় যে কবে তারা এই পুণ্যস্থান দর্শনের সুযোগ পাবে। তথাগত বুদ্ধত্ব লাভের পর প্রথম বর্ষাঋতুটি এখানেই অতিবাহিত করেন। এখানেই তিনি পাঁচজন শিষ্যকে তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করে ভিক্ষু সংঘের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। তিনি যেখানে সর্বপ্রথম উপদেশ দান করেছিলেন, সম্রাট অশোক সেখানে বিশাল এক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। তার কাছেই গন্ধকুটি, তথাগতর নিবাসস্থান। সেখানেও অশোকের স্থাপিত শিলাস্তম্ভ আছে। অশোকের কাল গত হয়ে সহস্রবর্ষও হয়নি, কিন্তু শিলাস্তম্ভের উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার এখন আর কেউ করতে পারে না। ঋষিপত্তনে প্রচুর সংঘারাম আছে। বস্তুত একে সংঘারাম নগরীও বলা চলে।

বারাণসীর পর আমাদের লক্ষ্য সাকেত (অযোধ্যা)। সাত আট দিন সময় লেগেছিল সেখানে পৌঁছাতে। পথ ঘন অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল। বেশ কয়েকটি নদী

অতিক্রম করে আমরা সাকেত পৌছাই। এই জায়গাকেই বাল্মিকী তাঁর রামায়ণে অযোধ্যা বলে উল্লেখ করেছেন। সাকেত মহাকবি অশ্বঘোষের জন্মস্থান। নিজের জন্মস্থানের প্রসিদ্ধির জন্য মহাকবি তাঁর নামের আগে লিখতেন, 'সাকেতক সুবর্ণাক্ষী পুত্র।' তথাগতর সময়ে সাকেত ছিল এক প্রসিদ্ধ নগরী। বিশাখার পিতা শ্রেষ্ঠী অর্জুন এখানেই থাকতেন যদিও তখন কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী, সাকেত নয়। শ্রাবস্তী এখান থেকে সাত যোজন দূরে। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম যে বর্ষোপনায়িকার (আষাঢ় পূর্ণিমা) মধ্যে আমরা অবশ্যই শ্রাবস্তী পৌছে যাব।

সরযু পার হয়ে উত্তর দিশাতে শ্রাবস্তীর পথ। এই পথে গ্রামের সংখ্যা বেশি, অরণ্য কম। গাছে পাকা আমের মেলা। বুদ্ধিল ততটা পছন্দ না করলেও আমি আম খুবই পছন্দ করি। সাকেত থেকে শ্রাবস্তী এই সাত যোজন পথ সর্বদাই জমজমাট। শকট অথবা ভারবাহী পশুর সাহায্যে পণ্যদ্রব্য চলাচল করছে। আমাদের মতো পদাতিকের সংখ্যাও প্রচুর। কৌশাম্বীর মতো শ্রাবস্তীরও এখন ভগ্নদশা। পূর্বারাম এবং জেতবনও ধ্বংসের মুখে। নগর প্রাকারও জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে পুনর্নির্মাণ হয়নি। নগরীর অভ্যন্তরের রাজাকারাম, রাজপ্রাসাদ অনাথপিণ্ডক ও বিশাখার বাসস্থান খুঁজতে হলে সংকেত চিহ্নই দেখতে হয়। আমরা জেতবনের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলাম। তথাগতর কালে এই স্থান অতিশয় রম্য ছিল। আমাদের চিন্তায় অবশ্য জেতবন এখনো রম্য। বুদ্ধত্ব লাভের পর তথাগত তাঁর জীবনের ছেচল্লিশটি বর্ষাবাসের মধ্যে ছাব্বিশটি কাটিয়েছেন এখানে, এই জেতবনে। তথাগতর মুখ থেকে উপদেশ শোনার জন্য ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা এখানে সন্ধ্যার পর সমবেত হতো। এখানেই তথাগত পরিত্যক্ত, পীড়িত ভিক্ষু তিষ্যকে স্বহস্তে স্নান করিয়েছিলেন। নিজের জীবনে প্রয়োগ করে তিনি শিষ্যদের শিখিয়েছেন কিভাবে অন্যের সাহায্যে নিজেকে লাগানো যায়। জেতবনে এখন সম্মিতির ভিক্ষুদের আধিক্য তথাগত এটিকে আগত অনাগত চাতুর্দিশা ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে নিয়েছিলেন। অনাথপিণ্ডক সুদত্ত শ্রেষ্ঠীর ধনলক্ষ্মী বেশিদিন স্থায়ী হয়নি কিন্তু তাঁর কার্ষাপণ (সেকালের এক মুদ্রা) বিছিয়ে কেনা এই জেতবন চিরস্থায়ী। হতে পারে একদিন অরণ্য এসে এসব কিছু গ্রাস করবে কিন্তু তথাগতর বাণীর সঙ্গে জেতবনও মানুষের ভাবনায় চিরকাল থাকবে।

বর্ষাবাসের জন্য জেতবনে দুশোর মতো ভিক্ষু একত্রিত হয়েছিলেন। পূর্বারামে ছিলেন জনা পঞ্চাশেক। অথচ একসময় এই সব বিহারে সহস্রাধিক ভিক্ষু থাকতেন। তখন এই নগরী আরও কত জমজমাট প্রাণবন্ত ছিল। তখন হয়তো ভিক্ষুরা বুদ্ধের সেই অমোঘ 'সবই অনিত্য' বাণীকে যথাযথভাবে বুঝতে পারেননি। জেতবনে বসে বুদ্ধের বলা সুক্তগুলিকে যখন পাঠ করছিলাম, তখন আমার চোখের জল বাধা মানেনি। জেতবনের আশপাশের লোকজনেরা কিন্তু এখনো বিহার এবং সেখানকার ভিক্ষুদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। সম্পূর্ণ শ্রাবণ এবং ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঝুড়ি-ভরা আম তারা বিহারে পাঠাত। আকাশ পরিষ্কার থাকলে শ্রাবস্তী থেকে হিমালয় চোখে পড়ে। হিমালয় দেখলেই আমার জন্মভূমির কথা মনে পড়ত।

বর্ষার অন্ত হলো। মহাপ্রবারণার (আশ্বিন পূর্ণিমা) দিন শ্রাবস্তী আর তার শ্রীহীন জেতবনে আবার উৎসবের পরিবেশ তৈরি হলো। সেদিন প্রতিটি গৃহস্থ ভিক্ষুদের জন্য খাদ্যবস্তু নয় তো অন্য কিছু উপহার দ্রব্য নিয়ে আসে। এখান থেকে লুম্বিনী এবং কপিলাবস্তু যাবার অনেক সঙ্গী পেয়ে গেলাম। জেতবনের অদূরে অচিরবতী (রাপ্তী) নদী। নদী পার হয়ে আবার পথ চলা। কার্তিক মাস, পথের ধারে পাকা ধানের ক্ষেত। সদ্য বর্ষা শেষ হওয়ায় ধানের ক্ষেতে কিছুটা জল রয়েছে। ছোট বড়ো জলাশয়গুলি পরিপূর্ণ। কৌশাম্বী এবং শ্রাবস্তীর জীর্ণাবস্থা আমরা দেখেছি, বারাণসী সাকেতের পথে উজার হওয়া বহু গ্রামের ভগ্নস্তূপ আমাদের চোখে পড়েছে। তার প্রধান কারণ মানুষের অবহেলা নয়, যুদ্ধ। বিদেশী সৈনিকরা এপথে বারবার আক্রমণ করেছে এবং স্থানীয় নগর ও নাগরিকদের প্রতি বিন্দু মাত্র সহানুভূতি না থাকার ফলে সেগুলিকে নির্মমভাবে তারা ধ্বংস করেছে। শ্বেত হুণদের সম্রাট তোরমান এবং তাঁর পুত্র মিহিরকুল শ্রাবস্তী পর্যন্ত এসেছিল। কিন্তু শ্রাবস্তীর তখনও অত্যন্ত ভগ্নদশা, আর সেই কারণেই সে রক্ষা পেয়ে যায়। যুদ্ধ এক মহামারী যা নির্মমভাবে মানুষের বসতিকে ধ্বস করে দেয়। ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগরে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হতে অনেক সময় লাগে। এখানকার বেশ কয়েকটি গ্রাম গড়ে উঠেছে যুদ্ধে উৎখাত হয়ে আসা লোকজনদের নিয়ে। এই পথে আহার্যের অভাব ছিলনা। শস্য, ফল, জলাশয়ের ছোট মাছ প্রচুর মিলত। আমি এখনো মাছ মাংস আহার ত্যাগ করিনি। গৃহস্থের নিমন্ত্রণে ওই বস্তুটি প্রায়শই পেতাম। তবে শয়নের কষ্ট ছিল। মশার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আমাদের কোনো আচ্ছাদন ছিলনা, ওই বস্তুটি এখানে ধনীরাই ভোগ করে। অতএব সারারাত মশার দংশনে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত। যত পূর্বদিকে অগ্রসর হচ্ছি তত বনভূমি বাড়ছে। আমরা ছাড়া আরও তিনজন ভিক্ষু আমাদের সঙ্গী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে একজনের নাম সুরত, মগধের অধিবাসী, অন্য দুজন সিংহলী। সিংহলের স্থবির সুনন্দ বয়স এবং জ্ঞান, উভয় দিকেই প্রবীণ। আমরা এই প্রবীণ ভিক্ষুর সুখ সুবিধার দিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখতাম। বিনিময়ে স্থবির সুনন্দও আমাদের নানা প্রাচীন আখ্যান শোনাতেন। দ্বিতীয় দিন আমরা প্রসেনজিতের কোশল রাজ্য ও শাক্যদের রাজ্যের সীমানা নির্ধারক নদীটির কাছে গিয়ে পৌছালাম। বর্ষা পরবর্তী নদী, জল ভালো ছিল তবে দুরতিক্রম্যও ছিলনা। নদীর মধ্যে কোথাও বাঁধ বাঁধা হয়েছে কোথাও বাঁশ কাঠ দিয়ে নির্মিত হয়েছে অস্থায়ী সেতু। নদী পার হয়ে শাক্যদের ভূমিতে আমরা পা রাখলাম। এই সেই বটবৃক্ষ যার নিচে একদিন দেবমনুষ্যের শাস্তা বসেছিলেন। পাতার ফাঁক গলে হয়তো তাঁর দেহে রোদ্দুর এসে পড়েছিল। শাক্যদের দৌহিত্র কোশলরাজ বিরূঢ়ক তাঁকে দাসীপুত্র বলে অপমান করার প্রতিশোধ নিতে সেদিন এখানে এসেছিলেন। তথাগতকে এখানে দেখে বলেছিলেন,– ভন্তে, এই রোদে ছিদ্রিত গাছের ছায়ায় না বসে ঘন পত্রপল্লবের বটবৃক্ষের ছায়ায় বসুন।

উত্তরে তথাগত বলেছিলেন– তা হয়তো ঠিক মহারাজ, কিন্তু জ্ঞাতিদের ছায়া বেশি শীতল মনে হয়।

বিরূঢ়ক সেদিন ফিরে গিয়েছিলেন, কিন্তু আবার এসেছিলেন, তখন বুদ্ধ জ্ঞাতিদের সহায় হয়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। বিরূঢ়ক শাক্যবংশ ধ্বংস করে তাঁকে দাসী পুত্র বলার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

স্থবিরের বিশ্বাস নদীতীরের এই বটবৃক্ষটি সেই বটবৃক্ষ যার তলায় বুদ্ধ বসেছিলেন। কিন্তু আমার আর বুদ্ধিলের বটবৃক্ষটিকে দেখে একশো বছরের বেশি প্রাচীন মনে হলো না। কিন্তু স্থবিরের সম্মান রক্ষার জন্য আমাদের মনোভাব তাঁকে জানালাম না। আমার এই যাত্রাপথে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারলাম। যেমন শাক্যদের মধ্যে রাজশাসন ছিলনা। ছিল গণশাসন। তাদের একটি সংস্থা (গণপঞ্চায়েত) ছিল যেখানে বসে সমস্ত কিছু নির্ণীত হতো। সংস্থার অধিবেশনের জায়গাটিকে বলা হতো সংস্থাগার। কোশলের রাজপুত্র বিরূঢ়ক মাতুলালয়ে এলে তাঁকে এই সংস্থাগারেই থাকতে দেওয়া হয়েছিল। শাক্যরা ওপরে ওপরে রাজপুত্রের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত ঠিকই কিন্তু অন্তরে তারা শাক্য মহানামের দাসীপুত্রীর গর্ভজাত রাজকুমার বিরূঢ়ককে ঘৃণা করত। রাজকুমার ফিরে যাবার পর সংস্থাগারে এক দাসী রাজকুমারের ব্যবহৃত আসন ধুতে ধুতে বলেছিল– দাসীপুত্র সব কিছু অপবিত্র করে দিয়েছে, এখন যত খাটনি আমাদের। বিরূঢ়কের এক সৈনিক ভুল করে তার ভল্ল সংস্থাগারে ফেলে রেখে গিয়েছিল। সে সেটি নিতে এসে দাসীর আক্ষেপ শুনতে পায়। ক্রমশ কথাটা রাজকুমার বিরূঢ়কের কানে ওঠে এবং সে ক্রুদ্ধ হয়ে শাক্যবংশ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করে। বুদ্ধ আর্য, দাস, ব্রাহ্মণ, শূদ্রের ভেদাভেদ মিটিয়ে একট মানবজাতি গড়বার উদ্দেশ্যে তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। যেমন নানাদিক থেকে আসা নদী সাগরে এসে বিলীন হয়ে যায়, তেমনই নানা দেশ, নানা জাতির লোক বুদ্ধের ধর্মে এসে এক হয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখা যেত যখন কোনো সংঘারামে চীন-মহাচীন, কপিশা-গান্ধার, কম্বোজ প্রভৃতি দেশের ভিক্ষুরা একত্রিত হতেন। তাঁদের ভাষা, বেশভূষা এক না হলেও তাঁরা পরস্পরকে পরমাত্মীয় মনে করতেন। অনিরুদ্ধ, আনন্দ ইত্যাদি কত শাক্যপুত্রের দল তথাগতর মহাসংঘে যোগ দিয়ে তাঁর শাসনকে (ধর্ম) এগিয়ে নিয়ে গেছে। উপালি ছিল শাক্যদের ক্ষৌরকার। বুদ্ধ সর্বপ্রথম তাঁকেই উপসম্পদা দিয়ে ভিক্ষু করে নেন। পরবর্তীকালে যারা ভিক্ষু হয় জ্যেষ্ঠ হিসাবে তাঁরা উপালিকে অভিবাদন করতে বাধ্য ছিল। বুদ্ধ এভাবে জাতিভেদ প্রথাকে দূর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শাক্য জাতির মধ্যে এই ভাবনা ছিলনা। আসলে জাতিভেদের পিছনে থাকে সম্পত্তি এবং প্রভুত্ব। তবে তুর্ক, হেপতাল (শ্বেতহূণ) ইত্যাদি যাযাবর গোষ্ঠীর মধ্যে এক ধরনের সাম্য আমি দেখেছি। মিহিরকুল তাঁর বিজিত রাজ্যের মানুষের কাছে যে আসনেই আসীন থাকুন না কেন, তাঁর স্বজাতীয় হেপতালদের গোষ্ঠীতে তাঁকে তাদের ভ্রাতা হয়েই থাকতে হয়। যেটা মৌখারি ঈশ্বরবর্মার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।

বুদ্ধিল বলছিল– যদিও শাক্যদের মধ্যে গণশাসন ব্যবস্থার চলন ছিল, তথাপি তা বৈষম্যহীন ছিলনা, সেখানে প্রচুর দাস দাসী ছিল। রাজকুমার বিরূঢ়কের নির্মম প্রতিশোধের কাহিনির মধ্য দিয়ে তা প্রমাণিত। শাক্যদের জাত্য। ভিমান এত তীব্র ছিল যে কোশলরাজ প্রসেনজিৎকেও তারা তাদের চেয়ে হীন ভাবত। এবং নিজেদের গোত্রের কন্যার সঙ্গে প্রসেনজিতের বিবাহ তারা দেয়নি। শাক্য মহানাম তাঁর দাসীপুত্রী বার্ষভক্ষত্রিয়ার পরিচয় গোপন রেখে রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে তার বিবাহ দেয়, যার ফলে রাজকুমার বিরূঢ়কের জন্ম হয়। তবে একথা ঠিক যে শাক্যবংশীয়দের মধ্যে যথেষ্ট

ভ্রাতৃভাব বজায় ছিল। সম্পত্তি কম বেশি থাকলেও শাসনকার্যে সকলেরই সমানাধিকার ছিল। বৌদ্ধভিক্ষুদের সঙ্গে শাক্যভূমির কি সম্পর্ক তা একটি কথাতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন তাদের শাক্যপুত্রীয় বলা হয়।

এই আলোচনার ফলেই আমি জানতে পারলাম যে ভিক্ষুসংঘ কোনো একজনের মতামতে চলেনা, চলে সম্মিলিত সিদ্ধান্তে। বুদ্ধ নিজে একটি গণরাজ্যে জন্মেছিলেন। পরবর্তীকালে মগধ, কোশল, বৎস প্রভৃতি বড়ো বড়ো রাজ্যের রাজারা তাঁকে প্রভূত সম্মান দিয়েছেন, তথাপি বুদ্ধ রাজতন্ত্রের চেয়ে গণশাসনকেই শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করেছেন। তিনি সংঘের মধ্যে নিয়মিত সংঘ সন্নিপাত (সংঘের বৈঠক), ছন্দ গ্রহণ (ভোট দেওয়া), ছন্দ শলাকার (ভোট দেওয়ার কাঠি) ব্যবহার, এবং য়দভূয়সিক (বহুমত) মান্যতা ইত্যাদি নিয়মগুলিকে চালু করেছিলেন। গণরাজ্যে যে সাম্য ছিলনা, বুদ্ধ সংঘের মধ্যে সেই সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি (পুদগলিক) প্রত্যেকটি ভিক্ষুর শরীরের আটটি জিনিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। গৃহ, আরাম, ইত্যাদি অন্য সব কিছু হবে সংঘের সামুদায়িক সম্পত্তি। কালের প্রভাবে আজ হয়তো সাংঘিক জীবনে সাম্য সেভাবে নেই, কিন্তু যেটুকু আছে তাও খুব একটা কম নয়।

আমাদের ইচ্ছে ছিল যে শাক্যভূমিতে তথাগতর বংশের কোনো শাক্যর সঙ্গে পরিচিত হব। কিন্তু জানতে পারলাম রাজকুমার বিরূঢ়ক আক্ষরিক অর্থেই শাক্যদের বিনাশ করেছিল। যে সামান্য সংখ্যক রক্ষা পেয়েছিল তারা আরও উত্তরে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে পালিয়ে যায়। শাক্য ভূমির এখন অনেকটাই অরণ্য। শ্রাবস্তী থেকে বারো যোজন পথ চলার পর আমরা যে জায়গায় এলাম, সেখানে বুদ্ধেরও আগে ক্রকচ্ছন্দ বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এখানে একটি স্তূপ এবং অশোকের শিলাস্তম্ভ আছে। এখান থেকে এক যোজন দূরে কোনাগম বুদ্ধের জন্মস্থান। পরদিন আমরা কপিলাবস্তু পৌছালাম। কৌশাম্বী, শ্রাবস্তীতে তবু কিছু লোকজন, ভগ্ন, অভগ্ন বাড়ি ঘর আছে কিন্তু কপিলাবস্তুতে সবটাই ধ্বংসস্তূপ। কোনো একটি ভগ্নস্তূপ দেখিয়ে আমাদের বলা হলো, এটি ছিল সিদ্ধার্থের গ্রীষ্মাবাস আর ওটি হেমন্তাবাস। যেখানে বিরূঢ়ক শাক্যদের সংহারলীলা চালিয়ে ছিল, সেই জায়গাটিকেও দেখলাম। তবে সব কিছু মিলিয়ে কপিলাবস্তু নগরের দেখা পাওয়া গেলোনা। কপিলাবস্তুর পর লুম্বিনী। 'এখানেই বুদ্ধ শাক্যমুনি জন্মেছিলেন' অশোকের প্রতিষ্ঠিত শিলাস্তম্ভে এই কথা কটি আজও উৎকীর্ণ আছে। তথাগতর মাতা আসন্ন প্রসবা অবস্থায় কপিলাবস্তু থেকে তাঁর পিতৃগৃহ কোলীয় (দেবদহ নগর) যাচ্ছিলেন, পথে লুম্বিনী উদ্যানেই তাঁর প্রসব বেদনা ওঠে এবং সেই অলৌকিক শিশুর জন্ম হয়। পরবর্তীকালে যিনি সারা পৃথিবীর দুঃখ অন্ধকার দূর করার সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। সেই দিনটি ছিল বৈশাখের পূর্ণিমা। লুম্বিনী উদ্যানও সেদিন সেই অলৌকিক শিশুকে স্বাগত জানাতে পুষ্প, পত্র, পল্লবে সেজেছিল। লুম্বিনী উদ্যানের সরোবরে ছিল নীলাভ বর্ণের স্বচ্ছ জল। সেই সরোবর আজও রয়েছে। সরোবরের তীরে মায়া দেবীর একটি মূর্তি আছে যেখানে তিনি একটি শাল গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছেই একটি কূপ রয়েছে। কিংবদন্তি যে সদ্যজাত শিশুকে এই কূপের জলে স্নান করানো হয়েছিল। আজ সেই পবিত্র সরোবর এবং কূপের জলে

আচমন করে নিজেদের পরম ভাগ্যবান মনে করলাম। কপিলাবস্তু এখন এক জনশূন্য অরণ্যে পর্যবসিত হয়েছে, সেজন্য সেখানে এবং লুম্বিনীতে যেতে হলে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

সুনন্দ অশ্রুপূর্ণ চোখে তথাগতর অন্তিম বাণীগুলিকে আমাদের শোনালেন–

'আনন্দ! শ্রদ্ধালু কুলপুত্রদের জন্য চারটি স্থান দর্শনীয়, সর্বজনীয় (বৈরাগ্যপ্রদ) হবে। সেই চারটি স্থান কোথায়? (১) লুম্বিনী-এখানে তথাগত জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (২) বুদ্ধগয়া– এখানে বুদ্ধ অনুত্তর সম্যক-সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। (৩) সারনাথ–এখানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন এবং (৪) কুসীনারা– এখানে তথাগত নির্বাণধাতু প্রাপ্ত হয়েছিলেন। আগামী যুগে শ্রদ্ধালু উপাসক উপাসিকারা, ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা এই জায়গাগুলিকে দেখবে কারণ ওখানে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছেন, বুদ্ধ হয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

লুম্বিণী থেকে কয়েকদিন ধরে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে আমরা ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে চলেছিলাম।

কুসীনারা– (কসনা)– লুম্বিনী থেকে এক পক্ষকাল পথ চলার পর আমরা বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ স্থান কুসীনারা পৌছালাম। আমরা সকলেই সেখানে বিভিন্ন নিকায় থেকে পারায়ণ (পাঠ) করলাম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের কালে কুসীনারা বেশ বড়ো নগরী এবং মল্লদের গণরাজ্য ছিল। বুদ্ধের নশ্বর শরীরের অন্তিম সংস্কার করার সৌভাগ্য তারাই লাভ করেছিল। এখানেই বুদ্ধ অন্তিম শয়ানের প্রাক্কালে শুভদ্রকে শেষ দীক্ষা দেন। কুসীনারাও এখন ধ্বংসের মুখে। পরিনির্বাণ স্তূপের কাছে ভিন্ন ভিন্ন নিকায়ের ছোট ছোট কয়েকটি বিহার। যেখানে তথাগতর দাহক্রিয়া হয়েছিল মুকুটবন্ধন নামের সেই জায়গাটিকেও আমরা দেখলাম।

কুসীনারার পর আমাদের যাত্রা শুরু হলো বৈশালীর পথে। পথের দূরত্ব প্রায় বাইশ যোজন। দুদিন পথ চলার পর মধ্যমণ্ডলের পঞ্চম মহানদী মহী (গণ্ডক) পার হলাম। ভূমি এবং গ্রাম লুম্বিনী অঞ্চলেরই মতো। ক্ষেত্রে ধানের ফসল পরিপক্ক হয়েছিল। আমরা পাঁচজন ভিক্ষু একত্রে পথ চলছিলাম, এবং ভাষার ব্যবধান একদিনে বেশ খানিকটা দূর হয়েছিল। শাক্যদের ভূমিতে প্রবেশের পর থেকেই প্রাচীন গণরাজ্যের কথা শুনেছিলাম, এবং বিষয়টি আমার মনোরাজ্যে যথেষ্ট দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। রাজা-শাসিত রাজ্য অনেক দেখেছি কিন্তু গণরাজ্য একজনের নয় বহুজনের রাজ্য, একথাটা এখানে এসেই প্রথম শুনি। বৈশালীর দিকে আমরা যে পথ ধরে চলেছিলাম, হাজার বছর আগে সেটাও ছিল এক গণরাজ্য। শাসক রাজা, নিজের এবং পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেয়। কিন্তু গণরাজ্যে নিশ্চয়ই তা হতো না। কোশল ও মগধের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সে আমলে অনেকগুলি গণরাজ্য ছিল। মল্ল আর লিচ্ছবি গণরাজ্যের মধ্যে সীমানা ছিল মহী নদী, বৈশালীর গণরাজ্যে শক্তি এবং সম্পদের চরম বিকাশ ঘটেছিল। সমগ্র শরীরকে বাঁকিয়ে নাসাবলোকন করে তথাগত অন্তিমবার বৈশালীকে দর্শন করেছিলেন, এবং তারপর আনন্দকে বলেছিলেন–

'আনন্দ! বৈশালী বড়ো রমণীর স্থান। তেমনই রমণীয় সেখানের উদয়ন চৈত্য, সপ্তাম্রক চৈত্য, বহুপুত্রক চৈত্য এবং সারংদদ চৈত্য। এই চারটি চৈত্যের অবস্থান ছিল বৈশালীর নগর দ্বারের বাইরে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণের দিকে। সেখানে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ছিল দেবস্থান, উদ্যান এবং সরোবর। সেই রমণীয় ভূভাগ থেকে লিচ্ছবি ভগবানের দর্শনের জন্য আরও দক্ষিণে আম্রপালি বনে পৌছে বুদ্ধ তাঁর শ্রাবকদের বলেছিলেন– 'ভিক্ষুগণ! লিচ্ছবি পরিষদকে দেখো। একে ত্রায়স্ত্রিংশ দেবতার পরিষদ ভাবতে পারো।'

হয়তো কোনো কালে বৈশালী সত্যিই রমণীয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে সে লণ্ডভণ্ড, বিপর্যস্ত। যেখান থেকে লিচ্ছবি গণরাজ্যের শাসনকার্য পরিচালিত হতো সেই সংস্থাগারটিকে অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে বার করতে পারলামনা। বৃজিদের (বৈশালী-লিচ্ছবি গণরাজ্যের বাসিন্দা) বিচার ব্যবস্থা প্রশংসা করতে ভগবান বুদ্ধ কখনও ক্লান্ত হতেন না। অপরাধীর প্রাথমিক বিচার করতেন বিনিশ্চয় মহামাত্য (ন্যায়াধীশ)। অপরাধ প্রমাণিত না হলে মুক্তি দেওয়া হতো, আর প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাৎ দণ্ডবিধান না করে ব্যবহারিকের (উচ্চন্যায়াধীশ) কাছে পাঠানো হতো। সেখানে অপরাধ পুনঃপ্রমাণিত না হলে অপরাধী মুক্তি পেত আর প্রমাণিত হলে তাকে সুত্রধরের হাতে সমর্পণ করা হতো। তার হাত থেকে অপরাধী অষ্টকুলিক, সেনাপতি, উপরাজ (উপসেনাপতি) হয়ে গণপতির হাতে সমর্পিত হতো। এই সমস্ত জায়গাতেও যদি অপরাধ প্রমাণিত হতো তখন 'দণ্ডবিধান' পুস্তকের বিধান অনুযায়ী অপরাধীকে দণ্ডিত করা হতো। ন্যায়বিচার দানের জন্য লিচ্ছবিরা কতগুলি পর্যায়ের সৃষ্টি করেছিল। সেজন্যই তো বুদ্ধ লিচ্ছবিদের বিচার ব্যবস্থা শতমুখে প্রশংসা করেছেন। বুদ্ধিল বলল, তথাগত বৈশালী গণশাসন ব্যবস্থা থেকেই ভিক্ষু সংঘের পরিচালনার নিয়মাবলী প্রস্তুত করেছিলেন। তথাগতর জীবনের শেষ বর্ষা এই বৈশালীর ভূমিতেই কেটেছিল। বৈশালীর সেই রমণীয় চৈত্য চারটি আজও বর্তমান, তবে তাদের রমণীয় অবস্থা আর নেই। তাছাড়াও কোর মট্টক, চাপাল ইত্যাদি নামের আরও কয়েকটি চৈত্য ছিল যেগুলি এখন আর নেই। চাপাল চৈত্য ছিল পশ্চিম দ্বারের কাছে। এখানেই বুদ্ধ প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন যে আর তিনমাস পর তাঁর দেহাবসান ঘটবে। প্রধান চৈত্যের জায়গা দখল করেছে একটি পাশুপত মন্দির। বুদ্ধের প্রথম যুগে স্তূপ, পদচিহ্ন, আসন, বোধিবৃক্ষ ইত্যাদিকে তাঁর প্রতীক মনে করে পূজা করা হতো, বর্তমানে প্রতীকের পরিবর্তে এসেছে বুদ্ধমূর্তি। ব্রাহ্মণেরা একসময় হবন এবং যজ্ঞের মাধ্যমেই দেবতার উদ্দেশে পূজা নিবেদন করত এখন তারা পশুপতি (শিব) ও অন্যান্য দেবতার মূর্তি গড়ে মূর্তি পূজায় সর্বাগ্রে রয়েছে। পশুপতি মন্দিরে পশুপতি গৌরীর পরিবর্তে মুখলিঙ্গের আধিক্য। লিঙ্গ (শিষ্ণ) পূজা আমার কাছে এক আশ্চর্যের বিষয় বলে মনে হয়। বর্তমানে এখানে দেখলাম লিঙ্গপূজক পাশুপতদেরই প্রাধান্য বেশি।

বৈশালী স্থান হিসেবে যতনা রমণীয় ছিল, তার চেয়েও বড়ো কথা এখানকার বহুজন সুখী ছিল। জাতি হিসেবে তারা বীর হলেও নিজেদের অন্তর্কলহের কারণে

অজাতশত্রুর শিকারে পরিণত হয়। রাজা রাজড়াদের মধ্যে একজন আরেকজনকে গিলে ফেলে নিজেদের শক্তি সামর্থ বৃদ্ধি করত, কিন্তু গণরাজ্যের সেরকম কোনো পরিকল্পনা থাকতনা। যার ফলে তার ভূমি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য থাকত। সীমিত ভূখণ্ড ও লোকবলের গণরাজ্য বিশাল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির মুখে টিকে থাকতে পারেনি। অজাতশ্রুতর পর সেই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত। অশোক কপিশা থেকে আরম্ভ করে সমগ্র জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন। এই সব রাজারা ইচ্ছে করলেই বিশাল সামরিক বাহিনী উপস্থিত করতে পারতেন, অন্যদিকে গণরাজ্যের অধিবাসীরা যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় হয়তো রাখতে সক্ষম হতো কিন্তু পরাজয় এড়ানো সম্ভব হতো না। তবুও বৈশালী হয়তো আরও কিছুদিন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারত যদিনা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতো। বুদ্ধিল বলল, বৈশালী গণরাজ্য অজাতশত্রুকে ঠেকাতে পারলেও বিশাল নন্দ বংশের সামনে টিকতে পারতনা। বুদ্ধিলের যুক্তি শুনে আমি কিছুটা হতাশ হলাম। গণরাজ্যে মানুষ সুখে থাকলেও শত্রুও তরবারির সামনে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ে। একমাত্র সর্বত্রই যদি গণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলেই এই অবস্থা এড়ানো যেতে পারে।

বর্তমানে বৈশালীর প্রাচীন লিচ্ছবি বংশীরা ক্ষেতে কৃষিকাজ করে নয়তো মৌখারিদের সেনাবাহিনীর সৈনিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। একদিন যেমন কোশলের অত্যাচারে শাক্য মল্লরা দূর হিমালয় অঞ্চলে পালিয়ে গিয়েছিল, তেমনই বহু লিচ্ছবি নেপালে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। তবে তারা সেখানে আর গণরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেনি সোজাসুজি রাজতন্ত্র গ্রহণ করেছিল।

বৈশালী থেকে তিনদিনের পথ গঙ্গা। গঙ্গা এখানে আরও কয়েকটি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে যার মধ্যে শোন এবং মহী বড়ো, বাকি দুটি খুবই ছোট। গঙ্গার যে কুলে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেটা বৃজিদের ভূমি। আর ওপারে মগধ। এই গঙ্গাস্রোতেই আনন্দ মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তাঁর পার্থিব শরীরের দাবিদার বৃজি এবং মগধ, উভয়পক্ষই হয়েছিল গঙ্গার ডানদিকে বহুদূর পর্যন্ত পাটলিপুত্র নগর প্রসারিত। তথাগতর অন্তিম লগ্নে এটি ছিল পাটলিগ্রাম, নগর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ তখন সবে মাত্র আরম্ভ হয়েছে। পরে পাটলিপুত্র জম্বুদ্বীপের শ্রেষ্ঠ মহানগরে পরিণত হয়। মৌর্য যুগের পর গুপ্ত যুগেও পাটলিপুত্র সমগ্র জম্বুদ্বীপের রাজধানী ছিল। বর্তমানে রাজলক্ষ্মী অনেক ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে বৈভবও কান্যকুব্জ, পাটলিপুত্র এবং অন্যান্য রাজধানীর মধ্যে বন্টিত হয়ে গিয়েছে। মৌর্য যুগের সামান্য কিছু ইমারত এবং গুপ্তযুগের অনেক ইমারত এখনো পাটলিপুত্রে দেখা যায়। মগধের ভূমি অতি পবিত্র। এখানকার বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়া) কুমার সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। পাটলিপুত্র আমরা নিছক বেড়াবার উদ্দেশ্যে যাইনি, নালন্দা গিয়ে দেশ বিদেশের বিদ্বজনের কাছে কিছু শিখব এই ইচ্ছাও ছিল। চন্দ্রগোমী, চন্দ্রকীর্তির মতো মহাপণ্ডিতদের চরণতলে বসে বিদ্যা লাভের এমন সুযোগ আর কোথায় পাওয়া যেতে পারে?

সিংহলে (৫৪৭ খ্রিঃ)

আমি আর বুদ্ধিল, দুজনেই জন্ম ভবঘুরে। ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেই আমরা আনন্দ খুঁজে পেতাম। উদ্যানে কিছুকাল ভিক্ষু হয়ে এক জায়গায় আবদ্ধ হয়েছিলাম, কারণ তখনও বিপুলা এই পৃথিবীর আকর্ষণ তেমনভাবে অনুভব করিনি। ভবঘুরে স্বভাব সত্ত্বেও কি করে যে নালন্দায় প্রায় তিন বছর কাটিয়েছিলাম, সেটাই ছিল আশ্চর্যের। জ্ঞানার্জনের আকর্ষণ বোধ হয় ভবঘুরে বৃত্তির আকর্ষণকেও হার মানিয়েছিল। স্থবির সুনন্দ আমাদের সঙ্গে রাজগৃহ, বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) এবং নালন্দা পর্যন্ত ছিলেন, তারপর স্বদেশে ফিরে যান। যাবার আগে আমাদের বিশেষ করে অনুরোধ করে যান, আমরা যেন অবশ্যই সিংহলে যাই। মহাসমুদ্রবেষ্টিত সিংহল দ্বীপটিকে দেখার আগ্রহ আমাদেরও কম ছিল না। নালন্দা পর্ব সমাপ্ত হলে আমরা সিংহল যাব বলে স্থির করি। সাতশত যোজন দূরত্বের পথ। জলপথে গেলে অনেক কম সময়ে, কম কষ্টে সিংহলে যাওয়া যায়। আমরা জলপথ এবং স্থলপথ দুটোকেই প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করব বলে স্থির করলাম। তাম্রলিপ্ত পূর্ব সমুদ্র পথের এক বিশাল তীর্থ (বন্দর)। এখানে নানা দেশের বণিক, শ্রেষ্ঠী এবং তাদের বিশাল বিশাল নৌকা আমরা দেখতে পেলাম। যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ (সুমাত্রা), কম্বোজ, মহাচীন ছাড়া পারসিক, যবন (গ্রিক), রোম ইত্যাদি পশ্চিম দেশের অনেক লোকেরও সাক্ষাৎ পেলাম। তাদের বেশভূষা, ধর্ম, আকৃতি, ভাষা সবকিছুর মধ্যেই আলাদা বৈচিত্র্য ছিল। আমরা স্থির করেছিলাম যে তাম্রপর্ণী (সিংহল) যাব, নচেৎ আমরা যবদ্বীপ হয়ে মহাচীনে যাবার সুযোগও পেয়েছিলাম, দক্ষিণের ধান্যকটক এবং শ্রীপর্বত পর্যন্ত স্থলপথেই যাওয়া চলে। কিন্তু স্থলপথে হিংস্র জন্তু এবং দস্যুতস্করের উপদ্রব খুব বেশি। জলপথে গেলে কলিঙ্গ দেশ দেখা হবে না বলে একটা আফসোস মনের মধ্যে থেকে গেলো।

নালন্দা ছেড়ে তাম্রলিপ্ততে যখন আমরা পৌছালাম তখন শীত আরম্ভ হয়ে গেছে। শীত থাকতে থাকতেই আমরা অন্ধ্র দেশে পৌছাই যদিও শীতের প্রকোপ সেখানে খুবই কম ছিল। ধান্যকটক দক্ষিণের এক মহানগরী। ইক্ষাকু বংশের আমলে ধান্যকটকের সমৃদ্ধি অনেক নগরীর ঈর্ষার কারণ ছিল। সমুদ্র থেকে কৃষ্ণা নদী হয়ে বড়ো বড়ো অর্ণবপোত আসত। ধান্যকটক শুধুমাত্র রাজাদের রাজধানী ছিল না। সেটি শ্রেষ্ঠীদের রাজধানীও ছিল। আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌছাই তখন ধান্যকটকের গৌরব হস্তান্তরিত হয়েছে কাঞ্চীর কাছে। সেখানে পল্লব বংশের শাসন। প্রাচীন বৈভবের বেশ কিছু চিহ্ন দেখতে পেলাম শ্রীপর্বতের চৈত্যগুলির মধ্যে। সুন্দর শ্বেতপাথরের মানুষ, পশুপাখি, লতাপাতা, ফুল-ফল, বাস্তু ইত্যাদি খোদিত আছে। আমি চিত্রকর কিংবা ভাস্কর ছিলাম না, কিন্তু ভ্রমণের ফলে কপিশা এবং গান্ধারের শিল্পকলাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি, এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। মনে হয়েছে সে যুগের শিল্পীরা যেন পাথরে ছেনি হাতুড়ি ব্যবহার করেনি, করেছে মাখনের মধ্যে, সেজন্যই তাদের সৃষ্টির মধ্যে এত কোমলতা। ধান্যকটক থেকে কৃষ্ণা নদীপথে খানিক দূর গিয়ে তারপর অরণ্যের মধ্যে হাঁটাপথে শ্রীপর্বতে যেতে হয়। আর্য নাগার্জুন এখানে অনেকদিন

ছিলেন। এই জায়গার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভিক্ষুরা এখানে সংঘারাম গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তীকালে পুরানো বিহারের (সংঘারাম) সংরক্ষণ বা সংস্কার না করে ভিক্ষুরা নতুন নতুন বিহার নির্মাণ করেছেন। কালের প্রভাবে সেগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এভাবে শ্রীপর্বতে জীবিত বিহারের চেয়ে মৃত বিহারের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছে। যে কটি বিহার জীবিত আছে তাদের অবস্থাও শোচনীয়। এর প্রধান কারণ হলো সম্রাট এবং শ্রেষ্ঠীদের ওপরে ভিক্ষুদের প্রভাব অনেক হ্রাস পেয়েছে এবং সেই জায়গা দখল করেছেন ব্রাহ্মণেরা। আমি ভাবছিলাম ইদানীং বণিক শ্রেষ্ঠীরা বুদ্ধের আদর্শ ছেড়ে কেন বেশি বেশি করে পাশুপত ধর্মের আশ্রয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধিল বলল, বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠীরা জাতিভেদ প্রথার সমর্থক এবং ব্রাহ্মণদের স্বীকৃতি না পেলে উঁচু জাতির লোক বলে গণ্য হওয়া যায়না।

শ্রীপর্বত থেকে ধান্যকটকে গিয়ে সেখান থেকে খানিকটা সমুদ্রপথে যাবার পর আবার নদীপথ ধরে আমরা পৌঁছালাম কাঞ্চীপুরীতে। কাঞ্চীপুরী পল্লবদের রাজধানী এবং ধান্যকটককে অস্তমিত করেই এই নগরীর শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। নগরীতে পাশুপত ধর্মেরই জয় জয়কার। জৈন এবং বৌদ্ধরা আছে তবে খুবই শ্রীহীন অবস্থায়। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, আচার্য দিঙনাগের জন্মভূমিতে একজনও উচ্চশ্রেণীর প্রমাণশাস্ত্রী নেই। শুনলাম আরও দক্ষিণে কাবেরী পত্তন নামের এক জায়গায় এখনো কিছু বৌদ্ধ আচার্য আছেন। কাঞ্চীপুরী থেকে সমুদ্রপথে আমরা কাবেরী পত্তন গেলাম। সমুদ্রের তীরে এক বিশাল পত্তন (বন্দর), তাম্রলিপ্তর মতোই এখানেও নানা দেশের বাণিজ্য পোতের সতত আসা যাওয়া। এখানে কয়েকটি ভালো ভালো বিহার আছে যেখানে মহাবিহার নিকায়ের ভিক্ষুদের বাস। এখানকার ভিক্ষুরা তাঁদের সনাতন ঐতিহ্য বজায় রাখার বিষয়ে এত বেশি তৎপর যে অন্য কোনো নিকায়ের পিটক বা বিনয়ের দিকে তাঁদের কোনো আগ্রহ নেই। বুদ্ধিল বলল, সম্পূর্ণ মৌলিক, বিন্দুমাত্র মিশ্রণহীন কোনো ঐতিহ্য আদপেই টিকে থাকতে পারে না।

দক্ষিণাপথ ঘুরতে ঘুরতে যে কথাটা আমার বেশি করে মনে হলো, যে প্রমাণ শাস্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে এখন উত্তরপথের ভূমিকাই অনেক বেশি, যার সূত্রপাত ঘটেছিল উত্তরে বসুবন্ধু এবং দ্রমিল ভূমিতে (দক্ষিণীপথ) দিঙনাগের হাতে। সিংহলী ভিক্ষুদের বিনয় নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু সিংহল যাত্রার আগ্রহের পিছনে সেটার কোনো ভূমিকা ছিল না, ছিল শুধু ভবঘুরে বৃত্তির আকর্ষণ। কাবেরী পত্তন থেকে জাহাজে সিংহলের জম্বুকোল পত্তনে গিয়ে নামলাম। সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর সেখান থেকে সাতদিনের পথ। অনুরাধাপুরে তিনটি বড়ো এবং তিনটি ছোট সংঘারাম আছে। আমরা আশ্রয় নিলাম অভয়গিরি বিহারে। মহাবিহার এখানকার সবচেয়ে প্রাচীন ও পূজ্য বিহার। অশোক পুত্র স্থবির মহেন্দ্র এই বিহারের প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের হিসেব মতো তখন শীতের মাঝামাঝি কিন্তু অনুরাধাপুরে শীতের বিন্দুমাত্র প্রভাব ছিলনা। মশামাছির উপদ্রবে গায়ে একটা পাতলা কাপড় রাখতে হয়, না হলে তারও প্রয়োজন ছিলনা। সিংহলের রাজা কুমার ঋতুসেন মহাবিহারের ভিক্ষুদের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু অভয়গিরি বিহারও তাঁর শ্রদ্ধা পেত। এখানকার স্তূপটি এত বিশাল যে মনে হয় যেন ছোটখাটো

পাহাড়। রাজধানীতে যবন (গ্রিক) মিশর এবং যবদ্বীপের প্রচুর লোক দেখলাম এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছে। এখানে থাকার সময় কখনো ভাবতাম যবদ্বীপে যাব, আবার কখনো ভাবতাম আমার দেশ উদ্যানের উত্তরে তুষার দেশটি ঘুরে দেখব। বর্ষাবাসের পরেই আমরা সিংহল ছাড়ব সিদ্ধান্ত নিলাম। শুনলাম রাজধানীর দক্ষিণে একটি পাহাড় আছে, যেখানে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত বিহার রয়েছে এবং আবহাওয়া রাজধানীর তুলনায় খানিকটা ঠাণ্ডা। প্রচণ্ড গরমে আমাদের প্রাণ যখন ওষ্ঠাগত প্রায় তখন ওরকম একটা ঠাণ্ডা জায়গার খবর পেয়ে আমরা খুবই আনন্দিত হলাম। দুদিন ধরে পাহাড়ের পথে চলার পর এল ঘন জঙ্গলের পথ। দুদিন একটানা চলার পরও কোনো গ্রামের দেখা মিললনা। আমাদের সঙ্গে তীর্থ যাত্রীদের একটা ভারি গোছের দল ছিল। রাজধানীতেই আমাদের সতর্ক করা হয়েছিল যে এই অরণ্যে বুনো ব্যাধ জাতির বাস এবং তারা অত্যন্ত নৃশংস। সেই কারণেই দলে ভারি হয়ে আমরা এ পথে এসেছিলাম। অনেকটা চলার পরও তেমন কিছু দেখতে না পেয়ে মনে হলো নরহত্যাকারী ব্যাধদের কাহিনি নিছকই গল্প কথা। দশদিন চলার পর পাহাড়ের উপত্যকার এক বিশাল হ্রদের কিনারায় গিয়ে উপস্থিত হলাম। একটি নদীর উৎস ছিল হ্রদটি। সেখানে ছোট একটি জনপদ। কিছু লোক কাঠ ও বনজ সম্পদের কারবার করে আর কিছু লোক কৃষিজীবী। দীর্ঘ যাত্রা পথে কোনো বিপরীত দিক থেকে আসা কোনো পথিকের মুখোমুখি হইনি, কোনো বিহারও দেখিনি। এ সমস্ত দেখে শোনা কথায় একটু একটু করে বিশ্বাস হতে আরম্ভ করেছিল। হ্রদের কাছে ছোট অথচ সুন্দর একটি সংঘারাম হঠাৎই যেন আবিস্কৃত হলো। হ্রদের চারপাশে গহন অরণ্য। এই অরণ্যে প্রচুর হাতি আছে তবে বাঘ সিংহ ছিল না। হ্রদের দৃশ্য ছিল খুবই সুন্দর। সহযাত্রীরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের সাবধান করত, কিন্তু হাতির ভয়ও ছিল না, ব্যাধের ভয়ও ছিলনা। প্রতিদিন ভোরে বিহারের এক ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে বেড়িয়ে আসতাম। এখানকার ভিক্ষুদের দৃষ্টিতে আমরা তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলাম না। সকাল বেলা জলপান সেরে বের হওয়া গেলো। সঙ্গে কিছু খাদ্যদ্রব্য। ভিক্ষুদের মধ্যাহ্ন ভোজের আগে আহার করে নিতে হয়। এছাড়া সঙ্গে উপাসক আছেন। অরণ্যের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চলেছিলাম। আমাদের সঙ্গীদের কয়েকজন এই পথে এর আগেও এসেছিলেন এবং ব্যাধদের সঙ্গে দ্রব্য বিনিময় করেছিলেন। আহারের সময় হয়েছিল, আমরা আহার শেষ করলাম। সঙ্গীরা আমার কাছ থেকে আমাদের উদ্যানভূমির গল্প শুনছিলেন। বুদ্ধিল মাঝেমধ্যে সরস মন্তব্য করে সকলকে হাস্যরসে মজিয়ে রাখছিল। কিন্তু উপাসকের মুখে কোনো হাসি নেই। সে বার কয়েক আশংকার কথা আমাদের বলল। আমরা অরণ্যে এমন একটা অঞ্চলে ছিলাম যেখানকার মাটি কখনও লাঙ্গল কিংবা কোদালের স্পর্শ পায়নি। পাহাড়ে পৌছানোর পর শেষ মানুষের বসতিটিও ছেড়ে এলাম। উপাসক কান খাড়া করে কোনো বিশেষ শব্দের প্রতীক্ষা করতে লাগল। একটু অন্য আওয়াজ পেলেই সকলে সতর্ক। তাদের কাছে কুড়ুল ও তীর ধনুক ছিল। আমরা পাঁচজন ভিক্ষু অস্ত্র রাখতে পারি না। উত্তেজনা, পথশ্রম এবং আহারের পরবর্তী অবস্থার কারণে শরীর ঘুমে ভেঙে আসছিল, এবং শোওয়া মাত্রই দুচোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল। বেশিক্ষণ বোধ হয়

ঘুমোইনি, হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেলো। দেখলাম, জনা কুড়ি ব্যাধ আমাদের চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে। ব্যাধদের শরীরে কোনো বস্ত্র নেই। তাদের আকৃতি হ্রস্ব কিন্তু সুগঠিত বর্ণ কালোজামের মতো। প্রত্যেকের কাঁধেই ধনুর্বাণ, হাতে ভারি এবং ধারাল কুড়ুল। উপাসকের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে করুণ। মনে হলো মৃত্যু যেন সশরীরে আমাদের সামনে উপস্থিত। ব্যাধেরা চিৎকার করছিল, বোধ হয় কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু তাদের কথার কিছুই আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। বুঝলাম ব্যাধদের দেশে আমরা অনধিকার প্রবেশ করে ফেলেছি। ভাবনা চিন্তা করার কোনো অবকাশই তারা আমাদের দিলোনা। উপাসকের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের চলতে ইশারা করল। চতুর্দিক থেকে আমাদের ঘেরাও করে তারা দ্রুত পায়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিশাতে চলতে লাগল। প্রতি পদে পদে অরণ্য যেন আরও ঘন এবং গভীর হয়ে চলেছে। আমি আমার সামনের দুজন ব্যাধকে দেখছিলাম। তারা উভয়েই নগ্নদেহী কিন্তু শরীরের দিক থেকে একজন অধিক বলশালী। তার আজন্ম বর্ধিত চুলে ফুল, পাতা এবং পাখির পালক গোঁজা, তার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাকে দলের অন্যদের চেয়ে একটু পৃথক করে রেখেছিল। বোধ হয় সে ব্যাধদের রাজা বা দলপতি জাতীয় কেউ ছিল। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন কোনো কুশলী ভাস্করের তৈরি মূর্তি। রঙ সম্বন্ধে প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত আছে। অন্যদের তুলনায় বুদ্ধিলের গায়ের রঙ অনেক ফর্সা হওয়া সত্ত্বেও উদ্যানে তাকে শ্যামল বর্ণই বলবে। অন্য দুজন ভিক্ষুর গায়ের রঙ ছিল গোধূম বর্ণের। কেবল মাত্র একজন ভিক্ষু এবং উপাসকের গায়ের রঙ ছিল ব্যাধদের মতোই কালো। ধরা পড়ার পর থেকেই ব্যাধেরা আমাকে দেখিয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন সব আলোচনা করছিল। বুঝতে পারছিলাম যে তাদের ইঙ্গিত আমার শ্বেতবর্ণ এবং নীলাভ চোখের দিকে। তখনকি আর জানতাম যে আমার দেহের রঙ আমার উপকারের বদলে চরম অপকার করবে। সূর্যাস্ত হতে অল্পক্ষণ বাকি ছিল, আমাদের নিয়ে ব্যাধের দল একটা বড়ো গোছের নদীর তীরে এল। এখানে পাহাড়ের গায়ে বিশাল একটি প্রাকৃতিক গুহা, যার দ্বারের কাছে আরও পঁচিশ তিরিশজন ব্যাধ দাঁড়িয়েছিল। এদের অধিকাংশই স্ত্রীলোক, অল্প কিছু বাচ্চা ও বৃদ্ধ। বৃদ্ধদের চুলের রঙ কালো। শরীরের কুঞ্চন ও জরা দেখেই বুঝতে হয় যে তাদের বয়স হয়েছে। দলের অন্যান্যদের দেখে আমাদের ব্যাধেরা উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। গুহার কাছের লোকেরাও হর্ষোল্লাসের মধ্যে আগতদের বরণ করল। ব্যাধেরা আমাদের ধরেনি আমাদের শিকার করেছে এবং শিকারের সময়েই তারা এরকম আওয়াজ করে বলে মনে হলো। আমাদের সকলকে গুহার ভিতরে ঢুকিয়ে জংলি লতাপাতা দিয়ে প্রত্যেকের হাত পা বাঁধল এবং পাঁচজন সশস্ত্র ব্যাধ আমাদের প্রহরায় নিযুক্ত রইল।

আমরা প্রকৃতির নিজস্ব সন্তানদের মধ্যে ছিলাম। তাদের ভাষা আমাদের বোঝার বাইরে ছিল এমনকি তাদের ইশারা ইঙ্গিত পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধা হতো। তবে জীবনের অন্তিম সময় যে দ্রুত এগিয়ে আসছে এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম। বুদ্ধিল বলল, খুব তাড়াতাড়িই এরা আমাদের শেষ করবে, কারণ তা না হলে, হয় আমাদের না খাইয়ে রাখতে হবে না হয় তাদের কষ্টার্জিত খাদ্যের ভাগ দিতে হবে। ব্যাধেরা এদেশের

গ্রামীণ ও নাগরিকদের কাছ থেকে হাতিয়ার ছাড়া আর কিছু নেয়না। এদের পূর্ব পুরুষেরা এদের হয়তো জানিয়ে দিয়ে গেছে যে বস্ত্র পরিহিতদের কাছে এমন এক বস্তু আছে যা সংগ্রহ না করতে পারলে টিকে থাকা যাবে না। সে বস্তু লোহা। তারপর কিভাবে তাদের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে কে জানে, এরা এদের শিকার করা পশু, কিংবা মধু অরণ্যের বাইরে এক জায়গায় রেখে আসে, বিনিময়ে বস্ত্র পরিহিতদের কাছ থেকে তারা পেত লোহার দা, কুড়ুল, তীরের ফলা। এই বিনিময় ব্যবসা চলা সত্ত্বেও উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষও জারি আছে। এবং ব্যাধেরা ধীরে ধীরে নিজেদের স্থানচ্যুত হয়ে অরণ্যের গভীরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

সেই রাত্রিতে আমাদের গুহার মধ্যেই রাখা হলো। গুহার বাইরে দু-তিন জায়গায় আগুন জ্বেলে, ব্যাধেরা শিকার পুড়িয়ে খাচ্ছিল। খাওয়ার পর তাদের নৃত্যগীত চলল, অনেকক্ষণ ধরে। গুহাটি বেশ বড় ছিল কিন্তু দরজাটাকে পাথর ফেলে ছোট করে রাখা হয়েছিল। হাত পা বাঁধা থাকার ফলে পালানো সম্ভব ছিলনা, বোধ হয় ইচ্ছেও ছিলনা। উপাসকতো মৃত্যুর আগেই মরেছিল। তাঁর দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছিল।

সকাল হলো। মৃত্যুর করাল ছায়ার মধ্যেও করুণাময় নিদ্রা আমাদের একেবারে নিরাশ করেননি। উপাসকের মুদ্রিত চোখ সকালের আলোতে ঈষৎ উন্মীলিত হলো। এবং একজন ভিক্ষু ইতিপূর্বে ব্যাধদের দেখেছিল। যেভাবে জঙ্গলে হাতি ধরে বিক্রি করা হয় সে-ভাবেই এদের ধরে নিয়ে গিয়ে সিংহলীরা বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে। দাস ব্যবসা একটা ভালো ব্যবসা। তবে ব্যাধেরা সহজে ধরা দেয় না, প্রাণপণ যুদ্ধ করে। ফলে অধিকাংশ ব্যাধ জীবন্ত অবস্থায় ধরা দিত না, আর বেশ কিছু আহতাবস্থায় আরও করুণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করত। সিংহলী দাস ব্যবসায়ীরা স্ত্রীলোক এবং বাচ্চাদের ধরার চেষ্টাই বেশি করত, কারণ যুবা ব্যাধ দাসত্ব মেনে নেয়না, খুব তাড়াতাড়ি তার মৃত্যু ঘটে। আমিও সেই সমাজ থেকে এসেছি যে সমাজ এই ব্যাধদের জীবনে রেখেছে শুধু দাসত্ব নয়তো মৃত্যু। অতএব আমি এদের কাছ থেকে কি ব্যবহার প্রত্যাশা করব? প্রতিটি মুহূর্তই আমাদের কাছে অন্তিম মুহূর্ত বলে মনে হচ্ছিল এবং তা দুঃসহ হয়ে উঠছিল, আমি আর বুদ্ধিল অন্তিম মুক্তির প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম। সময় বয়ে চলেছে, অন্য সঙ্গীরা আশা করছে যে হয়তো প্রাণে বেঁচে যাবেন। বেলা একপ্রহর হয়ে যাওয়ার পরও প্রহরীরা ছাড়া কেউ আমাদের কাছে আসেনি। বুদ্ধিল বলল, যতদূর শুনেছি সিংহলী ব্যাধেরা নরমাংস ভোজী নয়, যদি তাই হতো তাহলে আমাদের মৃত্যু সার্থক হতো। এ শরীর একদিন না একদিন মরবেই, যদি তা থেকে বেশ কয়েকজনের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় তাহলে তার চেয়ে এই নশ্বর দেহের ভালো উপযোগ আর কি হতে পারে? উপাসক কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ছিল আবার ঘুম ভাঙতেই কান্না শুরু হচ্ছিল, আমরা মধ্যমমণ্ডলের ভাষায় (প্রাকৃত) কথা বলছিলাম, উপাসক তার সামান্যই বুঝতে পারছিল। বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও তাকে বোঝাল এই মুহূর্তে ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। উত্তরে উপাসক বলল, এরা যদি তরবারির এককোপে শেষ করে দিত তাহলেও না হয় ধৈর্য ধরা যেত, কিন্তু এরা অত্যন্ত ক্রূরভাবে মানুষকে হত্যা করে। শরীরে বর্শা বিদ্ধ করে খোঁচাবে, তারপর একটি একটি করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটবে, আগুনে দগ্ধ করবে। বুদ্ধিল

বলল, তা সত্ত্বেও এদের সামনে কাপুরুষতার পরিচয় রাখলে এরা আরও বেশি যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করবে। আমাদের সকলের মধ্যে বুদ্ধিল ছিল সবচেয়ে শান্ত। যেন কিছুই হয়নি, বা হবেও না। বুদ্ধিলের মতো অত মানসিক ধৈর্য আমার ছিল না, তবে জীবনে বেশ কয়েকবার এক চুলের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি এবং সেই কারণেই বোধ হয় মৃত্যুভয় সেরকমভাবে আমাকে ভীত করেনি। আমি গুহার দ্বারপ্রান্তে বসা ব্যাধটিকে দেখছিলাম। সেও সতর্ক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে লক্ষ্য রাখছিল। আমার কেন যেন মনে হলো লোকটি আমাদের কথাবার্তা কিছু কিছু বুঝতে পারছে। গুহার বাইরে থেকে শোরগোল কানে আসছিল, বেলা আরও খানিকটা বাড়ার পর দেখলাম, গুহামুখের কাছে দাঁড়িয়ে স্ত্রীলোক ও বাচ্চারা আমাদের লক্ষ্য করছে। বাচ্চাদের হাতে মাংস লেগে থাকা হাড়, মাঝে মাঝে সেগুলিকে চুষছিল। তাদের কাছে আমরা ছিলাম তামাসার বস্তু। আবার এই নগ্ন মূর্তির দল আমাদের নগরে কিংবা গ্রামে গিয়ে হাজির হলে আমরাও এদের তামাসার দৃষ্টিতেই দেখতাম। আরও কিছু সময় পার হওয়ার পর গুহা আর দরজার বাইরের অল্প খালি জায়গাতে বয়োবৃদ্ধদের একটা মণ্ডলী এসে বসল। তাদের মধ্যে বেশ জোরদার আলোচনা চলছিল যার কিছুই আমাদের বোধগম্য হচ্ছিলনা। এক বৃদ্ধ, যার মাথার কালো চুলে জট ধরেছে চোখ লাল এবং শরীরে জরার কুঞ্চন, সে মাঝে মধ্যে চিৎকার করে উঠছিল। ভয়ংকর তার চেহারা। লোকটি তারপর গুহার অভ্যন্তরে এসে আমাদের সকলকে রক্তচক্ষুতে দেখল, তারপর গা হাত পা টিপেও দেখল। উপাসক বেহুঁশ হয়েছিল, তার ভয়ে ভীতমুখ দেখে, তার পিঠে সে জোরে একটি পদাঘাত করে কি যেন বলল। লোকটি গুহার বাইরে যেতেই জমায়েতও ভেঙে গেলো। অনেক সময় কেটে গেছে আমরা ক্ষুধার্ত ছিলাম। কিন্তু মৃত্যুর সামনে ক্ষুধা মাথা উঁচু করতে পারেনি। ক্ষুধার চেয়েও বেশি পেয়েছিল পিপাসা। ভাবলাম প্রহরীদের জলের জন্য ইশারা করব কিনা, কিন্তু কি আশ্চর্য, কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন একটা খোলের মধ্যে করে আমাদের জন্য জল নিয়ে এল, আমরা তৃপ্তির সঙ্গে তা পান করলাম। ওরা আমাদের মধ্য থেকে উপাসককে ধরে নিয়ে গেলো। তিনি প্রাণপণে বাধা দিলেন কিন্তু কোনো লাভ হলোনা। উপরন্তু কিছু অতিরিক্ত মারধর তাঁর ওপরে বর্ষিত হলো। বুদ্ধিল বলল, প্রথম বলি। ওদের দেবতার সামনে বলি দেবে। ব্যাধেরা বন্য হলেও আমাদের হলুদ পোশাক আর উপাসকের সাদা পোশাক, তার মাথায় চুল, গোঁফ, আর আমাদের মুণ্ডিত মস্তক, এসমস্ত পার্থক্য লক্ষ্য করেছিল। এদের মধ্যে হয়তো কেউ আছে যে নগরে দাসত্ব করতে করতে কোনোমতে পালিয়ে আসতে পেরেছে এবং সেই হয়তো এ সমস্ত পার্থক্যের কথা স্বগোত্রীয়দের জানিয়েছে। সিংহলী ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ, এই বিপদের মধ্যেও তিনি বেশ স্থির ছিলেন। তিনি বললেন ব্যাধদের ধরার ব্যাপারে আমাদের দাস ব্যবসায়ীরা কোনো কিছু বিচার না করে বাচ্চা, বুড়ো, মেয়ে সকলকে ধরে এবং কাবেরী পত্তনে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। সিংহলে এদের বাচ্চারাই শুধু বিক্রি হয়। বাচ্চাদের রাখার একটাই কারণ, এদের প্রতিরোধের ক্ষমতা খুব কম থাকে এবং এদের অতীত জীবনকে খুব তাড়াতাড়ি ভুলিয়ে দেওয়া যায়। আমি ভাবছিলাম যদি দাসত্ব মুক্ত কোনো ব্যাধকে পাওয়া যেত তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা যেত।

উপাসকের পর তারা সিংহলী তরুণ দুই ভিক্ষুকে একসঙ্গে নিয়ে গেলো। এখন রইলাম আমরা তিনজন। বয়োবৃদ্ধ স্থবিরকে আমরা কোনো বুদ্ধ সূত্রের পারায়ণ (পাঠ) করার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি উচ্চ কণ্ঠে ধম্মপদের কিছু গাথা গাইলেন তারপর মহাপরিনির্বাণের জন্য ভগবান তথাগতর রাজগৃহ থেকে পাটলিপুত্র এবং বৈশালী থেকে কুশীনারা পর্যন্ত যাত্রা এবং তাঁর অন্তিম সংস্কার পর্যন্ত বর্ণিত সূত্রের পারায়ণ করলেন। তাঁর পারায়ণ আমাদের এতটাই সান্ত্বনা দিচ্ছিল যে মাঝে মধ্যে ভয় হচ্ছিল যে পারায়ণ যেন অর্ধসমাপ্ত থেকে না যায়। পারায়ণ শেষ হতেই আমার অবশিষ্ট দুই সঙ্গীকেও তারা নিয়ে গেলো। আমি তখন প্রচণ্ড মনস্তাপের মধ্যে বসে শুধু একথাই ভাবছিলাম যে আমাকেও কেন ওরা বুদ্ধিলের সঙ্গে নিয়ে গেলো না। আমরা এই ক'বছরে নিজেদের মধ্যে এত একাত্ম হয়ে পড়েছিলাম যে জ্ঞান বৈরাগ্যের কথা বললেও নিজেদের মধ্যে বিচ্ছেদের কথা ভাবতেই পারতাম না।

গুহার মধ্যে আমি একা বসে রইলাম। কল্পনায় দেখছিলাম যে ব্যাধেরা আমাকেও তাদের বধ্য ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। সারাদিন ওরকম অবস্থাতেই কাটল। সংকটের সময় সাধারণত দীর্ঘ হয়। আমার তখন একটাই প্রার্থনা তাড়াতাড়ি তারা আমাকেও শেষ করে দিক। সত্যিই যদি তেমন হতো তাহলে এই কাহিনি কে লিখত? গুহাদ্বারে এখন একজন মাত্র প্রহরী প্রহরায় ছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে সে আমাকে গুহার বাইরে নিয়ে এল। বাইরে একপাল স্ত্রী, পুরুষ, বাচ্চার দল আমাকে ঘিরে ধরল। আমি যেন ওদের কাছে অপরিচিত কোনো জন্তু। বোধহয় এর আগে আমার গায়ের রঙের কোনো মানুষ তারা দেখেনি। বাচ্চারা তাদের আঙুলে থুতু লাগিয়ে আমার গা ঘষে ঘষে দেখছিল যে আমার গায়ে কোনো রঙ মাখানো আছে কিনা। আমার চোখের রঙ নীল, এবং মস্তক মুণ্ডনের পর সাতদিন কেটে যাওয়ার ফলে মাথার সদ্য গজানো সোনালি চুল। আকৃতিতেও আমি অনেক দীর্ঘকায়। ব্যাধেরা আমাকে নিয়ে বেশ খানিক হাস্য পরিহাসে কাটাল। আমাকে ওরা শারীরিকভাবে কোনো কষ্ট দেয়নি। অন্ধকার হওয়ার পর ওরা খানিকটা পোড়া মাংস এবং মশকে করে জল এনে আমার কাছে এনে রাখল। আমার হৃদয় যেন ছুরিকা বিদ্ধ হলো। তবে কি এরা আমাকে হত্যা করতে চায়না। বুদ্ধিলের মতো সুহৃদকে হারিয়ে বেঁচে থাকতে হবে? সারাদিন অভুক্ত থাকার জন্য ক্ষুধার্ত অবশ্যই ছিলাম, কিন্তু সূর্যাস্তর পর আহার গ্রহণ করে ভিক্ষু নিয়ম লঙ্ঘন করতে সেই অবস্থাতেও প্রস্তুত ছিলাম না। পিপাসা মেটাবার সময় প্রয়োজনের চেয়েও কিছু বেশি জল পান করে নিলাম। রাত্রির অন্ধকার চারদিকে ঘনীভূত ছিল। আমার মনের মধ্যে এখন এক নিঃসীম শূন্যতা, কোনো আশাও নেই হতাশাও নেই। রাত্রি প্রহর খানেক অতিক্রান্ত হয়েছে প্রায়, এমন সময় সিংহলী ভাষায় কেউ যেন আমাকে সম্বোধন করল, যেভাবে দাসেরা সিংহলী মালিকদের করে থাকে। ভন্তে (প্রভু)! শব্দটি শুনে বুঝে উঠতেই পারিনি যে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে। আমি তখন জাগরণ আর নিদ্রার মাঝখানে অবস্থান করছিলাম। ডাক শুনে মনে হলো আমি কি স্বপ্ন দেখছি। বার কয়েক ডেকেও আমার সাড়া না পেয়ে কেউ আমার হাত ধরে সজোরে নাড়া দিলো। আমি উঠে বসলাম। আগন্তুককে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, যদিও আমরা উভয়েই ক্ষীণ চাঁদের

আলোর বৃত্তের মধ্যেই ছিলাম। খানিক পর আমি বুঝলাম আগন্তুক সিংহলী নয়, ব্যাধ। সিংহলী ভাষা আমার খুব একটা জানা ছিল না তবু তার প্রথম কথাটা বুঝতে অসুবিধা হলো না– তোমাকে হত্যা করা হবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম–আমার সঙ্গীদের কি হয়েছে?

তাদের অনেক আগেই মেরে, মৃতদেহ দূরে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

–আমাকে কেন জীবিত রাখছ, আমাকেও মেরে ফেল। আমার বাঁচার একটুও ইচ্ছে নেই।

–না, তুমি আমাদের শত্রু নও। তুমি এদেশের মানুষই নও। আমরা কোনো নিরাপরাধকে হত্যা করি না।

–তাহলে আমাকে নিয়ে তোমরা কি করবে?

– তোমাকে আগামী কাল সকালে সবচেয়ে কাছাকাছি গ্রামের কাছে রেখে আসব। তুমি ফিরে গিয়ে আমাদের শত্রুদের বোলো, যে আমরা ওদের মতো নীচ নই। তোমরা আমাদের নিরাপরাধদের জবরদস্তি ধরে নিয়ে সারা জীবন তাকে পশুর মতো জীবন কাটাতে বাধ্য করো। আমরা যদি প্রতিশোধ নিইও, তাকে তিলে তিলে কষ্ট দিইনা, একবারে মেরে ফেলি।

লোকটির সঙ্গে আরও খানিকক্ষণ কথা বলার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার হাবভাব দেখে মনে হলো যে আলাপচারিতায় আগ্রহী নয়। সে আমাকে খাদ্যের কথা জিজ্ঞেস করায় বললাম, কাল সকালেই দিও।

আমার ভাগ্য মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছে, আমি বেঁচে আছি। বেঁচে থাকাটা অবশ্য এই মুহূর্তে আমার কাছে আনন্দের ছিলনা, বিশেষ করে মনের মধ্যে বুদ্ধিলের ছবি যখন বার বার উদয় হলো। জানিনা কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমের মধ্যে বুদ্ধিল স্বপ্ন হয়ে দেখা দিচ্ছিল। সে যেন আমার সঙ্গে বসে দিঙনাগের প্রমাণসমুচ্চয় ব্যাখ্যা করছে। বুদ্ধিল যেন বলছিল, এখান থেকে বেরিয়ে দক্ষিণাপথ হয়ে আমরা উজ্জয়িনী যাব। উজ্জয়িনী বুদ্ধিলের জন্মভূমি।

রাত্রি কখন প্রভাত হলো জানতেও পারিনি। গতরাত্রির লোকটি আমার মাথায় নাড়া দিয়ে আমার সম্বিৎ ফেরাল। আমি উঠে বসলাম। পোড়া মাংসের একটি খণ্ড, খানিকটা শুকনো ফল এবং এক মশক জল এনে আমার কাছে রাখল। লোকটি বলল, খেয়ে নাও, পথে ক্ষিদে পাবে। আমি তাকে নদীতীরে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করলাম। সে মাংস আর মশক হাতে তুলে নিয়ে আমায় বলল–চলো। নদীতীরে প্রথমে আমি হাতমুখ ধুলাম তারপর পোড়ামাংসের খানিকটা খেয়ে জলপান করলাম। লোকটির কথায় বুঝলাম তারা আমাকে সেই মুহূর্তেই মুক্ত করে দিতে পারে কিন্তু এই জঙ্গলের পথে যদি পথ হারিয়ে ফেলি, কিংবা অন্য কোনো গোষ্ঠীর হাতে পড়ে যাই, সেজন্য তারা আমাকে সতর্ক প্রহরায় লোকালয়ের কাছে পৌঁছে দেবে।

তিনজন লোক রইল আমার সঙ্গে, যাদের মধ্যে একজন সেই ভূতপূর্ব দাস। পথ চলতে চলতে সে তার কাহিনি শোনাল।

ছোটো অবস্থাতেই আমাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। অনুরাধাপুরের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে ওরা আমাকে বিক্রি করে দেয়। ছেলেবেলার প্রায় সব কথাই আমার মনে আছে। আমি সেই ব্রাহ্মণ পরিবারের একমাত্র দাস ছিলাম। তাদের কোনো সন্তানাদি ছিলনা। যদিও অন্য দাস বালকদের মতো আমাকেও ঘরের সমস্ত কাজই করতে হতো, কিন্তু মালিকের ব্যবহার মন্দ ছিলনা, তারা কখনও আমার ওপরে কোনো শারীরিক অত্যাচার করেনি তবে সামান্য ভুলচুকের জন্যও ধমক খেতে হয়েছে। বলা যায় যে আমি একজন মুক্ত ভৃত্যের মতো ছিলাম। যদিও আমি আস্তে আস্তে নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু তা কখনোই আমাকে আমার অতীত ভুলিয়ে দিতে পারেনি। বিশেষ করে যখন আমার মায়ের কথা মনে পড়ত তখনই অনুরাধাপুরের জীবনের চেয়ে অরণ্যের জীবনকে অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হতো। আমার মনিব গৃহিণীর মৃত্যু হলে মনিব বাড়ি ঘরের সব দায়িত্ব একরকম আমার ওপরেই ছেড়ে রেখেছিলেন। আমার পালাবার পক্ষে কোনো বাধা ছিলনা, তবু অনেকদিন নিজেকে সংযত রেখেছিলাম। একবার আমার মনিব আমাকে এক সপ্তাহের জন্য সমুদ্র তীরবর্তী কোনো এক পত্তনে পাঠান। আমি সেদিকে না গিয়ে অরণ্যের পথ ধরি। আমাদের গোষ্ঠীর কোনো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ এলাকা নেই। তাছাড়া আমি তখনও বস্ত্রধারী। বস্ত্রপরিহিত অবস্থায় নিজের দলের হাতে ধরা পড়লেও বিপদ। আবার বস্ত্রধারীদের এলাকার মধ্যে বস্ত্র ত্যাগ করলেও বিপদ। তারা আমাকে পলাতক দাস হিসেবে শাস্তি দেবে। সেই অবস্থায় আমি রাত্রি হওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করি। এবং অন্ধকার হতেই মনিবের বাড়ি থেকে আনা খড়গটি বাদ দিয়ে আর সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করি। তারপর শংকিত চিত্তে অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করি। আমি তখনও জানিনা এত বছর পর আমার স্বজাতীয়রা আমাকে কিভাবে গ্রহণ করবে। তাছাড়া আমাদের মধ্যেও কখনো কখনো গোষ্ঠী সংঘর্ষ হয়। অনেক লোক মারাও পড়ে। তবে আমার ভাগ্য ভালো ছিল, আমি আমার নিজস্ব গোষ্ঠীর সন্ধানই পেয়েছিলাম।

লোকটির বয়স এখন পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। যখন সে মনিবের বাড়ি থেকে পালিয়েছিল তখন মনে হয় তার বয়স কুড়ি বছরের কাছাকাছি ছিল। তার মানে, সে প্রায় পনেরো বছর পর সিংহলী ভাষায় কথা বলল। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে তার অনেক ভুলে যাওয়া শব্দ হয়তো মনে পড়ে গেছে। তার প্রভু নিষ্ঠুর ছিলনা, অতএব ব্যক্তিগতভাবে তার নিষ্ঠুরতা সহ্য করার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বোধ হয় সেই কারণেই সে আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছিল এবং তার জীবন কাহিনি শুনিয়েছিল। মধ্যাহ্ন পার হওয়ার পর এক জায়গায় তারা দাঁড়িয়ে গেলো এবং বলল,–আমরা এর থেকে আর আগে যাব না। এরপরই বস্ত্রধারীদের এলাকা।

স্বদেশাভিমুখে (৫৪৭–৫৪৮খ্রিঃ)

বুদ্ধিলের মর্মান্তিক মৃত্যু আমাকে মানসিকভাবে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলেছিল। নিজের সঙ্গীদের হারিয়ে এভাবে বেঁচে ফিরতে আমার খুব লজ্জা বোধ হচ্ছিল। আমার কাহিনি শুনে সকলেই সমবেদনা জানাল। তারপর নিস্তরঙ্গ সরোবরে একটা ঢিল ফেললে যেমন

সাময়িক আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং অল্পক্ষণেই আগের মতো স্থির হয়ে যায়, তেমনই হলো। বর্ষা এসে যাওয়ার ফলে বাধ্য হয়ে বর্ষাবাস সিংহলেই করতে হলো। কিন্তু মন এক মুহূর্তের জন্যও ওখানে থাকতে চায়নি। বিক্ষিপ্ত হৃদয়ে কোনো ক্রমে তিন মাস কাটালাম। আমি যে ওই অবস্থার পর উন্মাদ হয়ে যাইনি সেটাই ছিল ভাগ্য। সিংহলে বাকি দিনগুলো কিভাবে কাটিয়েছিলাম তা আজ আর ভালোভাবে স্মরণ হয়না। তখন শুধু একটা কথাই ভাবতাম কবে আসবে মহাপ্রবারণার দিন (আশ্বিন পূর্ণিমা), যেদিন আমি এই দেশ ছাড়তে পারব।

অনুরাধাপুরে নানা দেশের বণিকেরা যাতায়াত করে। সিংহলে প্রচুর রত্ন পাওয়া যায়। বুদ্ধিলের সঙ্গে যে পরিব্রাজনার সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম, তাকে আমি একা সম্পূর্ণ করব এরকম একটা প্রতিজ্ঞা মনে মনে গ্রহণও করেছিলাম। বুদ্ধিল থাকলে হয়তো দক্ষিণাপথ হয়ে ফিরতাম, কিন্তু এখন চেষ্টা যত তাড়াতাড়ি উজ্জয়িনী হয়ে জন্মভূমি উদ্যানে ফেরা যায়। একলাট (গুজরাট) দেশীয় জনৈক বণিক বিহারে অথবা ভিক্ষার সময় আমাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি আমাকে একদিন ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। আমি শ্রেষ্ঠীকে সবিনয়ে জানাই যে নিমন্ত্রণের অন্ন আমি গ্রহণ করি না কেবল ভিক্ষান্নেই আমার তৃপ্তি। উত্তরে শ্রেষ্ঠী বললেন, বেশ, একদিন ভিক্ষাটন উপলক্ষে আমার গৃহের দ্বার পবিত্র করুন। শ্রেষ্ঠী আধা বয়সী। তাঁকে এবং তাঁর পত্নীকে দেখে আমার কৌশাম্বীর কথা মনে পড়ল। শ্রেষ্ঠী বললেন, আমি লাটদেশের ভরুকচ্ছের লোক। স্ত্রীর অসুস্থতার জন্য এতদিন ফেরা হয়নি, এবার ফিরব মনস্থ করেছি। শ্রেষ্ঠীপত্নীও কৌশাম্বীর শ্রেষ্ঠীপত্নীর মতোই ধর্মপরায়ণা। সিংহলে তিনি তীর্থদর্শনের ইচ্ছাতেই এসেছিলেন। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে না পারার জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। তিনি প্রায়শই বিহারে আসতেন এবং আমার কাছ থেকে তথাগতভাষিত সূত্রের কথকতা শুনতেন। শ্রেষ্ঠী দম্পতি আমাকে তাঁদের সঙ্গে দেশে ফেরার অনুরোধ করলেন। উজ্জয়িনী যারার সহজতম পথ। শ্রেষ্ঠীর আমন্ত্রণ আমাকে অনেকদিক থেকে চিন্তামুক্ত করেছিল।

মহাপ্রবারণার পাঁচদিন পর আমরা অনুরাধাপুর ছাড়ি। শ্রেষ্ঠী বেশ বড় সার্থবাহ ছিলেন। ভরুকচ্ছ থেকে তাঁর বাণিজ্যপোত একদিকে সিংহল, যবদ্বীপ অন্যদিকে পশ্চিমের অনেক দেশে যাতায়াত করত। উজ্জয়িনীতেও তাঁর একটি ব্যবসাকেন্দ্র ছিল। কোনো রাজার চেয়ে তিনি কম বৈভবশালী ছিলেন না। অনুরাধাপুরের পশ্চিমে তাঁর বিশাল পোত নোঙর করা ছিল। সেখানে আমাদের কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হলো কারণ নৌকায় তখনও পণ্য বোঝাই হচ্ছিল। নৌকা ছাড়ল আর আমার মনে হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে এখানে রেখে গেলাম।

সমুদ্রপথে দুমাস কাটল। শ্রেষ্ঠী সরাসরি ভরুকচ্ছে আসেননি। সমুদ্রতটে আরও নানা জায়গাতে তাঁর পত্তন ছিল। সেখানে থামতে থামতে এসেছেন। ভরুকচ্ছে যখন পৌঁছালাম তখন শীতের মাঝামাঝি। সিংহলে শীত নেই বললেই চলে কিন্তু ভরুকচ্ছে নেমে গায়ে কম্বল চাপাতে হলো। শ্রেষ্ঠী তাঁর পূর্বপুরুষদের নির্মিত বিহারে আমার থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। উজ্জয়িনীগামী সার্থবাহ আসা মাত্র আমাকে তাদের সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন।

ক্ষত্রপদের রাজধানী হওয়ার সুবাদে উজ্জয়িনী একসময় বৈভবের শিখরদেশে অবস্থান করত। এখন সেরকম না হলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। যদি আমার প্রিয় বন্ধু বুদ্ধিলের সঙ্গে এখানে আসতে পারতাম তাহলে মহাকবি কালিদাসের প্রিয় এই নগরী আরও কত বেশি ভালো লাগত? বুদ্ধিলের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করার অর্থই ছিল পুরানো ক্ষতে নতুন করে রক্তক্ষরণ করা। আবার দেখা না করাটাও অত্যন্ত অমানবিক কাজ হবে, বিশেষত যখন শুনেছিলাম, বুদ্ধিলের মা জীবিত আছেন। প্রথমে দেখা হলো বুদ্ধিলের অনুজের সঙ্গে। দুজনে মিলিতভাবে অনেক অশ্রু ঝরালাম। বুদ্ধিলের মা যখন জানলেন তাঁর সৌভাগ্যশালী পুত্রের আমি মিত্র, তখন তাঁর আনন্দ দেখে কে। কিন্তু যে মুহূর্তে বুদ্ধিলের মৃত্যু সংবাদ শুনলেন, এক আর্ত চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর মৃত্যু শোক সামলে আবার উঠলেন এবং আমাকে বললেন, আমি তোমাকেই এখন আমার বুদ্ধিল মনে করি। ছেলেবেলা থেকেই জ্ঞানী ও সাহসী করে তৈরি করার চেষ্টা করেছি। সে সর্বদাই দেশ ভ্রমণ করতে চেয়েছে, এবং আমি জানি এরকম ভ্রমণে বিপদের আশংকা থেকেই যায়, কিন্তু আমি তাকে বাধা দিইনি।

বৃদ্ধা শোকসাগরে নিমজ্জিত ছিলেন। পুত্রের বিয়োগ ব্যথা চিরকাল তাঁর হৃদয়ে থেকে যাবে। কিন্তু যতদিন আমি উজ্জয়িনীতে ছিলাম, ততদিন আমার সামনে শোকার্তভাব প্রকাশ করেননি এবং আমার প্রতি পুত্র তুল্য ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেননি।

আবার আমি মধ্যমণ্ডলে এসেছি। এখানকার মানুষের চালচলন, বেশভূষা, আহার্য পানীয় ইত্যাদির সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়ে গিয়েছিল যে মনে হলো অত্যন্ত পরিচিত স্থানে এসেছি। মৌখারীদের সীমানায় প্রবেশের পর দেখলাম সর্বত্র সুব্যবস্থা। গ্রামে গ্রামসভা ছিল যারা রাস্তা ঘাট ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখত। আমার একা পথ চলতেও কোনো অসুবিধা হয়নি। বসন্তের প্রারম্ভে রোদের তেমন তেজ ছিলনা, তারপর থেকে কেবল সকাল সন্ধ্যাতেই বেরোনো হতো। বিদিশার চৈত্যপুরি নির্মিত হয়েছে বুদ্ধের অন্যতম দুই প্রধান শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদগল্যায়ণের ধাতুর ওপরে। সকল বুদ্ধ ভক্তরাই এই চৈত্য অবশ্যই দর্শন করেন। আমি পাঁচ রাত্রি সেখানে কাটিয়েছিলাম। চৈত্যের তোরণ আর মূর্তি আমাকে আরেকবার বুদ্ধিলের কথা মনে পড়াল। কৌশাম্বীর শ্রেষ্ঠীর সামনে সে মাটি দিয়ে এ ধরনের মূর্তি করে দেখিয়েছিল। একদেশেই যুগে যুগে সংস্কৃতির কতইনা বিবর্তন ঘটে। এক সময় এদেশে বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হতো না। বৃক্ষ এবং চৈত্য তাঁর প্রতীক হয়ে বিরাজ করত।

বিদিশা থেকে গোপগিরি (গোয়ালিয়র) হয়ে মথুরার পথে রওনা হলাম। বর্ষার ছ'মাস আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। গ্রীষ্ম এখানে খুবই তীব্র। এক সময় শকদের রাজধানী ছিল মথুরা। আমার কেন জানিনা মনে হতো শক এবং উদ্যানের খস্ মূলত একই জাতি। সেজন্য শকদের স্মৃতি বিজড়িত কোনো জায়গা কিংবা তাদের বংশজদের দেখলে মনে মনে আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করতাম। তথাগতর প্রতি শকদের কি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ছিল তার অজস্র প্রমাণ ছড়িয়ে আছে গান্ধার আর মধ্যমণ্ডলের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। শকরা এখন আর শাসন ক্ষমতায় নেই কিন্তু মথুরাতে তাদের নির্মিত

বিহারগুলি শুধু বর্তমান আছে তাই নয় অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশি সুব্যবস্থাপনা সেখানে আছে। শক সম্রাট কণিষ্ক, কদফিস ইত্যাদিদের পূর্ণাবয়ব মূর্তি দেখে আমার মনে হলো, শকরা উত্তরের সেই দেশ থেকেই এসেছিল যেখান থেকে এসেছে হেফতালেরা (শ্বেতহুণ)। তুখার (তুষার) দেশ তথা আরও উত্তর থেকে আসা মানুষদের আমি উদ্যানে এবং কপিশাতে দেখেছি। তাদের বেশভূষার সঙ্গে এখানকার মূর্তিগুলির বেশভূষার আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে। বিশেষত হাঁটু পর্যন্ত জুতো, যা উত্তরের লোকেরা এখনো পরে থাকে।

উরমুণ্ড গোবর্ধন পর্বতের মহিমা এবং তার পবিত্রতার কথা আমি সেই কবে থেকে শুনে এসেছি। যে সর্বাস্তবাদী নিকায় আমাকে ভিক্ষু করেছে একসময় এই ক্ষুদ্র পাহাড় তাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। আর্য সর্বাস্তিবাদের প্রাচীন নিকায়ের পুরাতন বিহার এখনো আছে। এখানেই আমি বর্ষাবাস করলাম। এই বিহারে স্থবির রাণবাসের শনের চীবর রক্ষিত আছে। স্থবির রাণবাস এতদূর আকিঞ্চন বৃত্তিতে থাকতেন যে কার্পাসের বদলে শণের বস্ত্র ব্যবহার করতেন। উরমুণ্ড পাহাড়ের চারদিকে এখন ঘন জঙ্গল। রাজা-রাজরার যুদ্ধে জনপদ ধ্বংস হয়েছে কিন্তু নতুন করে জনপদ গড়ে ওঠেনি তাই অরণ্য সেই শূন্য স্থান পূরণ করেছে। বর্ষাবাসের সময়ে বিহারে এক চীনা ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয় হয়। এবং তারপর থেকে আমার চীন যাওয়ার ইচ্ছা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। এখানে একটা প্রথা দেখলাম যে, নগরীর উপকণ্ঠ থেকে কোনো চণ্ডাল জাতির লোক যখন নগরীতে প্রবেশ করে তার হাতে একটি লোহার দণ্ড থাকে। দণ্ডটিকে সে সজোরে মাটিতে আঘাত করে যাতে শব্দ হয় এবং সেই শব্দ শুনে পথচারীরা সাবধান হয়ে সরে যায়। কারণ চণ্ডালের ছায়ার স্পর্শও অপবিত্র। চীনা ভিক্ষু এরকম প্রথার তীব্র নিন্দা করলেন। তাঁর কথা শুনে আমি যেন দীর্ঘনিদ্রা থেকে জেগে উঠলাম। মানুষকে এতখানি হীন ভাবা কি ঠিক? শাক্য মুনির কাছে ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সবাই সমান ছিল। চীনা ভিক্ষু অবশ্য এটা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে বিহারের মধ্যে এ ধরনের কোনো ভেদাভেদ নেই। বিহারের মধ্যে জাতি, বর্ণ কোনো কিছুরই ভেদ ছিল না। কিন্তু তার আয়তন কতটুকু? ভিক্ষু সংঘতো সিন্ধুতে বিন্দুবৎ। চীন দেশে ধনী দরিদ্রের মধ্যে ভেদাভেদ আছে কিন্তু ছায়ার স্পর্শেও অপবিত্র হয় এরকম কোনো মনুষ্যত্বের অপমানকর বিধি সে দেশে নেই।

মহাপ্রবারণার পর উরমুণ্ড থেকে ভিক্ষুদের সঙ্গে মথুরাতে গিয়ে অশোকস্তম্ভের আরাধনা করি। আবার আমার যাত্রা শুরু হয়। এবার যাত্রা উত্তরাভিমুখে, যমুনাকে ডানদিকে রেখে। সেই সবুজ শ্যামল মাটি শস্য সমৃদ্ধ গ্রাম। মথুরা থেকে দুদিন চলার পর আমি যৌধেয় ভূমিতে (হরিয়ানা) পৌছালাম। যৌধেয়দের অমর বীরত্বের কথা আমি আগেই অনেক শুনেছিলাম। এখন থেকে দেড়শো কি দুশো বছর আগে এখানে শক্তিশালী এক গণরাজ্য ছিল, যাকে সমুদ্রগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র চন্দ্রগুপ্ত অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ধ্বংস করেন। এ যেন সেই লিচ্ছবি বৈশালীর ইতিহাস। গুপ্ত সম্রাটেরা যৌধেয় গণরাজ্য ধ্বংস করার সময় একবারও কি মনে ভেবেছিলেন যে একদিন তাঁদেরও উচ্ছেদ হতে হবে। পথে যমুনা তীরে ইন্দ্রপ্রস্থ গ্রাম। কোনো এক সময় এই গ্রামটি

পাণ্ডব যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ছিল। তখন হয়তো ইন্দ্রপ্রস্থ জমজমাট নগর ছিল কিন্তু এখন এটি একটি বড়সড় গ্রাম মাত্র। বর্তমানে স্থানীশ্বর (থানেশ্বর) যৌধেয় ভূমির সবচেয়ে বড় নগর। এখানকার রাজা নিজেকে মৌখরীদের সমতুল মনে করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রভাব ক্ষীণ হওয়ার পর এই রাজ্যের উত্থান হয়েছে। শ্বেত হুণদের প্রতিরোধের জন্য গুপ্তরাজারা যে সমস্ত সেনাপতি কিংবা সামন্তদের এখানে পাঠিয়েছিল পরবর্তীকালে তারাই নিজেদের স্বাধীন রাজা হিসেবে ঘোষণা করে। যৌধেয়দের গণরাজ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও জাতি হিসেবে তাদের বীরত্বের খ্যাতি আজও অটুট। শ্বেতহুণ এবং গুপ্তদের মাঝখানে বীর জাতি যৌধেয়রা থাকার ফলে শ্বেতহুণদের পিছু হঠতেই হয়েছে। স্থানীশ্বরের কাছেই কুরুদের সেই ধর্মক্ষেত্র যেখানে কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধ হয়েছিল, এবং যা নিয়ে মহাকাব্য লেখা হয়েছে।

স্থানীশ্বরের সরস্বতী উপত্যকাই মধ্যমণ্ডলের সীমানা। আসার সময় যে পথে এসেছিলাম, ফেরার সময় সে পথ না ধরে অন্য পথে চলে চন্দ্রভাগার তীরে শাকলাতে (শিয়ালকোট) এসে পৌছালাম। শাকলা থেকে আবার পুরানো পথ। শীতের মধ্যসময় ছিল। কতকাল পর আমি আবার হিমবান পাহাড়ের দেশে ঢুকলাম। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশ্মীরে বেশ কিছুদিন কাটাতে হলো কারণ উদ্যানে যাবার গিরিপথগুলি ছিল বরফে আচ্ছাদিত।

ইতিমধ্যে কাশ্মীরে পটপরিবর্তন ঘটে গেছে। মিহিরকুলের মৃত্যুর পর হুণ শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে আর বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্ত প্রভুরা নিজেদের পরমভট্টরাজাধিরাজ ঘোষণা করে বসেছিল। জীবনের অন্তিমলগ্নে মিহিরকুল বৌদ্ধদের প্রতি যথেষ্ট অনুকূল মনোভাব দেখিয়েছিল। বিভিন্ন বিহার, সংঘারামে যথেষ্ট দান দক্ষিণাও দিয়েছে। তাই যাবার সময় বিহারগুলির যে দূরবস্থা দেখেছিলাম এখনও সেরকম দেখলাম না।

বসন্ত ঋতুতে সমগ্র কাশ্মীর যেন এক ফুলের বাগানে রূপান্তরিত হয়। প্রকৃতি যেন তার মধুর হাসিতে সমগ্র উপত্যকা ভরিয়ে তুলেছে। যদিও গিরিপথগুলি এখনও হিমাচ্ছাদিত ছিল, কিন্তু আমিতো এই হিমভূমিরই সন্তান, তাই এই অবস্থার মধ্যেও গিরিসংকট অতিক্রম করার কৌশল জানা ছিল, বিশেষত পথ যখন আমার জন্মভূমির দিকে গেছে। মিহিরকুলের মৃত্যুর পর উপত্যকার আইন শৃঙ্খলার অবস্থা ভালো নয়, অতএব পথে সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল। প্রথমে চেষ্টা করলাম সিন্ধুনদগামী কোনো সার্থবাহর যদি দেখা পাওয়া যায়। এক কাশ্মীরী শ্রেষ্ঠীর চেষ্টায় কম্বোজগামী এক সার্থর দেখা পাওয়া গেলো। কম্বোজ দেশ আমার জন্মভূমির কাছেই। সার্থবাহর মেজাজটি রুক্ষ ছিল তবে তাতে আমার অসুবিধার কোনো কারণ ঘটেনি। বণিক শ্বেতহুণদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সেইজন্য তার জন্মভূমি কপিশা ছেড়ে কাশ্মীরে এসে বাণিজ্য আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে বৃহৎ শ্রেষ্ঠীদের একজন হয়ে ওঠে। সীমান্ত অঞ্চলে নিষ্ঠুর যাযাবর জাতির অত্যাচার লেগেই থাকত। আমার সার্থবাহ যথেষ্ট সাহসী ছিল। কাশ্মীর থেকে বের হয়ে একটি বড় গিরিসংকট অতিক্রম করে আমরা সিন্ধুনদের তীরে গিয়ে পৌছাই। সিন্ধুনদীর কারণেই পশ্চিমের পারসিক, যবন (গ্রিক) প্রভৃতিরা এই দেশকে হিন্দু বলত আবার তা থেকে চীনারা ইন্দু বলতে আরম্ভ করে।

দেশে ফেরা (৫৪৮ খ্রিঃ)

সাতবছরের তীর্থযাত্রা সমাপ্ত করে আমার উনতিরিশ বছর বয়সে আবার জন্মভূমি উদ্যানে ফিরলাম। সুবাস্তু নদীর পার হয়ে আমাদের শীতকালীন আবাসে আমার পরিবার ও অন্যান্য স্বজনদের সঙ্গে দেখা হলো। শীতেও সুভূমি বিহারের পথ উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু পরিবারের সকলের অনুরোধ গ্রামেই রইলাম। সাতবছর পর ফিরে আমার জন্মভূমির সব কিছুই যেন নতুন বলে মনে হচ্ছিল। কতকাল পর উদ্যানের ভাষায় কথা বললাম। এই সাতবছরে কত নতুন মানুষ পৃথিবীতে এসেছে আবার কতলোক বিদায় নিয়েছে। যদিও একবছর আগে মিহিরকুলের মৃত্যু হয়েছে তথাপি আমাদের দেশে যেথাদের শাসনই বলবৎ ছিল। মিহিরকুলের নাম উঠলেই ভদ্রার স্মৃতি মনে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে এখন আমার কাছে এক অপরিচিতা নারীর মতো। দেশে ফিরে কি করব সে সম্বন্ধে কোনো পরিকল্পনা করা ছিলনা তবে সুভূমি বিহারে যাব, এটা ঠিক করা ছিল। আমার স্বগোত্রীয়দের ইচ্ছে যে তাদের সঙ্গে বর্ষায় এ বছর পয়ারে কাটাই। ছেলেবেলার প্রিয় সেই পয়ার আজও আমাকে সেদিনের মতোই টানে। শীত একটু একটু করে শেষ হয়ে এল। ওপর থেকে যারা নেমে এসেছিল তারা ফেরার উদ্যোগ করতে লাগল। কাছাকাছি কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে বর্ষার মাসখানেক আগে সুভূমি বিহারে গেলাম। পয়ারে যাবার কোনো নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি বন্ধুদের এই কারণেই দিইনি, যদি এতদিন পর বিহারের আচার্য উপাধ্যায় আমাকে পেয়ে আবার ছাড়তে না চান। মহাস্থবির গুণবর্ধন এবং আমার কাকা ভিক্ষু জিনবর্মার দেহান্ত হয়েছিল। বিহারের নতুন প্রধান শীলস্কন্ধ আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন এবং আমাকে যথেষ্ট স্নেহের চোখে দেখতেন। তিনি আমাকে পয়ারে যাবার অনুমতি দিলেন। বর্ষোপনায়িকার (আষাঢ় পূর্ণিমা) আগেই পয়ারে পৌছে গেলাম। আমার সঙ্গে বেশ কয়েকজন ভিক্ষুও ছিলেন।

গৃহস্থরা ভিক্ষুদের দেবতার মতো সম্মান করে। অনেকে আবার শুধুমাত্র আশীর্বাদে সন্তুষ্ট থাকেনা, তারা আশা করে যে ভিক্ষু দৈবশক্তি বলে তাদের দুঃখকষ্ট দূর করে দেবে। সর্বত্রই এরকম ভাবনাচিন্তা। দুঃখকষ্ট কোথায় নেই? আমি দিঙনাগের প্রমাণশাস্ত্র পড়েছি। জ্যোতিষ, মন্ত্র, তন্ত্র এ সম্বন্ধে আমার ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। তারপর নাগার্জুনের মাধ্যমিক দর্শন পড়ার পর আরও অনেক প্রচলিত বিশ্বাস শিথিল হয়ে গেছে। দেবদেবী ইত্যাদি ধারণাকে এখন ভ্রান্ত বলে জানি। তবে কোনো কিছুকেই চিরন্তন সত্য কিংবা অসত্য ঘোষণা করার মতো জ্ঞান এখনো অর্জন করিনি। ভূতপ্রেত তাড়ানো, কিংবা দেবতার ভর উপলক্ষে আমারও ডাক পড়ত। এসব কিছুই যে মিথ্যা একথা আমার স্বগোত্রীয়দের কাছে বলা আর অরণ্যে রোদন করা ছিল একই ব্যাপার। তাই ওপথে না হেঁটে দু-চারটি মন্ত্র জপ করে দায় সারতাম, ভালো হলে ভালো, আর না হলেও আমাকে কেউ দায়ী করবেনা।

আমাদের ডেরার কাছে এক যেথাকুমারী নাকি অনেকদিন ধরে এক প্রেতের দ্বারা পীড়িত ছিল। আমি আমার মতো করে কিছু মন্ত্রতন্ত্র জপ করেছিলাম আর তাতেই নাকি আশাতীত ফল লাভ হয়েছিল। অতএব বেশ কয়েকবার যেতে হলো মেয়েটির কাছে। মেয়েটির বয়স আঠারো উনিশ হবে। পীড়ার কারণে শরীর একটু কৃশ অন্যথায় তাকে

সুন্দরী বলা চলে। তাকে দেখে অনেকদিন পর আমার ভদ্রার কথা মনে হলো সেই সঙ্গে মনে হলো আমি আবার কোনো ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি। কারণ ভিক্ষু থেকে সংসারী হয়ে যাওয়ার উদাহরণ আমাদের উদ্যানে প্রচুর আছে। আমার জপতপের কারণে নাকি, প্রকৃতির নিয়মে মেয়েটির ভালোমতোই উন্নতি ঘটছিল। তার চেহারার প্রফুল্লতা ফিরে এসেছিল। একদিন সে বলেই ফেলল, আপনার উপদেশ যত সুন্দর, হৃদয় তত সুন্দর নয়। কি বলব একথার উত্তরে? বোধিসত্ত্বের পরোপকারী জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেছি যে অন্যের দুঃখ দূর করার জন্য আমরা যারা বুদ্ধের অনুগামী তাদের অদেয় কিছুই নেই। মনে হলো তরুণী সেই কথার জের টেনে কোনো ইঙ্গিত করতে চাইছে নাতো? বাধ্য হয়ে আমি মেয়েটির ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে বলেছিলাম, আমার দেখে খুবই ভালো লাগছে যে তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছ।

মেয়েটি বিন্দুমাত্র সংকোচ না করে বলল, সুস্থ হয়ে উঠেছি বলবেন না, আপনি আসার ফলে সাময়িকভাবে আমার অসুস্থতা কেটেছে, আপনি আসা বন্ধ করলে আবার সেটা বাড়তে পারে।

– না আর বাড়বে না, আমি ভূত তাড়াবার মন্ত্র জপ করেছি। অতএব আর তাদের আসার সম্ভাবনা নেই।

– আপনি বড়োই সরল। শুনেছি আপনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। আমার ভূত এভাবে যাবার নয়। আমাকে নিরুত্তর দেখে সে আবার বলল, ভদ্রার সঙ্গেই কি আপনার হৃদয়ের প্রেমের সব উৎস শুকিয়ে গেছে? হতে পারে আমি ভদ্রার সমতুল্য সুন্দরী নই কিন্তু প্রেমের বিষয়ে তার চেয়ে কম নই।

–তুমি না হক ভদ্রাকে টেনে আনছ।

–ভদ্রা যদি সত্যি আপনাকে ভালোবেসে থাকত তাহলে এত সহজে সে অন্যের হয়ে যেত না। আমি আপনার এবং ভদ্রার কথা অনেক শুনেছি এবং বহুকাল থেকেই আপনার প্রতি অনুরক্ত। আমার পরিবারের লোকেরাও এর বিরুদ্ধে নন।

–কিন্তু সুমুখী, তুমি ঠিকই বলেছ, আমার হৃদয়ে প্রেমের স্রোত সত্যি সত্যি শুকিয়ে গেছে। মিথ্যে প্রেম আমাদের দুজনেরই অমঙ্গল করবে।

–আমি কিন্তু কোনো ভাবাবেগের বশে হঠাৎ করে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিইনি, আমি প্রয়োজন হলে প্রতীক্ষা করব, কিন্তু এটুকু অন্তত বলুন যে আমাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করছেন না, এখন না হলে পরে উত্তর দেবেন, তাতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব।

সেই মুহূর্তে সবকিছু অস্বীকার করতে পারলে ভালো হতো কিন্তু পারিনি, একরকম পালিয়েই এসেছিলাম। মেয়েটির সুস্থ হয়ে যাওয়া দেখে আমার মন্ত্রবলের প্রতি লোকের বিশ্বাস আরও বেড়ে গেলো। মহাপ্রবারণার একমাস বাকি ছিল। বোধিসত্ত্ব যে কোনো উপায়ে অন্যের উপকার করার কথা বলেছেন। তা বলে একজনের হৃদয় দূর করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা কি ঠিক? বোধিসত্ত্ব ব্রত পালনের কোনো সীমারেখা অবশ্যই টানতে হবে। আমি অন্ধ্র দেশে দেখেছি মহাযান পন্থার নামে এবং বোধিসত্ত্বের পরোপকার ব্রতের আড়ালে কিছু লোক উন্মুক্ত কামনার তৃপ্তি ঘটায়। বোধিসত্ত্ব যে কোনো অবস্থাতেই শীল সদাচার ত্যাগ করার কথা বলেননি। আমিও সেই শীল সদাচার

আশ্রয় করেই বর্ষাবাসের বাকি কটা দিন কাটিয়ে কার্তিক মাসের মধ্যকালে সুভূমি বিহারে ফিরে এলাম।

আমার প্রথম বিহার জীবনেই সেখানকার আবাসিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আর এখন তা অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিল। বেশি সংখ্যক ছাত্ররা আমার অধ্যাপনা পছন্দ করত। বিহারে অন্যদের তুলনায় আমাকে তরুণই বলা চলত, কিন্তু আমার বয়োজ্যেষ্ঠরাও আমাকে ভীষণভাবে মান্য করতেন। সকলের ধারণা হয়েছিল যে আমি অজাতশত্রু। শুধু বিহারেই নয় সুভূমির আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ আমার কাছে নানা বিষয়ে ছুটে আসত। চিকিৎসাশাস্ত্রে আমার সামান্য জ্ঞান ছিল, তার সাহায্যেই আমি গ্রামবাসীদের রোগ ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করতাম।

আমার সুভূমি ছিল সর্বাস্তিবাদী হীনযানী বিহার। সর্বাস্তিবাদী বিনয়ের সমস্ত নিয়ম যথাযথ পালনের দিকে এখানে সর্বদা দৃষ্টি রাখা হতো। তা সত্ত্বেও মহাযান পন্থার অনুপ্রবেশ ঘটে চলেছিল। আমিও ভেবেছিলাম মহাযান পন্থার এক সুদৃঢ় দুর্গ হয়ে উঠবে সুভূমি বিহার। কিন্তু পয়ারের যেথা কুমারীর ঘটনার পর থেকে মহাযান প্রচারে আমি উৎসাহ হারিয়ে ফেলি, অতঃপর মহাযানকে নিজের ব্যক্তি জীবনে পালনের চেষ্টা করতে থাকি। মধ্যে মধ্যে দেশ ভ্রমণ বা চারিকার ইচ্ছা মনের মধ্যে উদ্বেল হয়ে উঠতনা এমন নয়, কিন্তু আমার চতুর্দিকে মাকড়শার জালের মতো এক ভালোবাসার জাল রচিত হয়েছিল। যেথা কুমারীকে আমার অন্তিম নির্ণয় শোনাতে হয়নি কারণ সে আমার অদ্ভূত জীবনচর্যার সংবাদ পেয়েছিল। বিহারের ভিক্ষু, উপাসক ইত্যাদির সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেভাবে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিল তাতে আমার মনে হতো আমার পায়ে শৃঙ্খল পরানো হয়েছে এবং সেই শৃঙ্খল দিনদিন মজবুত হচ্ছে। আর বোধ হয় স্বচ্ছন্দ বিহার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবেনা।

একদিন বিকেলে অধ্যাপনা শেষ করে মূল বিহারের দক্ষিণে আঙুর বাগানে বেড়াচ্ছি, এমন সময় বিহারের বাইরে অরণ্যের মধ্যে ধোঁয়া উঠতে দেখলাম। বুঝলাম দাবানল শুরু হয়েছে, তখনও তেমন কোনো বিপদের আশংকা করিনি অতএব ধোঁয়ার কথা ভুলে রাত্রিতে যথারীতি শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। রাত্রিতে সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন দক্ষিণদিকের বাতাসের প্রভাবে দাবানল দ্রুত বিহারের দিকে আসতে থাকে। রাত্রির শেষ প্রহরের দিকে মানুষের কোলাহলে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। শয়ন কক্ষের বাইরে এসে মনে হলো যেন দিন হয়ে গেছে। এখন গ্রীষ্মের প্রথম মাস। চারদিকে জঙ্গল পুড়ছে দাউদাউ করে। রসসিক্ত, আর্দ্র গাছগুলি যে এভাবে জ্বলতে পারে তা আমার ধারণায় ছিল না। অগ্নিদগ্ধ গাছের ডালপালা অগ্নিবাণের মতোই দূরে দূরে ছিটকে পড়ছিল এবং সেগুলো থেকে আবার নতুন করে আগুন জ্বলছিল। দেখতে দেখতে আঙুর বাগান ভস্মীভূত হয়ে গেলো। আগুন এত কাছে এসে পড়েছিল যে কোনো মুহূর্তে তা বিহারকে গ্রাস করবে। সুরক্ষিত জায়গা তখন একমাত্র নদীতীরবর্তী গ্রাম। কাছের গ্রামের লোকজন এসে পড়ে বিহারের জিনিসপত্র বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি এবং আরেকজন ভিক্ষু যথাসম্ভব মূল্যবান পুঁথিপত্র নিয়ে নদীতীরের গ্রামে গিয়ে পৌছালাম। বুঝতেই পারছিলাম যে বিহারকে রক্ষা করা যাবেনা, কারণ একটি

প্রাচীন স্তূপ বাদ দিলে, বিহারের অধিকাংশই ছিল কাঠের তৈরি, আর তার মধ্যে ছিল শতাব্দীর শুষ্কতা। দেখতে দেখতে বহুলোকের সামনে সুভূমি বিহার ছাই হয়ে গেলো।

হিমালয় অতিক্রম (৫৫০ খ্রিঃ)

সুভূমি বিহার ভস্মীভূত হয়ে গেলেও ভিক্ষু জীবন চলতেই থাকে। প্রথম দিকে আশপাশের গ্রাম থেকে সাহায্য এসেছিল, পরে দেশের নানা জায়গা থেকে লোকে সাহায্য নিয়ে এসেছিল। বিহারের পুড়ে যাওয়া অংশ আবার গড়ে তোলার প্রশ্নে আমরা সকলেই চেয়েছিলাম যে সুভূমি বিহার আবার তার আগের চেহারায় ফিরে আসুক, শুধু আমরা কেন, সকলেই চেয়েছিল। উদ্যান তখন কাশ্মীর, গান্ধার কিংবা কপিশার মতো কোনো বড়ো রাজ্যের অধীন ছিলনা। মিহিরকুল তার জীবদ্দশাতেই সাম্রাজ্যের পূর্বদিকের বেশ খানিকটা অংশ হারিয়েছিল। কম্বোজ এবং বক্ষু নদীর তীরবর্তী অঞ্চল তার পিতা তোরমানের মৃত্যুর পরই হাতছাড়া হয়েছিল। সর্বত্রই যেথা সর্দাররা নিজেদের ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। কোথাও আবার উদ্যানের মতো প্রাচীন রাজবংশীয়রা নিজেদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেছিল। যদি সম্রাট তোরমান জীবিত থাকতেন তাহলে বিহারের পুনর্নির্মাণ নিয়ে কোনো ভাবনা হতো না কিন্তু সেরকম কোনো সম্ভাবনা সেই মুহূর্তে ছিলনা। বিহারকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আমাদের প্রত্যেককে অনেক পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সুভূমি বিহারে কম্বোজ, তুষার, সৌগ্দ, কাংস্য এবং কুচা দেশের কিছু ভিক্ষু ছিলেন। চারিকাপ্রেমী হওয়ার জন্য আমি তাঁদের দেশ সম্বন্ধে নানা তথ্য জানতে চাইতাম। তার ফলেই জানতে পেরেছিলাম যে ওই সব দেশে সোনা এবং অন্যান্য রত্নের খনি আছে। আমার মনে হলো ওই সমস্ত দেশে গিয়ে যদি সোনা এবং রত্ন সংগ্রহ করা যায় তাহলে সে সবের মূল্যে বিহারকে আবার পুরানো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। আমার প্রস্তাব বিহারের উচ্চাধীকারিদেরও মনঃপূত হলো এবং একদিন আমি ও আর চারজন ভিক্ষু সেই উদ্দেশ্যে সুভূমি বিহারের ধ্বংসাবশেষ ত্যাগ করলাম।

সুভূমি বিহার থেকে বেরিয়ে খানিকটা উৎরাইয়ের পথ চলে আবার উত্তরের দিকে চড়াইয়ের পথে চলা শুরু হলো। উদ্যানেরই এক নগর চিত্রালায় (চিতরাল) পৌঁছাবার আগে আমরা কুণার নদী অতিক্রম করলাম। সেখান থেকে পথ ছিল পশ্চিমোত্তর দিশাতে। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে পায়ে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল শ্বাসকষ্ট। পাহাড়ের গায়ে দেবদারু গাছের আধিক্য অন্য গাছকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। তবে যত ওপরের দিকে উঠছিলাম গাছের পরিমাণও সেই মতো কমে আসছিল। আমার সঙ্গী কম্বোজ ভিক্ষুর নাম ছিল সুমন। সে বলল, এরপর থেকে আর আমরা অরণ্যের দেখা পাব না, এবং এখানকার গিরিসংকটগুলিতে দস্যু তস্করের ভয় আছে। আমাদের ভিক্ষুদের দস্যু তস্কর নিয়ে সেরকম একটা ভয় নেই, কারণ আমাদের কাছে লুণ্ঠন করার মতো কিছু থাকে না। সেই জন্যই ওই দুর্গমপথে লোকে সার্থ (ক্যারাভান) তৈরি করে যাতায়াত করে। আমাদের সার্থতে পঞ্চাশ জনের বেশি মানুষ

এবং উপযুক্ত পরিমাণ মাল বহন করার ঘোড়া ও গাধা ছিল। কাশ্মীর ও গান্ধারের কিছু বণিকও আমাদের উদ্যানের বণিকদের সার্থের সঙ্গে চলছিল। সন্ধ্যার সামান্য কিছু আগে আমরা অরণ্যের শেষ সীমানা ছেড়ে এলাম। সেখানে স্থানীয় উদ্যানীদের গুটি কয়েক কুটির ছিল। কুটিরের বাসিন্দারা বণিক সার্থকে ইন্ধন এবং তাদের ভারবাহী পশুদের চারা জুগিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। রাত্রিটা সেখানেই থাকলাম। সূর্যোদয়ের আগেই যাত্রা শুরু করে গিরিপথ অতিক্রম করাই নিয়ম। রাত্রিতে সামান্য তুষারপাত হয়েছিল, রাত্রির শেষ প্রহরে আবার আমাদের যাত্রারম্ভ হলো। সমস্ত অঞ্চল নিঝুম, নিস্তব্ধ, এবং চন্দ্রালোকিত ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল সেখানে যে দুধের বন্যা বয়ে গেছে। আমরা উৎসাহের সঙ্গে চড়াই ভাঙা শুরু করলাম। আমরা ইচ্ছে করলে সার্থকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু করিনি। তাপমাত্রা ছিল সুভূমি বিহারের শীতের মতো। ঠাণ্ডা আটকানোর জন্য মোটা পশমের কান ঢাকা টুপি, পশমের সংঘাটি আর চীবরে সারা শরীর ঢেকে নিয়েছিলাম। উপরন্তু গায়ে একটা তুলাজিনের অংশকুট (জ্যাকেট) চাপিয়ে নিয়েছিলাম। পায়ে চামড়ায় আচ্ছাদিত জুতো, এরকম পোশাকে ভয়ঙ্কর শীতেরও সম্মুখীন হওয়া যায়। আমরা চলার গতি মন্থর করে দিয়ে ভাবছিলাম, কিছুক্ষণের মধ্যেই সার্থরা আমাদের ধরে ফেলবে কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ ওইভাবে চলার পরেই সার্থদলের পশুদের গলায় ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পেলামনা। চারদিকে তুষারের আবরণ স্ফীত হয়ে চলেছিল। কম্বোজ ভিক্ষু মাত্র তিন বছর আগেই এই পথ ব্যবহার করেছে অতএব আমরা পাঁচজন কাছাকাছি হয়ে পথ চলছিলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি আমরা চারজন রয়েছি, আরেকজন নেই। কোথায় গেলো? সুমন বলল এই গিরিপথে দৈত্যদের প্রভাব খুব বেশি, তারা সুযোগ পেলেই একটি বা দুটি যাত্রীকে দলছাড়া পথভ্রষ্ট করে মেরে ফেলে। আমরা আবার নিচে নামতে আরম্ভ করলাম। কিছুটা নামতেই ডান দিক থেকে আমাদের সঙ্গীর গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম। যদি পৌছতে আর সামান্য সময় দেরি হতো তাহলেই আমরা আমাদের পঞ্চম সঙ্গীকে হারাতাম। দৈত্য আমাদের সঙ্গীকে ধরে রেখেছিল। আমি একটি মন্ত্র জপ করে তার কাছে গেলাম। মন্ত্রবলেই হোক অথবা আমাদের দেখেই হোক তার হুঁশ ফিরে এল। ভিক্ষু একটা শিলাখণ্ড দেখিয়ে বলল, এখানেই সে অন্য চারজনকে যেতে দেখে তাদের অনুসরণ করে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা অন্তর্হিত হয়। তখন সে ভয়ে চিৎকার করে ওঠে এবং সেটা আমরা শুনতে পাই। পঞ্চম সঙ্গীকে জীবিতাবস্থায় উদ্ধার করতে পেরে আমাদের খুবই আনন্দ হয়েছিল কিন্তু বিপদ তখনও কাটেনি। সুমন সঠিকভাবে বলতে পারছিলনা যে আমরা ঠিক পথে চলেছি না পথভ্রষ্ট হয়েছি। কিন্তু বসে থেকে কোনো লাভ নেই। কোনো কারণে সার্থরা যদি অন্য পথে গিরিসংকটের ওপারে পৌছে যায় তাহলে তারা আমাদের জন্য অপেক্ষাও করবেনা, কোনো খবরও নেবেনা। কারণ চার-পাঁচ জনের জন্য গোটা দলটাকে বিপদগ্রস্ত করা চলেনা। আমরা আবার চড়াইয়ের পথ ধরলাম। প্রকৃত পথ থেকে সত্যিই আমরা খানিকটা সরে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঊষার আলো তুষারের ওপর পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে চারদিক সোনার রঙে সেজে উঠল। আমরা শুনেছিলাম যে উত্তরের সুমেরু পর্বতের শিখর সোনায়

মোড়া। কিন্তু এখন চারদিকে অজস্র স্বর্ণশিখর দেখতে পাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম সত্যি যদি ওগুলি সোনা হতো এবং আমরা প্রাচীন মুনি ঋষিদের মতো আকাশ মার্গে যাতায়াত করতে পারতাম, তাহলে সুভূমি বিহারের জন্য এদিক-ওদিকে স্বর্ণ সন্ধানে যেতে হতোনা।

সুমন পথপ্রদর্শক কিন্তু এবার কোন পথে নিচে নামবে ঠিক করতে পারছিল না। রোদ চড়ে গেলে এসব জায়গায় ধ্বস নামে। এরকম অবস্থায় নিজেদের স্রেফ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিচে নামতে আরম্ভ করলাম। ঘন্টাখানেক চলার পর মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া গেলো। মনে মনে ভাবলাম, বোধহয় সার্থের দেখা পেয়েছি এবার নিশ্চিন্তে চলা যাবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সুদীর্ঘ তরবারি আর তীরধনুকে সজ্জিত দশ বারোজন লোক আমাদের ঘিরে ফেলল। সুমন এদের ভাষা জানত, সে খানিকটা মুখে আর খানিকটা ইঙ্গিতে যা বলল, তার অর্থ এরা কম্বোজ দস্যু। দস্যুরা খুবই হতাশ হলো যখন তারা জানল যে আমরা পাঁচজন পথ হারিয়ে ফেলা বৌদ্ধ ভিক্ষু। সুমন তাদের বলল, যে সামান্য কিছু বস্ত্র আর ভিক্ষা পাত্র ছাড়া সঙ্গে আমাদের আর কিছু নেই, দস্যুরা ভিক্ষুদের দৈবশক্তি এবং মন্ত্রবলে বিশ্বাস করত সেই কারণেই আমাদের সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার তারা করেনি উপরন্তু তাদের সর্দার তার অসুস্থ স্ত্রীর জন্য মন্ত্রপুত কোনো বস্ত্র প্রার্থনা করল। ভূর্জপত্র, মসি ও লেখনী সঙ্গেই ছিল, তাতে মন্ত্র লিখে দিলাম। দস্যুরাই জানাল যে আমরা প্রকৃত পথ থেকে অনেকটা পশ্চিমে সরে এসেছি। এখান থেকে উদ্যান সীমান্তের তপ্তকুণ্ডের গিরিপথটি বেশি দূরে নয়। সর্দার আমাদের সঙ্গে দুজন পথ প্রদর্শক দিলো, এবং ঘন্টা দুই চলার পর সঠিক রাস্তা পেয়ে গেলাম। সেখানে তুষারের ওপরে মানুষ ও ভারবাহী পশুদের পায়ের টাটকা ছাপ স্পষ্ট দেখা গেলো। দুই পথপ্রদর্শক দস্যুকে আমরা আশীর্বাদ করলাম, তারা ফিরে গেলো। দু-দুটো বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া মন স্বভাবতই প্রফুল্ল ছিল। এখন দিনের আলোতে তুষারাচ্ছাদিত পথে চলতে পেরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। দিনের প্রথম প্রহর পার করে আমরা একটা খোলা জায়গাতে পৌছালাম। সুমন আগেই বলেছিল যে এই সমস্ত অঞ্চলে গাছপালার দেখা মিলবেনা। বর্ষায় ওখানে যে দীর্ঘ ঘাস জন্মেছিল এখন শরতে সে সব শুকিয়ে গিয়েছে। একটু এগোতেই সার্থর দেখা পেয়ে গেলাম। হিমালয়ের এই অঞ্চলে যেহেতু গাছপালা নেই সেজন্য কাঠ পাওয়া যায় না। ভারবাহী পশুর শুকনো মলই একমাত্র জ্বালানী। সার্থদের পশুদের খাদ্যও এখানে দুর্লভ হওয়ায় তাদেরও অনেক দূরে চরাতে নিয়ে যেতে হয়। আমরা নিরাপদে পৌছানতে সকলেই খুব আনন্দিত হলো। সকলেই আমাদের জন্য চিন্তিত ছিল, আর উদ্যানের বণিকতো আমাদের আত্মীয় তুল্য ছিল। সবারই ধারণা হয়েছিল যে আমরা দৈত্যের হাতে মারা পড়েছি। এবং সমস্ত ঘটনা শোনার পর তাদের ধারণা হলো যে আমি দৈত্য তাড়াবার দিব্যশক্তির অধিকারী। তার ওপরে যখন তারা শুনল যে কম্বোজ দস্যুদেরও আমরা বশে এনেছি তখনতো আমাদের তারা প্রায় দেবতার পর্যায়ে তুলে দিলো। দস্যুরা সার্থর সন্ধান পেয়েছিল, কিন্তু সংখ্যায় তারা কম থাকায় কিছু করেনি, কিন্তু দলের সকলের ধারণা হলো যে আমরা ছিলাম বলেই হঁয়নি।

কাশ্মিরী বণিকেরা সেদিন গন্ধশালী চাল দিয়ে ভাত রান্না করল, এবং যেরকম আন্ত রিকতার সঙ্গে আমাদের পাঁচজন ভিক্ষুকে ভোজন করাল তাতে মনেই হচ্ছিল না যে আমরা হিমালয়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় কোনো গিরিপথের মুখে বসে আছি। যেহেতু মানুষ এবং ভারবাহী পশু উভয়েরই এই এতটা পথ হাঁটতে প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে সেজন্য সেদিনের পুরো দিন এবং রাত্রিটাও ওখানেই কাটানো হলো। পরদিন আবার যাত্রা। যাত্রাপথ একই রকম। বৃক্ষ শূন্য ন্যাড়া পাহাড়, বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছোট ছোট ঘাস। এখানকার পাহাড়ে পাথরের পরিমাণ কম, মাটির পরিমাণ বেশি। আমরা নদীপ্রবাহ ধরে নিচে নামছিলাম, একঘেয়ে রাস্তা। চলতে চলতে এক সময় পথ এক ত্রিবেণী সঙ্গমে এসে মিলল। ডানদিকের পথ গেছে কাংস্য দেশের দিকে এবং বাঁ-দিকেরটি কম্বোজ নগরীর (বদরুণা) দিকে। আমাদের উভয় দেশেই যেতে হবে, কিন্তু বর্তমানে যেহেতু আমাদের সঙ্গী বণিক দল কম্বোজ দেশেই যাচ্ছিল অতএব আমরা বাঁদিকের রাস্তাটিই ধরলাম। এখানেও নদীর গতিপথ ধরে চলা। জলের রঙ নীল বলে নদীর নাম নীলাপ (কোকুচা)। নদীর তীরে দূরে ছড়ানো ছিটানো কয়েকটি গ্রামও ছিল। তবে অমন হতশ্রী, দরিদ্র গ্রাম ইতিপূর্বে আমি আর দেখিনি। কপিশাতেও সবুজের অভাব দেখেছি কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানকার বাড়িঘর শুধু মাটি আর বেঢপ আকারের পাথরের স্তূপ হতোনা। কিন্তু এখানে বাড়ি আর পাহাড়ের তফাত করা যাচ্ছিল না কারণ সমস্ত বাড়িঘরই বিষমাকৃতির পাথরে আঁকাবাঁকা করে গড়া। কম্বোজীদের গায়ের রঙ আমাদের, উদ্যানীদের চেয়েও ফর্সা। অনটনের কারণে তারা শারীরিকভাবে কিঞ্চিৎ দুর্বল কিন্তু সৌন্দর্যে অনুপম। কম্বোজের ঘোড়া পৃথিবী বিখ্যাত। এরকম একটা দরিদ্র পার্বত্য অঞ্চলে অত সুন্দর ঘোড়া কিভাবে জন্মায় কে জানে? সুমন বলল, এখানকার ঘোড়া বিশ্ববিজয়ী অলিকসুন্দরের (আলেকজান্ডার) বাহিনীর অশ্বদের প্রজাতি। পথে কম্বোজীয় ছাড়া যেথা গ্রামও পেয়েছিলাম, আমাদের উদ্যানেও যেথা আছে কিন্তু এখানকার যেথারা একেবারেই বর্বর, যাযাবর, নিষ্ঠুর এক গোষ্ঠী। কম্বোজীরা ভীরু নয়, কিন্তু যেথাদের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারেনি। এরা ঘোড়ার লোমের তৈরি তাঁবুতে বসবাস করে এবং তাঁবুরই একটি গ্রাম তারা তৈরি করে। কম্বোজ নগরীর কাছে যাওয়ার পর আরও অনেক যেথা (হেপাতাল) দেখলাম, বেশ কয়েক জনের সঙ্গে পরিচয়ও হলো, কিন্তু নাগরিক কিংবা গ্রামীণ কোনো জীবনের ছাপই এদের মধ্যে পড়েনি। যেথা সর্দারের আস্তানায় আমরা চীন দেশের রেশম, মহার্ঘ ভারতীয় বস্ত্র সম্ভার ছাড়াও অনেক বিলাসদ্রব্য দেখেছিলাম। তারা বহুমূল্য পোশাক পরলেও উপত্যকায় পশুপালনকেই আদর্শ জীবন বলে মনে করত। বিদ্যা কিংবা কলাশাস্ত্র ইত্যাদির প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিলনা।

কম্বোজপুরীতে আমাদের আসার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল যে আমরা সুভূমি বিহারের পুনর্নির্মাণের জন্য পদ্মরাগ (চুণি) এবং অন্যান্য রত্ন সংগ্রহ করব। কম্বোজের পুরাতন রাজা জীবিত ছিলেন এবং তিনি তথাগতর অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেন। কিন্তু রাজশক্তি ছিল যেথাদের হাতে। রাজা ছিলেন নামেমাত্র। যেথা সেনাপতিই ছিলেন প্রকৃত পক্ষে দেশের সর্বেসর্বা। নামেমাত্র রাজার বৈভবও বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিলনা,

অধিকাংশই যেথারা লুটপাট করে নিয়েছিল। বিহারগুলিও তাদের বর্বরতার হাত থেকে রেহাই পায়নি। মূল্যবান যা কিছু ছিল তাতো নিয়েইছে এমনকি কাঁসা পিতলের মূর্তিগুলিকেও গলিয়ে ধাতু হিসেবে বিক্রি করেছে। বহুদিন পর্যন্ত তারা বিহার ও দেবালয়গুলিকে সৈন্য-ছাউনি হিসেবে ব্যবহার করেছে। কম্বোজের ধর্মপরায়ণ নাগরিকেরা অনেক ঘোড়া এবং ধনরত্ন উপহার দিয়ে ওগুলিকে খালি করায়। এখনও ওখানকার ভগ্নপ্রায় রাজবিহারে জনা ত্রিশেক ভিক্ষু বাস করেন। যেথারা (হেপতাল, শ্বেতহুণ) কম্বোজীয়দের তৃণের চেয়ে বেশি মূল্য দেয় না। এরা এত অধৈর্য যে শান্তিতে দেশ শাসন করলে আরও বেশি অর্থ সম্পদ পেতে পারে সে ধারণাও নেই। আমরা যখন সেখানে পৌছাই কম্বোজের কালরাত্রি তখনও চলছিল। কম্বোজে অনেক মূল্যবান ধাতু পাওয়া যেত। সেখানকার পদ্মরাগের খ্যাতি ছিল পৃথিবী জুড়ে। লোহা, সীসা, তামা, ফিটকিরি, গন্ধক প্রভৃতির অনেক খনি সে দেশে ছিল। শাসকেরা যখন লুঠপাট চালিয়েই ধনরত্ন সংগ্রহ করা শুরু করল তখন কে আর পরিশ্রম করে সম্পদ সৃষ্টি করতে যায়। রাজবিহারের ভিক্ষুরা আমাদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় পণ্ডিত ভেবে পারলে তাঁরা আমাকে মাথায় করে রাখেন। বিহারের অবস্থা খুবই খারাপ, কিন্তু তাঁরা এর উন্নতির কোনো চেষ্টাও করেন না, কারণ তাহলেই লুটেরাদের দৃষ্টি পড়বে এবং বিহার আবার লুণ্ঠিত হবে। আমাদের আসার খবর পেয়ে যেথা সামন্ত একদিন আমাদের ডাকলেন। আমি আজ পর্যন্ত যত দেশে ঘুরেছি, সেখানকার রাজা বা সামন্ত, বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হোক বা না হোক ভিক্ষুদের দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখায়। কিন্তু এই যেথা সর্দারের সে সমস্ত শালীনতা বিন্দুমাত্র ছিলনা। সে তার আসনে বসেই নিচের এক গালিচায় আমাদের বসতে বলল। আমরা এরকম পরিস্থিতির জন্য মানসিকভাবে তৈরি ছিলাম। বিহারের এক ভিক্ষু, যাঁর মন্ত্রবিদ্যার খ্যাতি যেথা সর্দার পর্যন্ত পৌছেছিল, তিনি আমার যথেষ্ট গুণকীর্তন করলেন। সুমনও আসার পথে দৈত্যের হাত থেকে কিভাবে এক ভিক্ষুকে রক্ষা করেছি সেই কাহিনি বর্ণনা করল। অসুস্থ বা দুঃখী মানুষ কোথায় নেই? যেথা সর্দার কোনো কারণে তাদের উচ্চতম সর্দারের কাছে কিছুটা অপমানিত হয়েছিল। অতএব তার গ্রহের শান্তির জন্য আমাকে কিছু মন্ত্রজপ, পূজাপাঠের ভড়ং করতে হলো। আমাদের সেদেশে আসার উদ্দেশ্য শুনে সর্দার আমাদের কিছু পদ্মরাগ কণা দিলো। কম্বোজের রাজাও সামান্য কিছু দিলেন। আমরা উদ্যানের সার্থবাহকে সে সমস্ত জিনিস সুভূমি বিহারে পৌছে দিতে বললাম। কম্বোজে থাকার আগ্রহ আমাদের ছিলনা। আমরা কাংস্য দেশে যাওয়ার চিন্তা করছিলাম। রাজবিহারের ভিক্ষুরা বললেন, শীত প্রায় এসে গেছে, এসময় কাংস্য দেশগামী সার্থ পাওয়া খুব মুস্কিল, অতএব আমরা যেন শীতটা কম্বোজেই কাটাই। কিন্তু কম্বোজে আর একদিনও থাকতে মন চাইছিলনা। উপরন্তু শুনলাম শীত পার করে বসন্তেও সার্থ পাওয়া যাবে কিনা বলা যায়না। অতএব তাদের চেষ্টাতেই কম্বোজ ছাড়ার উদ্যোগ নিলাম।

বালার–আমাদের এরপর পামির মালভূমির দিকে এগোবার কথা। লোকে বলে এই মালভূমির অর্ধেক আকাশে টাঙানো। নীলাপ (কোকুচা) নদী বক্ষু নদীতে পড়েছে।

বক্ষু, সিন্ধু, সীতা প্রভৃতি বিশাল বিশাল নদী এই ভূখণ্ডে প্রবাহিত হয়েছে। কম্বোজপুরী থেকে আমাদের যাত্রাপথ ছিল বক্ষু নদীর মুখ্য ধারার দিকে। পথে ছোট ছোট গিরিপথ পড়ছিল যেগুলির অবস্থান ছিল বক্ষুর শাখা নদীগুলির সীমানার মধ্যে। সিন্ধু এবং বক্ষুর মতো সীতাও এক মহানদী, যে প্রবাহিত হয়েছে কাংস্য দেশ আর কুশ্য দ্বীপের (কুচা) মধ্যে। আমাদের বক্ষু অঞ্চল থেকে সীতা অঞ্চলে পৌঁছাতে হবে। এই দুই মহানদীর মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ উপত্যকার নামই পামির। পামিরের পর্বতশ্রেণীকে চীনের লোক বলে পলাভু-গিরি (চুঙ-লিং)। পামির মালভূমিও হিমালয়ের মতোই বিস্তৃত। হিমালয় অতিক্রম করতে আমাদের খুবই কষ্ট হয়েছিল কিন্তু পামির পার হতে গিয়ে যে কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবেনা। আমরা বক্ষুতীরের বক্ষুগ্রামে (কিলাগঞ্জ) যাবার জন্য স্থানীয় একজনকে পথপ্রদর্শক হিসেবে পেয়েছিলাম। হেপতাল তথা যেথাদের হাতের বাইরে চলে যাবার বিষয়টিই ছিল প্রধান। আমরা বক্ষুর নিম্ন অববাহিকায় ছিলাম। এখানে বক্ষুর অনেক শাখানদী আছে এবং সেগুলির তীরে যারা বাস করে তারা তাদের শাখা নদীটিকেই মূল বক্ষু বলে দাবি করে। এ অঞ্চলে ছোট ছোট গ্রাম আছে এবং যে গ্রামে শখানেক ঘরবাড়ি আছে সেখানেই কেউ একজন নিজেকে রাজা বলে দাবি করে। এ জায়গাতে তেমন কিছু পাবার আশা নেই বলে হেপতালেরা এদিকে আসেনি। এখানে ফসল বলতে গমই প্রধান। তবে জোয়ারের ক্ষেতও কিছু ছিল। এখানকার জোয়ারের দানার আকার আমাদের দেশের জোয়ারের প্রায় দ্বিগুণ। তবে এখানে চাষবাস নাম মাত্র, পশুপালনই প্রধান জীবিকা। এক-একটি পরিবারে পাঁচ-ছশো ভেড়া থাকা খুব সাধারণ ব্যাপার।

শীতের মধ্যে ওই দুর্গম পথের যাত্রা অনুকূল হবে না বুঝে আমরা কাংস্য দেশে যাবার জন্য শীত শেষ হওয়ার প্রতীক্ষায় রইলাম। তখন কোনো সার্থ যদি পাওয়া যায়। এখান থেকে উত্তরের পথে কয়েকদিন চললে সুবর্ণ সরোবর (জরকুল) পড়ে। সরোবরের নাম সুবর্ণ কিন্তু জলের রঙ নীল। গ্রীষ্মে এখানে লক্ষ লক্ষ হাঁস ও অন্যান্য জলচর পাখি এসে বাসা বাঁধে। সরোবরের আয়তন দৈর্ঘে বারো এবং প্রস্থে সাত যোজন। এখানে একজন অর্হত (মুক্তপুরুষ) বাস করেন, শুনলাম। এরকম মানুষের কথা আমি আগেও শুনেছি কিন্তু দেখতে পাইনি। বক্ষু গ্রামেও একটি বিহার আছে। গ্রামে রাজা অন্যান্যদের মতোই চামড়ার পোশাক পড়ে এবং না বলে দিলে পাঁচজনের চেয়ে আলাদা করা যায় না। এখানকার মানুষ তথাগতকে শ্রদ্ধা করে এবং যার যেটুকু সাধ্য তাই দিয়ে ভিক্ষুদের সৎকার করে। বিহারের একজন ভিক্ষু স্বেচ্ছায় উৎসাহের সঙ্গে আমাদের পথপ্রদর্শক হতে এগিয়ে এল। খাদ্যদ্রব্য ও মাল পরিবহনের জন্য স্থানীয় রাজা আমাদের তিনটি গর্দভ ও চারজন লোক দিলেন। পথ দুর্গম ছিল কিন্তু যেভাবেই হোক আমরা সরোবরের তীরে পৌঁছে গেলাম। শীত আরম্ভ হয়ে যাওয়ার জন্য কোনো প্রাণী সেখানে ছিলনা। কিন্তু চারদিকের অবস্থা দেখে মনে হলো গ্রীষ্মে এখানে প্রচুর ঘাস জন্মায়। আমাদের পথ প্রদর্শক বলল, কোনো কঙ্কালসার শরীরের ঘোড়া যদি গ্রীষ্মে এখানে আসে তাহলে সে এত ঘাস খেতে পারবে যে চামড়া ফেটে মরে যেতেও পারে। এই সরোবরের জলের এমনই মহিমা যে মৃতপ্রায় ব্যক্তিও এখানে

এলে সুস্থ হয়ে উঠবে। আমার উদ্যানের পয়ার জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল, সেজন্যই পথপ্রদর্শকের কথাগুলিকে খুব একটা অতিশয়োক্তি মনে হলোনা। সরোবরের উপরিভাগ তখনও জমাট বাঁধেনি। আমরা যখন সরোবরের তীরে পৌছাই তখন দিনের শেষ। জোরদার বাতাস বইছিল। বাতাসের হিল্লোলে সরোবরের উত্থিত ঢেউ দেখে আমার সিংহল দ্বীপের সমুদ্রের কথা মনে পড়ছিল। হ্রদের জল ছিল স্বচ্ছ নীল, মরকতের মতো। গ্রীষ্মে এখানে পশুচারকদের ভীড় থাকে। এখনো চারদিকে সেসবের চিহ্ন বর্তমান ছিল, অতএব ইন্ধনের জন্য আমাদের ভাবতে হয়নি। আমরা সরোবর দর্শন করে এবং কোনো মুক্ত পুরুষকে দর্শন না করেই বক্ষুগ্রামে ফিরে এলাম। সমস্ত শীতটা সেখানেই কাটানোর সিদ্ধান্ত ছিল।

পামির উপত্যকার অধিবাসীদের সাদাসিধে সরল জীবন যাপন এবং সত্যনিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এরা কুশলী তীরন্দাজ এবং সেই কারণেই দক্ষ শিকারীও বটে। এখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলেই চামড়ার পোশাক পরে শুধু মেয়েরা অতিরিক্ত সুতীবস্ত্রের অন্তর্বাস পরে। অন্তর্বাসে কাপড়ের ব্যবহার থাকে অনেক বেশি। কখনো কখনো এক থান কাপড়ও লেগে যায়। কারণ এখানে মেয়েদের মধ্যে যার অন্তর্বাসে যত বেশি কাপড় ব্যবহৃত হয় সে তত বেশি সুন্দরী এবং বৈভবশালিনী বলে প্রমাণিত হয়। গাঁটরি গাঁটারি কাপড় ব্যয় করে তারা বিশাল নিতম্বিনী হয়ে ঘুরে বেড়ায় কারণ গুরু নিতম্বই এখানে সৌন্দর্যের প্রধান মাপকাঠি। আমাদের আহার্য ছিল, ছাতু, রুটি এবং মাংস। শরৎকালেই এখানে আগামী পাঁচ-ছয় মাসের জন্য প্রয়োজনীয় পশুমাংস জমিয়ে রাখে। মাঝে মধ্যে শিকারে বের হয় এবং সঞ্চিত মাংস খুব সাবধানে খরচ করে। শীতের কারণে মাংস নষ্ট হওয়ার ভয় নেই। মেষপালের শত্রু নেকড়ের উপদ্রব আছে এখানে এবং শিকার করতে এসে প্রায়শ তারাই শিকার হয়ে যায় এবং তাদের চামড়া পোশাক হিসেবে শোভা পায়।

কাংস্য দেশে (৫৫১ খ্রিঃ)

শীতে খুবই কষ্ট হয়েছিল। বক্ষুগ্রামের অধিবাসীরা ছিল দরিদ্র। কৃষিকাজের সুযোগ কম থাকার জন্য পশুপালন আর শিকারের ওপরেই তারা নির্ভরশীল। শীতে সামনে এগোবার কিংবা পিছনে যাওয়ার সমস্ত পথই বন্ধ। মানুষ স্বভাবগতভাবে যাযাবর কিন্তু বিশেষ একটা সীমা পর্যন্ত। আমি আর সুমন যে কোনো অবস্থাতেই এগিয়ে যাবার সংকল্পে দৃঢ় ছিলাম। কিন্তু আমার সঙ্গী তিন ভিক্ষুর মনোবল অত কঠিন ছিলনা। তার মধ্যে তারা আবার রক্ত-আমাশায় আক্রান্ত হলো। চিকিৎসা, সেবাযত্ন দুজনকে ফেরাতে পারলেও একজনকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। যদি সেবছর শীত অন্যান্য বারের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি বিদায় না নিত, তাহলে হয়তো বাকি দুজনকেও হারাতে হতো। প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া অনুসারে সেখানকার লোকের খাদ্যাভ্যাস পোশাক ইত্যাদি তৈরি হয়। পামির উপত্যকার ঠাণ্ডা আমাদের উদ্যানের চেয়েও কয়েকগুণ বেশি। আমি শীতে এখানকার ভিক্ষুদের সাধারণ কোমরবন্ধনীর পরিবর্তে রোমশ চামড়ার কোমরবন্ধনী ব্যবহার করতে দেখেছিলাম, তখনই মনে হয়েছিল এর নিশ্চয়ই কোনো

উপযোগিতা আছে। সুমনও আমাকে সমর্থন করায় আমরা দুজনেই ওরকম কোমরবন্ধনী ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছিলাম। কিন্তু আমার অন্য তিন ভিক্ষুবন্ধু প্রথমে ওরকম কোমরবন্ধনী ব্যবহারে রাজি হয়নি, যখন হলো, তখন মারাত্মক ঠাণ্ডায় তাদের অন্ত্র প্রায় বিকল হয়ে গিয়েছিল। আগামী যাত্রাপথ হবে আরও দুর্গম, এবং সে পথে যাত্রার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকলেও অসুস্থ দুই ভিক্ষু শারীরিকভাবে ছিলেন একেবারেই অক্ষম। অতএব তাদের এখান থেকে দেশে ফিরে যাওয়াই সাব্যস্ত হলো। বক্ষু উপত্যকায় বসন্তের রূপ অন্যরকম যা আগে কখনও দেখিনি। এখানে গাছপালার পরিমাণ সামান্য, বিস্তীর্ণ উপত্যকার তুষার গলে সরে গেলে সেখানে পশুচারণের উপযুক্ত ঘাস জন্মায় আর রঙবেরঙের নানা ধরনের ফুল ফোটে। কাংস্য দেশে যাবার জন্য আমরা কম্বোজ, তুষার, বাহল্লীক, কপিশার সার্থবাহদের অপেক্ষা করছিলাম। যে কোনো সার্থ হলেই হবে না। আমাদের সঙ্গে নিতে রাজি, এমন সার্থ চাই, কারণ অনেকের কাছেই আমরা হয়তো বোঝা হিসেবে গণ্য হব, আমরা তাদের কাজে লাগবনা, অথচ আমাদের আহার পানীয় তাদের যোগাতে হবে। এ যাবৎ কাল আমরা যে সমস্ত শ্রেষ্ঠীদের সাহায্য পেয়েছি তাঁরা সকলেই ছিলেন বুদ্ধ অনুগামী এবং তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের সঙ্গে কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকলে দৈব এবং মানবীয় বিপত্তির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, এবং পুণ্য অর্জনও হয়।

প্রথম সার্থ এল বাহল্লীকদের। তাদের সঙ্গে একজন ভিক্ষু ছিলেন। আমাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো। আমার মতো অনেক দেশ ঘোরা এবং কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানা ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি আনন্দিতই হয়েছিলেন, এখন তাঁর সার্থবাহর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পাথেয় হিসেবে আমাদের কাছে সামান্য কিছু সম্পদ ছিল, আমরা শ্রেষ্ঠীকে তা দিতে চাইলে তিনি অস্বীকার করে বললেন, আমি আমার নিজের খরচে আপনাদের কাংস্য দেশ পর্যন্ত পৌঁছে দেবো। ওখানকার লোকেরা ভিক্ষুদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। এরপর আর কোনো সমস্যা রইলনা। যে ভিক্ষু দুজন ফিরে যাবেন, আমরা আমাদের অংশের পাথেয় তাঁদেরই দিয়ে দিলাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, বিপরীত দিক থেকে কম্বোজপুরী যাবার সার্থও দু-এক দিনের মধ্যেই এসে বক্ষুগ্রামে ঠাঁই নিল। দুই ভিক্ষুকে তার সঙ্গে নিতে রাজি হওয়ায় আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস নিলাম।

বাহল্লীক সার্থর সঙ্গে আমরা বক্ষুর একটি শাখা ধরে পূর্ব দিকে চললাম। পথ সেই একঘেয়ে একই রকম, নগ্ন পাহাড় আর বিস্তৃত উপত্যকার বুক চিরে অসংখ্য নদী। চড়াই খুব কঠিন ছিল না তবে মাঝে মধ্যে কোনো কোনো জায়গাতে নদীর দুধারে কোনো মাটির চিহ্ন ছিল না, সমস্তটাই পাথরের বুক চিরে প্রবাহিত। যার জন্য পথের দুর্গমতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কখনো কখনো এরকম পথ এড়াবার জন্য অনেক দূর দিয়ে ঘুরে যেতে হতো। দুদিন যাত্রার পর শেষ বসতিটি আমরা পার হয়ে গেলাম। এযাবৎ কালে আমার সমস্ত ভ্রমণটাই ছিল আরও বৃহত্তর ভ্রমণের উদ্যোগপর্ব। এই পথে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল এটাই সঠিক পরিব্রাজনা। থেকে থেকে বুদ্ধিলের কথা মনে পড়ছিল, সে সঙ্গে থাকলে এই দুর্গম পথও কত সুগম হয়ে যেত। সুমনের সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল কিন্তু তার কাছ থেকে আমার তেমন বিশেষ শেখার কিছু ছিলনা।

বক্ষু উপত্যকা শেষ করে আমরা প্রবেশ করলাম সীতা (তরিম) নদীর উপত্যকায়। চলতে কষ্ট হচ্ছিল কারণ দুপুরে জোরে হাওয়া বইত যার ফলে শীত লাগত। সকালে চলার পথে দেখতাম জল জমে বরফ হয়ে আছে আবার একটু বেলা বাড়তেই সেগুলো গলে যেত। কখনো কখনো তুষারপাতের সম্মুখীনও হয়েছি। বক্ষু উপত্যকা ছাড়ার পর থেকে শুধু চড়াইয়ের পথেই হেঁটেছি। চারদিন পর এক গিরিপথ পার হয়ে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়া এক নদীর কিনারায় গিয়ে পৌছালাম। বালোর থেকে পশুখাদ্য বয়ে আনা হয়েছিল, সেসব শেষ হয়ে যাবার পর বালোরের লোকজন তাদের পশুদের নিয়ে ফিরে গেলো। নদীটি ছিল উত্তরবাহিনী। ডানদিকে হিমাচ্ছাদিত পর্বত। যার নাম খসগিরি। পথে মেষপালকদের ডেরা ছিল যেখান থেকে আমাদের সার্থ মাংস সংগ্রহ করত। এরপরের পথ ছিল ওই হিমাচ্ছাদিত পর্বতের মধ্য দিয়ে। দুদিন চলার পর শিলাপতি নামে এক হ্রদের কাছে গিয়ে আমাদের যাত্রাবিরতি ঘটল। এখানে তেমন ঠান্ডা ছিলনা, কাছেই বেশ বড়সড় একটা গ্রাম ছিল। এখান থেকে খসগিরি (কাশগড়) নগরী বেশি দূরে ছিলনা। আমাদের ভারবাহী পশুর দল একটানা অনেকদিন চলে আমাদের মতোই ক্লান্ত ছিল, তাছাড়া পথে ভালোমতো তারা খাবারও পায়নি, সেই সব ভেবে আমাদের বাহল্লীক সার্থ এই গ্রামে পাঁচদিন বিশ্রাম নেওয়া স্থির করলেন। আমরা নিশ্চিন্ত, অবশেষে কাংস্য দেশে এসে পৌছেছি। গ্রামের মধ্যে ছোট একটি বিহার ছিল। আমরা তিন ভিক্ষু সেখানে গেলাম। অভ্যর্থনা আশানুরূপই হয়েছিল। বিহারের ভিক্ষুদের অনুরোধ বাহল্লীক শ্রেষ্ঠীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁদের কাছেই আশ্রয় গ্রহণ করলাম। পরবর্তী পথ ছিল সহজ। পথের মধ্যে মধ্যে জনবসতি ছিল। পামিরের কঠিন কঠোর শীতল মালভূমিকে আমরা পিছনে ফেলে এসেছিলাম। কাংস্য দেশেও আমরা সুভূমি বিহারের পুনর্নির্মাণের জন্য সাহায্য সংগ্রহের আশাতেই এসেছিলাম, কিন্তু যা শুনলাম তাতে আশা করার মতো কিছু পেলাম না। এদেশের লোক বুদ্ধের অনুগামী কিন্তু হুণদেরই জ্ঞাতি অবারেরা এই দেশকে কম্বোজের মতোই লুণ্ঠন করে আর কিছু রাখেনি। এখন আবার তুর্কদের সঙ্গে অবারদের বিরোধ চলছে। তুর্করা এক সময় অবারদেরই অধীনস্থ ছিল। এখন তারা বিদ্রোহী হয়ে এককালের প্রভুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছে। আবার আর তুর্কদের বিরোধে বেচারা কাংস্য দেশবাসীরা উলুখাগড়ার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কখনো শোনা গেলো যে অবারেরা রাজধানী দখলে রেখেছে আবার শোনা গেলো তুর্ক সর্দার তুমিল অবারদের ঘোরতরভাবে পরাজিত করেছে। এরকম একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে ধনপ্রাপ্তির আশা বৃথা। এমতাবস্থায় আমি সেই লক্ষ্যের কথা ভাবতে লাগলাম, যা নিয়ে এক সময় আমি আর বুদ্ধিল চিন্তা ভাবনা করেছিলাম। আমরা খসগিরিতে গিয়ে বর্ষাবাস করব স্থির করলাম। শিলাপতি বিহার থেকে খসগিরি ছিল দুদিনের পথ। নগরীর উপকণ্ঠের গ্রামগুলিতে সামান্য দারিদ্র্যের চিহ্ন থাকলেও শস্যশ্যামলা ছিল। প্রত্যেক গ্রামেই ছিল মেওয়ার বাগান, ছোট একটি বিহার এবং সেখানে দু-চারজন ভিক্ষু। এদিকটাতেই দেখলাম প্রচুর কার্পাসের চাষ হয়। এবং মধ্যমণ্ডলের মতো এখানকার লোকও সুতিবস্ত্রই বেশি পড়ে। খসগিরি নগরী খসনদীর তীরে অবস্থিত। এদেশের লোক কুশলী শিল্পী। বস্ত্র, ধাতু কিংবা পাষাণ যাই হোকনা

কেন, এদের হাতে পড়লে তা যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। সারা পৃথিবীর বণিকদেরই এদেশে দেখা যায়। এখানকার মেওয়া, কার্পাস বস্ত্র এবং শিল্প কর্ম যেমন বিভিন্ন দেশে যায় তেমনই চীনের মহার্ঘ চীনাংশুকও খসগিরি হয়েই পশ্চিমের দেশে যায়। খসগিরিতে একটি অপরিচিত ধর্ম, মসীহী (নেস্তরী) ভিক্ষুদের মঠ দেখলাম। দুর্গম পাহাড়ের বুকে খসগিরি এক অপূর্ব নগরী। যেখানকার লোক বিদ্যা ও কলানুরাগী। কাংস্য দেশে অনেক ধর্ম প্রচলিত থাকলেও তথাগতর ধর্মই ছিল প্রধান। তবে অনেক ধর্মের মানুষ থাকা সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বৈরী ভাব ছিলনা। এদেশের মেয়েরা মাথায় সুতো অথবা জরির কাজ করা রঙিন টুপি পরে। তাছাড়া হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পাজামা এবং গায়ে সুতির জামা পড়ে। জামাটি ওপরের দিকে গিয়ে এত স্ফীত হয়ে গলার কাছে আটকানো থাকে যে বাইরে থেকে তাদের বক্ষবন্ধনী দেখা যায়। বক্ষবন্ধনীগুলিতে তারা মূল্যবান আভূষণ ব্যবহার করে। তারা ওড়না জাতীয় কিছু ব্যবহার করে না। তাদের শরীর খুব সতেজ ও সুন্দর।

খসগিরির প্রাচীন রাজবিহারে আমরা বর্ষাবাসের জন্য থাকলাম। ওই অবসরে ওখানকার ভাষার সঙ্গেও খানিক পরিচিত হলাম। এখানকার ভাষা ও লিপির সঙ্গে মধ্যমণ্ডলের প্রাকৃত ভাষার অনেক মিল আছে। খসগিরি নাম থেকেই বোঝা যায় যে কোনো এক সময় এখানেই খস্ জাতির বাস ছিল। এখানকার বিহারে কণিষ্ক নির্মিত একটি স্তূপ আছে। তার অর্থ কণিষ্কর রাজত্ব এখান থেকে আরম্ভ করে সুদূর পাটলিপুত্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। খসগিরিতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তখন তথাগতর অস্থি ধাতু নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। বিহারে একজন চীন দেশের ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া) দর্শনে যাচ্ছিলেন। তাঁর কাছে শুনলাম চীনেও বৌদ্ধধর্ম ধীর ধীরে প্রসার লাভ করছে এবং ভারতীয় গ্রন্থের ব্যাপক অনুবাদ হচ্ছে। শুনে আমার চীনে যাবার ইচ্ছা আরও বলবতী হলো।

বর্ষাবাস শেষ হলে আবার যাত্রা। সীতা (তরিম) উপত্যকা এক বিশাল দেশ। এই উপত্যকাও তিন দিক থেকে পর্বতমালা বেষ্টিত। পর্বতের মধ্যভাগের ভূমি কিছুটা সমতল উর্বর কিন্তু নিচের দিকটা বালুকাময়। এই বালুকাময় অঞ্চল দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে সীতা এবং তার অসংখ্য শাখানদী। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বেশ কিছুটা প্রবাহিত হয়ে বালুকাময় ভূমিতে হারিয়ে গেছে। এদিককার অধিকাংশ নগর, খসগিরি, ইয়ারকন্দ, কুস্তন এবং কুচী সবই মরুভূমির সীমানায় অবস্থিত। এসব জায়গাতে মরুভূমি পুনরুদ্ধার করে বসতি গড়ে উঠেছে। রাজা প্রজা একত্রে নদী থেকে খাল কেটে মরুভূমিকে সিঞ্চন করে তাকে সবুজ শ্যামলা করে তুলেছে। বস্তুত সেখানে মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে লড়াই হয়েছিল। যদি এই লড়াইতে মানুষ বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখাত, নিয়মিত খালগুলোর সংস্কার ইত্যাদি না করত তাহলে মরুরাক্ষস সমস্ত নগরকে বালুকাময় করে ফেলত। আমরা মরুভূমির মধ্যে চলে ইয়ারকন্দ পৌছালাম।

কুস্তনের (খোতন) ভূমির মহিমা অনেক শুনেছিলাম। কুস্তন শব্দের অর্থ পৃথিবীর স্তন। এর থেকে মনে হয় এক সময় দুধের নদী বইত এখানে। বাড়ি ঘর এক জায়গায় এক গুচ্ছের না হয়ে বেশ ছড়ানো ছিটানো। এর থেকে মনে হয় দস্যু তস্করের উপদ্রব

অন্য জায়গার তুলনায় কম। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনেই একটি করে স্তূপ রয়েছে। বিহারের কাছেই নাগরিকদের নির্মিত একটি অতিথিশালা আছে যেখানে সাধারণত পর্যটকেরা আশ্রয় নেয়। নগরের প্রাচীনতম রাজ-বিহারের নাম গোমতী বিহার। এছাড়া এখানে তিনটি সংঘারাম আছে। বছরের চতুর্থ মাসের (আষাঢ়) প্রথম দিনে নগরকে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সাজানো হয়। নগরের প্রধান দরজার সামনে রাজা রাণী এবং তাদের পরিচারকেরা এসে বসে। গোমতী বিহার থেকে তথাগতর শোভাযাত্রা বের হয়। নাগরিকেরা গীতবাদ্য সহযোগে শোভাযাত্রার অনুগমন করে। তথাগতর মূর্তি প্রতিস্থাপনের জন্য নগর থেকে এক ক্রোশ দূরে একটি তিরিশহাত উঁচু রথ সজ্জিত থাকে। যাকে দেখলে বিশাল এক প্রাসাদ বলে ভুল হয়। রথের ওপরে রেশমের চাঁদোয়া এবং গায়ে নানা রঙের নিশান থাকে। তথাগতর মূর্তি রথের মাঝখানে বসে আর তার দুই পাশে থাকে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি এবং মঞ্জুশ্রী মূর্তি। গোমতী বিহার যদিও সর্বাস্তিবাদী কিন্তু এখানকার ভিক্ষুরা মহাযান অনুগামী এবং সেই কারণেই তথাগতর দুই পাশে সারিপুত্ত এবং মৌদ্গালায়নের মূর্তি না রেখে বোধিসত্ত্বের মূর্তি রাখা হয়। প্রধান মূর্তি ছাড়াও রথ যখন নগর দ্বারের কাছাকাছি আসে তখন রাজা রাজমুকুট পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে নগ্ন পদে পুষ্প গন্ধ নিয়ে রথের কাছে যায়। পিছনে পরিচারকের দল দুই সারিতে সজ্জিত হয়ে রাজাকে অনুসরণ করে। প্রথমদিন গোমতী বিহারের রথ বের হয়, পরদিন অন্য কোনো বিহারের। এইভাবে চতুর্দশী তিথি পর্যন্ত উৎসব চলে, তারপর রাজা রাণী প্রাসাদে ফিরে যায়।

এখানে অনেক ভারতীয়কে আমি দেখেছি যারা বহুকাল আগে কোনো উপলক্ষে এদেশে এসে এখন বংশানুক্রমে স্থায়ী বাসিন্দায় পরিণত হয়েছে। এখানকার ভাষার সঙ্গে মধ্যদেশের প্রাচীন ভাষার সঙ্গে ধ্বনিগত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন প্রস্থকে এখানে বলে প্রস্ত। তিনকে বলে তে, ত্রয়োদশকে বলে তোদন। কুস্তনে একমাস ছিলাম। গোমতী বিহারেই ভিক্ষু সংঘিলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেও ছিল বিদ্যানুরাগী এবং সেজন্য ভারতে যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমাকে পেয়ে সে তার সেই ইচ্ছা স্থগিত রেখে আমার কাছে কিছু প্রমাণ শাস্ত্র পড়ল। আমরা এখন তিনের বদলে চারজন হলাম। কুচীর প্রসিদ্ধ নগরীর খ্যাতি আমরা শুনেছিলাম। কিন্তু তুর্ক আর অবারদের যুদ্ধের পরস্পর বিরোধী খবর পাওয়ায়, সে দেশে যাওয়ার সহজ পথটি ছেড়ে মরুভূমির পথ ধরলাম। মরুভূমির পথ অর্থে মরুভূমির দক্ষিণ সীমানা ঘেঁষে পথটি গিয়েছে। দক্ষিণের হিমবাহ থেকে উৎপন্ন অনেক নদী উত্তরে প্রবাহিত হয়ে অনেক ধারায় বিভক্ত হয়ে কোনো কোনোটি মরুভূমিতেই বিলীন হয়ে গিয়েছে। মরুভূমির প্রান্ত ঘিরে পথ, প্রথম দশদিন চারদিকে ছিল সবুজের সমারোহ। এখানে উৎসব ইত্যাদি অধিকাংশই হয় শীতে। যুদ্ধের যেটুকু খবর পেতাম তাতেই আমাদের চলার বেগ দ্রুত হয়ে যেত। আমরা কৃষ্ণা নদীর (কারামুরান) তীরের এক নগরে এসে পৌঁছালাম। শুনলাম সামনের রাস্তায় লড়াই চলছে, সাধারণ মানুষের যাতায়াত বন্ধ। যতক্ষণ দেয়ালে মাথা না ঠেকে যায় ততক্ষণ পথ চলব, আমাদের চারজনেরই ছিল এই প্রতিজ্ঞা। আমরা চারজন ছিলাম চারটি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের

দিক থেকে আমাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য অবশ্যই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত সুদৃঢ় ছিল। আমাকে ওরা ওদের উপাধ্যায়ের আসনে বসিয়েছিল আর নিজেদের আমার ছাত্র বা শিষ্য বলে পরিচয় দিত। আমাদের চলা ছিল ইচ্ছে মতো, খুশি হলে চলতাম না হলে কোথাও আস্তানা গেড়ে থেকে যেতাম। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানর কোনো তাড়া ছিল না। আমরা ভেবেছিলাম যে এভাবে ধীরে সুস্থে চলতে চলতেই একদিন যুদ্ধ থেমে যাবে এবং মহাচীনের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের কাছে যুদ্ধের সঠিক সংবাদ ছিলনা। তুর্ক এবং অবারদের মধ্যে লড়াইয়ে সাফল্য তুর্কদের দিকেই হেলে ছিল। অবারেরা এক হেরে যাওয়া লড়াইয়ের জের টেনে চলছিল। আমরা তখন এক বড়ো নদীর কিনারায় গিয়ে পৌছেছিলাম যেটি পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে এক ক্ষার সমুদ্রে (লবণের) গিয়ে পড়েছে। ওই নদীর কিনারায় হলুদ সবুজ ইত্যাদি রঙের স্ফটিকের মতো এক ধরনের পাথর (জেড্) পাওয়া যায় যা দিয়ে চষক (পানপাত্র) প্রভৃতি ছোটখাটো জিনিস তৈরি হয়। নদীর দুই তীর জুড়ে শস্যক্ষেত, বুনো ঝোপ-ঝাড়। আমরা তখন নদীতীরের এক সংঘারামে এক পক্ষকাল কাটালাম। ওখানেই আমি প্রথম কয়েকজন চীনা নাগরিককে দেখি। এযাবৎকাল যা দেখেছিলাম তার সবাই কিন্তু ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী। কাংস্য দেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সামান্য, কিন্তু এখানে বৃষ্টিপাত একেবারে প্রায় হয় না, এখানকার মানুষের একমাত্র ভরসা দক্ষিণের হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হওয়া নদীটি।

আমরা যে নগরীতে ছিলাম সেটির নাম চেচেন। সেখানে অযাচিতভাবে এক সৌগ্দী বণিক আমাদের তার সঙ্গে চীনে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। এই বিপদসংকুল পথে সে কেন যেতে চাইছে জিজ্ঞেস করায় সৌগ্দী বণিক বলেছিল– এ জীবনে এমন কোনো স্থান আছে যেখানে গেলে মানুষ সংকটমুক্ত থাকবে? ঘরে সুখে থাকব? সেখানেও প্রাণঘাতী ব্যাধি শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। এমনকি শয্যায় শুয়ে থাকলেও ছাদ ভেঙে পড়তে পারে। তারপর বণিক বলল, এখানে যে কৃষ্ণা নদী দেখছেন, আমার দেশ সৌগ্দীতে এর চেয়েও বড়ো কৃষ্ণানদী (সিরদরিয়া) আছে, অবশ্য তার চেয়েও বড়ো নদী আছে চীন দেশে, পীত নদী। সার্থবাহ তার নিজের প্রয়োজনে চীনে যাচ্ছিল, আমরাও তার অনুরোধে তার সঙ্গে চলার সিদ্ধান্ত নিলাম। সার্থর সঙ্গে চলার একটাই অসুবিধা ছিল, কখন চলা হবে কিংবা কখন থামা হবে এসব কিছু তার নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল, আমাদের সেখানে কোনো ভূমিকা ছিলনা। ক্ষার সরোবরের কাছেই একটি নিগম (সরকারি দপ্তর) এবং একটি দুর্গ ছিল। ক্ষার জল মানুষ এবং পশু কারও পক্ষেই পান করা সম্ভব নয়, সে জন্য তেমন জায়গাতেই থামা হতো যেখানে মিষ্টি জলের কুয়ো থাকত। শীতকাল হওয়া সত্ত্বেও রোদের তেজ ছিল, এবং তার ফলে পিপাসা বাড়ত। সার্থ সেই কারণেই দিনে বিশ্রাম নিয়ে রাত্রিতে পথ চলত। মরুভূমি সম্বন্ধে নানা ধরনের গল্প প্রচলিত আছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ মৃত্যুকে সঙ্গী করে এপথে যাতায়াত করে আসছে। লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে এপথে চলতে গিয়ে। সেই সব অকাল মৃতদের আত্মা ভূত হয়ে মানুষকে ভয় দেখায়, মেরে ফেলে। আমাদের সার্থও গুরুগম্ভীরভাবে আমাদের বোঝাতেন, সার্থর আগে পিছে থাকবেন না, সঙ্গে থাকবেন,

মরুভূমিতে রাত্রিতে পথ হারালে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভূতেরা মানুষ ধরার জন্য নানা রূপ ধরে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, মনে হবে আমাদের দলেরই কেউ। পথে মানুষের কঙ্কাল দেখতে পেয়েছি, সঙ্গীরা বলত এগুলো ভূতেদের কাজ। আমি পথ চলতে চলতে সূত্র আবৃত্তি করতাম, তবে সেটা ভূত তাড়াবার জন্য না পথের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য বলতে পারি না। পথপ্রদর্শককে সার্থবাহ প্রচুর সম্মান করে এবং যথেষ্ট অর্থও দেয়। প্রতি রাত্রির যাত্রাশেষে একটি নিশান সে পুঁতে রাখত যেটা আগামীকাল কোনদিকে চলতে হবে নির্দেশ করত। কারণ মরুভূমিতে সমস্ত দিকই একরকমের মনে হয়। সূর্যোদয়ের আগেই পরবর্তী মিষ্টি জলের কুয়োর কাছে পৌছে যাওয়াটাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। শীতে মরুভূমিতে ঝড় হয় না, এটাও ছিল বড়ো একটা সুবিধা। মরুভূমিতে বাতাসের বেগে এক জায়গার বালি অন্যত্র উড়ে গিয়ে উঁচু টিলার মতো তৈরি হয়। সকলে বলত ওগুলো ভূতেদের কাজ। আমি ভাবতাম ভূতেদের কি খেয়ে দেয়ে আর কোনো কাজ নেই যে এক জায়গার বালি আরেক জায়গায় নিয়ে জমা করে। শীতের রাত্রিতে মেঘমুক্ত আকাশে ধ্রুবতারা দেখা যেত। সিংহলে ধ্রুবতারা দেখেছিলাম উত্তরে আর এখানে সেটি ছিল মাথার ওপরে। আমরা ধ্রুবতারাকে বাঁয়ে রেখে পূর্বদিকে চলছিলাম। ক্ষার সরোবরের দুর্গ থেকে যাত্রা করার দশদিন পর আমরা অন্য একটি নদীর তীরে এসে আস্তানা গাড়লাম। সকলেই পরিশ্রান্ত ছিলাম। এমন সময় বেশ কিছু লোক, যাদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই ছিল, তারা আমাদের কাছে এল। এরা তুর্কদের ভয় পালাচ্ছিল। ওরা বলল, তুর্করা নগর লুণ্ঠন করে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আমরা এক সময় অবারদের প্রভু বলে মানতাম, এখন তুর্কদের মানতে রাজি আছি, কিন্তু তুর্করা কোনো কথা শুনতে রাজি নয়, তারা নৃশংসভাবে আমাদের লোকজনকে হত্যা করছে। সার্থবাহ সংবাদটি শুনে তার সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করল, আমার মতামতও জানতে চাইল। সার্থ সংকটের সময় ততক্ষণই ভয় পায়না, যতক্ষণ প্রত্যক্ষভাবে প্রাণসংশয়ের আশংকা না থাকে। কিন্তু এখন তো ধনেপ্রাণে ধ্বংস হবার মুখে, অতএব পিছু হটার সিদ্ধান্ত হলো। এবং পাঁচ ক্রোশ পিছু হটে ফেলে আসা কূপের ধারে সেই দিনই আমরা ফিরে এলাম। এই ফিরে আসা আমার জীবনেও এক পরিবর্তন নিয়ে এল। তুর্করা যতদিন পর্যন্ত না তাদের রাজত্বকে সুসংহত করতে পারে ততদিন পর্যন্ত চীনে যাবার কোনো আশা নেই। এদিকে আমরা পিছোতে পিছোতে কৃষ্ণা নদীর তীরের সেই চেচেন নগরীতে এসে পৌছালাম, যেখানে আমরা কিছুকাল বাস করেছিলাম। হঠাৎই মনে হলো কুস্তন থেকে কুচী যাবার পথ যদি নিরাপদ থাকে তাহলে? খবর পেলাম কুচীর পথে কোনো বিপদ নেই। পিছিয়ে আসার বিরাম ছিলনা। ক্রমাগত পিছিয়ে এসে, বছরের তৃতীয় মাসে (জ্যৈষ্ঠ) কুস্তনের রাজবিহারে আবার ফিরে এলাম। আগের বার এখানকার বিখ্যাত রথযাত্রা দেখার সুযোগ হয়নি, এবারে লক্ষ্য ছিল চতুর্থ মাসের আগেই যেন কুস্তন পৌছাই।

রাজধানী থেকে দেড় ক্রোশ দূরে নতুন রাজবিহার। আমরা এবার সেখানেই থাকার ব্যবস্থা করলাম। নতুন বিহার অর্থে নবনির্মিত বিহার নয়, তবে গোমতী বিহারের তুলনায় এই বিহারটি অবশ্যই নবীন প্রায় আড়াইশো বছর আগে এটি নির্মিত হয়েছিল।

বিহারের চৈত্যটি প্রায় আড়াইশো হাত উঁচু। চৈত্যের চূড়াটি সোনারূপায় কারুকার্জ করা। মহাচৈত্যের পিছনে দেবালয়, সেটির কারুকাজও যথেষ্ট সুন্দর। দেবালয়ের স্তম্ভ, দরজা, জানালা, সবই সুবর্ণমণ্ডিত। ভিক্ষুদের আবাসস্থল নির্মাণেও যথেষ্ট সুরুচি ও অর্থব্যয়ের নিদর্শন রয়েছে। কুস্তনের বর্তমান রাজবংশ তাদের নামে আগে বিজয় শব্দটি ব্যবহার করে। পাঁচশো বছর আগে বিজয়সম্ভব এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর অভিষেকের পঞ্চম বর্ষে তথাগতর ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁর গুরু বিরোচন ভারতীয় লিপিতে খোতনি ভাষায় লেখা চালু করেন যা আজও এখানে প্রচলিত। সিংহলের মতো খোতনেও (কুস্তন) রাজা প্রজা সকলেই বুদ্ধধর্মে দীক্ষিত। রাজবংশ শুধুমাত্র অর্থব্যয় করেই ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেনা, রাজপুত্র রাজকন্যারাও ভিক্ষু ভিক্ষুণী হয়ে সংঘে প্রবেশ করে। এখানকার ভিক্ষুরা বিনয় পালনে সর্বদাই তৎপর তা সে মহাযান বা হীনযান যে কোনো পন্থীই হোকনা কেন। সাধারণ নাগরিকদের মধ্যেও বুদ্ধের ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কুস্তনবাসীদের ব্যবহার সুন্দর, তারা স্বভাবে কোমল, সত্য ও ন্যায়ের প্রতি সর্বদাই নিষ্ঠাবান। মেলা উৎসব এদেশে লেগেই থাকে। সেজন্য নৃত্য গীতের প্রতিও এদের আকর্ষণ যথেষ্ট। কয়েক শতাব্দী আগে জনৈকা চীনা রাজকন্যা বিবাহসূত্রে এদেশে এসেছিলেন। তিনিই এদেশে চীনাংশুক (রেশম)-এর প্রচলন করেন। সাধারণ লোক হালকা সুতিবস্ত্র ব্যবহার করে আর ধনীরা পাতলা রেশম। শীতকালে পশম এবং চামড়ার পোশাকের চলন আছে তবে অধিকাংশ লোক তুলোভরা জামা পরে।

কুচীতে (৫৫২-৫৫৩ খ্রিঃ)

কুস্তনে চারমাস ছিলাম। কুস্তনীদের মতো অতিথিবৎসল জাতি কমই দেখা যায়। তবে কুচীতে পৌঁছে মনে হলো এখানকার লোকের গুণের তুলনা নেই। বছরের নবম মাসে (অগ্রহায়ণ) আমরা কুচী পৌঁছাই। তখনও আমরা ভাবিনি যে কুচীতে আমাদের প্রায় দুবছর থাকতে হবে। কুচীকে সত্যিকার অর্থে সুজলা সুফলা, শস্য শ্যামলা বলা যায়। ফসলের মধ্যে ধান, গম, বাজরাই এখানকার প্রধান শস্য। তবে এদেশের খ্যাতি তার ফলের জন্য। আঙুর, ডালিম, খোবানি, নাসপাতি ইত্যাদি ফল প্রচুর পরিমাণে ফলে। এদেশের উত্তরে পাহাড়ের খনিতে সোনা, তামা, লোহা, সীসা, রাঙ (দস্তা) প্রচুর পরিমাণে মেলে। এত সুশিক্ষিত সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ আমি এত ব্যাপক সংখ্যায় আর কোনো দেশে দেখিনি। চীনের রাজ দরবারে এখানকার নৃত্যগীত শিল্পীদের খুব কদর আছে। পুরুষদের চুল ছোট করে ছাঁটা, কেউ সখ করে দাড়ি রাখে। এদের মাথার পিছন দিকটা একটু চ্যাপটা ধরনের, বলা হয়, মায়েরা সদ্যজাত শিশুর মাথায় মৃদু চাপ দিয়ে ওরকম আকৃতি প্রদান করে।

আমরা আসার আগেই আমাদের সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রচার হয়ে গিয়েছিল এবং এখানকার লোক এক ভারতীয় পণ্ডিতের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। কুচীতে একশোর বেশি সংঘারাম আছে এবং ভিক্ষুর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। রাজবিহার এখানকার সবচেয়ে বড়ো এবং সমৃদ্ধ বিহার। আমাদের ব্যবস্থা সেখানেই

হয়েছিল। মহাযান ভিক্ষুর মাংসাহার নিষিদ্ধ; কিন্তু সর্বাস্তিবাদ, মহাবিহার এবং অন্যান্য পুরানো নিকায়ে (হীনযান) ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ মাংসাহার নিষিদ্ধ নয়। শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য জেনেশুনে মারা হয়নি এমন মাংস অন্নের সমতুল এবং সেজন্যই ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ। অনেক বিহারে মহাযান স্বীকৃত হয়ে মাংস বর্জিত হয়েছে, কুচীতে কিন্তু তেমনটি হয়নি। এখানকার ভিক্ষুদের আহারে মাংসও থাকে। নগর থেকে দুই যোজন দূরে দুটি প্রাচীন সংঘারাম আছে যেখানে একটি সুন্দর বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত আছে। বিহারের উপস্থানশালাতে একটি হলুদ রঙের জেড পাথরের মধ্যে বুদ্ধের চৌদ্দ আঙুল দীর্ঘ এবং ছ'আঙুল প্রশস্ত চরণচিহ্ন অঙ্কিত আছে। সেটি বহুলোকে নিত্য দর্শন করে। আমরাও করলাম। কণিষ্কের আগে বুদ্ধের মূর্তি পূজার প্রচলন ছিল না। তখন চরণ চিহ্ন, চৈত্য, পীঠাসন ইত্যাদিই বুদ্ধের নামে পূজিত হতো। রাজধানীর পশ্চিম দ্বারের বাইরে পথের দুধারে দুটি ষাট হাত উঁচু দুই বিশাল বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এখানেই পঞ্চবার্ষিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শারদ পূর্ণিমার সময় দশদিন ধরে চলে সেই মহোৎসব। কুস্তনের মতো এখানেও বুদ্ধমূর্তিকে রথে চড়িয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। পশ্চিমোত্তরে নদীর কিনারায় একটি বিহার আছে যার নাম আশ্চর্য বিহার। এই বিহারের ভিক্ষুরা বিনয় পালন ও জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত। এখানে শুধু পিটক চর্চাই নয়, পাণিনির ব্যাকরণ সূত্র ও মহাভাষ্যের ওপরে এত বিস্তৃত চর্চা হয় যা একমাত্র মধ্যমণ্ডলের বিহার ছাড়া অন্যত্র দেখা যায়না। কুচীকে লোকে কুশী অথবা কুশ নামেও ডাকে। এখানকার ভাষার 'চ' এবং 'শ'-এর ভেদ খুবই সামান্য। এদের ভাষার সঙ্গে আমাদের ভাষার শুধু বর্ণ লিপির নয়, ধ্বনিগত মিলও যথেষ্ট। যেমন–

সংস্কৃত	কুচী
দ্বীপ	দ্বিপ
কুলিযুগ	কলিযুক

কুচীতে কণিষ্কের নির্মিত একটি বিহার আছে। হতে পারে কুষাণ বংশ এখান থেকেই পূর্বদিকে অভিযান করেছিল। কুচীর মানুষের উৎসব, নৃত্য, গীতে আসক্তি দেখে প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে যে জাতি হিসেবে এরা বিলাসী, অকর্মণ্য, কিন্তু আদপেই তারা ওরকম নয়। বীরত্বের জন্যও কুচীবাসীদের খ্যাতি আছে। তবে বীরত্বেরও অন্ত আছে এবং সেই অন্ত সমগ্র জাতির ধ্বংস ডেকে আনে, কারণ যাযাবর তুর্করা সংখ্যায় এবং নৃশংসতায় অনেক বেশি এগিয়ে। অতএব এরা সন্ধি করে বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীনে সামন্ত রাজা হয়ে থাকাটাকেই শ্রেয় মনে করেছে। প্রথমে কুচী হুণদের অধীন ছিল, তারপর হুণদের হটিয়ে আসে অবারেরা। অবারদের হটিয়ে আবার তুর্করা এসেছে। তুর্ক অবারদের যুদ্ধে অন্তিম নির্ণয় হয়ে গেলেও চীনের পথ এখনও মুক্ত হয়নি। কুচীতে থাকার সময় মহাপণ্ডিত কুমারজীবের নাম আমি শুনি যদিও তাঁর বিদ্যাবত্তা ও অন্যান্য গুণের পরিচয় পাই চীনদেশ এসে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর চরণচিহ্ন ধরেই চীনে যা কিছু কাজ আমি করেছি। প্রায় দুশো বছর আগে কুচীর এক রাজকুমারীর গর্ভে কুমারজীবের জন্ম হয়। তাঁর পিতার দেশে ছিল কাশ্মীরে। কুমারজীব কাশ্মীর এবং কুচীতে অধ্যয়ন করেন এবং পরবর্তীকালে তিনি কুচীর রাজগুরুর পদ অলংকৃত করেন। তাঁর জ্ঞানের খ্যাতি

সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত পৌছেছিল এবং চীনের রাজা কুমারজীবকে তাঁর রাজসভায় চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। ব্যর্থতার অভিমানে চীন সম্রাট কুচীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বলা বাহুল্য কুচী পরাজিত হয় এবং কুমারজীবকে তাঁরা যুদ্ধবিজয়ের ফল হিসেবে চীনে নিয়ে যায়। সেখানে কুমারজীব বহু বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

কুচীর ভিক্ষুরা বৌদ্ধ-শাস্ত্র গ্রন্থকে তাদের ভাষার চেয়ে ভারতীয় ভাষায় পড়তে বেশী পছন্দ করে। তবে সাধারণ মানুষের জন্য প্রচুর গ্রন্থের স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। এখানকার লোকের নাট্যপ্রীতির কারণে 'নন্দপ্রবাজন' (নন্দপ্রবজ্যা) 'নন্দবিহারপালন' ইত্যাদি বহু নাটক এদেশীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এবং সেই নাটকগুলি প্রাশয়ই অভিনীত হয়। মৈত্রেয় বুদ্ধের জীবনের ওপরে আধারিত নাটক মহোৎসবের সময় কয়েকদিন ধরে অভিনীত হয়। এখানে ভিক্ষু বুদ্ধের চেয়ে গৃহস্থ বুদ্ধের জনপ্রিয়তা বেশি।

রাজবিহার এবং আশ্চর্যবিহার, ওই দুই বিহারের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আশ্চর্যবিহারের ভিক্ষুদের আগ্রহে বর্ষাবাসটা ওখানেই কাটালাম। কুচীর রাজা এবং রাজ অমাত্যরা আমাকে যতদূর সম্ভব মানমর্যাদা দিতেন আর ভিক্ষুরা চাইতেন আমি যেন স্থায়ীভাবে ওখানেই থেকে যাই। কিন্তু আমি এক মহাযাত্রার সংকল্প করে ছিলাম, এবং এখনই তার অন্ত হোক এরকম বাসনা আমার ছিলনা। আমার তিন সঙ্গী ভিক্ষু কুচীতে থাকার সময় অযথা সময় নষ্ট করেননি। তাঁরা অধ্যয়নে মন দিয়েছিলেন। সংঘিলের ছিল অসাধারণ ধীশক্তি, সেই সঙ্গে সে সাহসীও ছিল। তাঁর প্রতি হয়তো আমার সামান্য পক্ষপাত ছিল কিন্তু সে কথা আমিই জানতাম, বাইরে কখনও প্রকাশ হতে দিইনি। কুচীতে স্বল্পকালীন সময়ের জন্যও ভিক্ষু হওয়ার প্রথা আছে। একবার ভিক্ষু হবার পর আমার গার্হস্থ জীবনে ফিরে যাওয়া ব্যাপারটা আমার প্রথম দিকে ভালো লাগেনি। ভাবতাম এখানকার আমোদপ্রিয় মানুষ নিজের জীবন নিয়ে খেলা করুক, কিন্তু প্রবজ্যা নিয়ে তাদের খেলা করা উচিত নয়। পরে বৈশালীর লিচ্ছবিদের সম্বন্ধে তথাগতর বিচার মনে পড়ে যায়। লিচ্ছবি কুমার কুমারীদের দেখে ভগবান বুদ্ধের মনে হয়েছিল তাঁরা ত্রায়স্ত্রিংশ স্বর্গলোকের দেবপুত্র ও দেবকন্যা। আমারও কুচীর ছেলেমেয়েদের জীবনযাত্রা দেখে তথাগতর সেই কথাই মনে পড়ল। এত সুন্দর নরনারী আমি আর কোনো দেশে দেখিনি। কুচীর মানুষ শুধু চেহারাতেই সুন্দর নয়, তারা বীর এবং বুদ্ধিমান। উত্তরের হামলাবাজ যাযাবর তুর্কদেরও তারা তাদের শিষ্ট আচরণের মাধ্যমে সমঝোতার পথে নিয়ে এসেছে। কুচীতে প্রবজ্যাকে কেন অত গাম্ভীর্যের সঙ্গে নেওয়া হয়না তার উত্তর পেতে আমার বেশি দেরি হয়নি। সুখ ভোগের সমস্ত সামগ্রীই এদের আয়ত্তের মধ্যে তাহলে সুখভোগ করবেনা কেন, বিশেষত তারা যখন সেজন্য শারীরিক এবং মানসিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে। এরা কোনো অবস্থাতেই অন্যের সামনে নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করেনা, সেটা করা আত্মসম্মান খোয়ানোর মতো বিষয়। এরকম একটি ভোগবাদী দেশে পাঁচহাজার ভিক্ষুর উপস্থিতি কিন্তু প্রমাণ করে যে এরা ভগবান তথাগতর প্রতিও কতটা শ্রদ্ধাশীল।

বাহলীক ভিক্ষু রেবত ছিল একজন প্রতিভাবান তরুণ। আমি যে তিনজন সহযাত্রী পেয়েছিলাম তা কদাচিৎ কোনো পর্যটকের ভাগ্যে জোটে। আমাদের পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হচ্ছিল ততই পরস্পরের মধ্যে স্নেহ প্রীতির ভাব বেড়ে চলছিল। ভিক্ষু রেবত এক কুষাণ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার দেহশ্রী ছিল অনুপম। প্রাচীন ঐতিহ্যের সন্ধানে সে ভিক্ষু হয়েছে। সে জানত মূল কুষাণ বংশ কুচী থেকেই উদ্ভূত। সেই কারণে কুচীর মানুষজনের প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা ছিল। রেবতের তরুণ দেহে ভিক্ষুর চীবর, তাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলত। রেবত ভিক্ষা পাত্র নিয়ে মাধুকরি বৃত্তিতে বের হলেই শত শত লোক গৃহের বাইরে এসে তাকে দেখত। তার ভিক্ষাপাত্র একটি বা দুটি ঘরে যেতে না যেতেই উপচে পড়ত। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কিন্তু অন্য কিছুর ইঙ্গিত পেয়েছিল। রেবতকে আমি সাধ্যমতো সাবধানও করেছিলাম। সেও আমার সঙ্গে সহমত হয়ে কুচী ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইছিল। কিন্তু চীনের পথ তখনো স্বাভাবিক হয়নি।

কুষাণবংশের পরম্পরা সম্পর্কে জানবার আগ্রহ রেবতকে এক রাজমন্ত্রীর পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করায়। রাজমন্ত্রীও ছিলেন কুষাণ বংশের, এবং প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। তাঁর কাছেই নিশ্চিতরূপে জেনেছিলাম যে খস্ জাতি কুষাণদেরই এক জাতি গোষ্ঠী এবং সেই জন্যই এই দেশের একটি নগরের নাম হয়েছে খসগিরি (কাসগড়)। কুষাণরা ছ-সাতশো বছর আগে এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে ছড়িয়ে ছিল। সে আমলে বর্তমান কালের তুর্ক এবং অবারদের পূর্বজদের লোক হুণ বলত। কুষাণেরা শক নামেও পরিচিত ছিল।

রেবত প্রায়ই রাজমন্ত্রীর বাড়িতে তার বংশের অতীত ইতিহাস খুঁজতে যেত। কিছুদিনের মধ্যেই রাজমন্ত্রীর মনে হতে লাগল যে তাঁরই কোনো গৃহত্যাগী পুত্র আবার তাঁর কাছে ফিরে এসেছে। এই ঘনিষ্ঠতা শুধুই একতরফা ছিলনা। প্রায় নিত্যদিন রাজমন্ত্রীর আবাসে আমাদের নিমন্ত্রণ থাকত, নাহলে সুস্বাদু খাদ্যবস্তু আমাদের কাছে পাঠানো হতো। অবশ্য এর ফলে রেবতের কোনো ক্ষতি হতে পারে এমন আশংকা কখনও আমরা করিনি। মন্ত্রী নিজে তথাগতর ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা রাখতেন এমনকি তাঁর কোনো পুত্রসন্তান থাকলে তাকেও ভিক্ষু সংঘে হৃষ্ট চিত্তেই হয়তো দিয়ে দিতেন। রাজমন্ত্রীর একটি সুশ্রী কন্যা ছিল যে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কুচীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে পরিচিত হয়েছিল। রেবতকে সেই তরুণী প্রথমে ভ্রাতৃভাবেই দেখত। মন্ত্রীকন্যা মাঝে মধ্যে বিহারে কোনো পূজা বা ভিক্ষুদের সাংঘিক দান (ভোজ) উপলক্ষে আসত। এভাবে প্রায় বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলো। কুচী বা কুষাণ ইতিহাস সম্বন্ধে রেবতের জানা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভবিতব্য যদি সে জানত তাহলে তখনই হয়তো পূর্ব দিকের উদ্দেশে রওনা হতো।

আগেই বলেছি যে কুচীর লোক নৃত্য, গীত ইত্যাদি সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে উৎসাহী। প্রত্যেক তরুণীই কোনো না কোনো কলাবিদ্যা অনুশীলন করে। মন্ত্রীকন্যা শুধু দেহ সৌন্দর্যেই নয়, বিভিন্ন কলাবিদ্যাতেও পারদর্শিনী ছিল। রেবত তাকে একবার তন্ত্রীবাদ্য বাজিয়ে গান গাইতে শুনেছিল। বার্ষিক মহোৎসবের সময়ে এখানে কয়েক

রাত্রি ধরে নাট্যাভিনয় হয়। 'নন্দপ্রবজন' নামে একটি নাটকের অভিনয় সে বছর হয়েছিল। অশ্বঘোষের নাটক অবলম্বন করে কুচীর কোনো কবি সেই নাটক রচনা করেছিল। তথাগতর বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ ছিলেন অত্যন্ত রূপবান। তাঁর স্ত্রী নন্দা সমগ্র শাক্য গণরাজ্যের জনপদ কল্যাণী (সুন্দরী শ্রেষ্ঠা) ছিলেন। তখন তাঁদের নতুন পরিণয় হয়েছে এবং উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল। এমনই এক সময়ে সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভ করে প্রথমবার তাঁর জন্মভূমি দর্শনে এসেছিলেন। নন্দ তাঁর ভ্রাতার সেবার জন্য নিজে উপস্থিত ছিলেন। সেদিন নন্দ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র হাতে ধরে ছিলেন, কি খেয়ালে বুদ্ধ বললেন, 'এই হাত ভিক্ষাপাত্র ধারণেরই উপযুক্ত।' নন্দর স্ত্রী তখন আপন কেশ পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিলেন। এক সখী এসে তাঁকে বলল, 'সখী। তোমার নন্দ ভিক্ষাপাত্র হাতে তথাগতকে অনুসরণ করে চলেছেন।' নন্দা তাঁর কক্ষের গবাক্ষ দিয়ে সমস্তটা দেখলেন, তাঁর হৃদয় কেঁপে উঠল। ওদিকে নন্দ ভাবছেন একসময় নিশ্চয়ই তথাগত তাঁর ভিক্ষাপাত্র চেয়ে নেবেন, এবং নন্দ স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবেন। কিন্তু বুদ্ধ সেরকম করলেন না, অতএব নন্দ তাঁকে অনুসরণ করে চললেন। নন্দা সমস্ত দ্বিধা সংকোচ দূরে ঠেলে গবাক্ষ দিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আর্যপুত্র তাড়াতাড়ি ফিরো।' কিন্তু নন্দের আর তাড়াতাড়ি ফেরা হলোনা, সে সারাজীবনের জন্যই অগ্রজের পথ অনুসরণ করে চলল। সেদিনের নাটকে এই ঘটনারই অভিনয় হচ্ছিল। নন্দার ভূমিকায় মন্ত্রীকন্যা অভিনয় করছিল। নাটকের বিয়োগান্ত পর্বে তাঁর অভিনয় দর্শকদের চমৎকৃত করে দিয়েছিল। সমস্ত দর্শকের চোখে তখন অশ্রুধারা এবং আবেগের ফলে অভিনেত্রী নিজেও মূর্ছিত হয়ে মঞ্চে লুটিয়ে পড়েছিল। ভিক্ষুদের সাধারণভাবে নাটক, নৃত্য গীত ইত্যাদিতে দর্শক হওয়া নিষিদ্ধ তবে তথাগতর জীবন সম্বন্ধীয় কোনো নাটক সম্বন্ধে কোনো নিষেধ ছিলনা। আমরা বেশ কয়েকজন ভিক্ষু নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। দর্শকদের প্রথম সারিতেই আমাদের আসন ছিল। শেষ দৃশ্যে মন্ত্রীকন্যার অপূর্ব অভিনয় নৈপুণ্য এবং তার অনুপম সৌন্দর্য রেবতকে পথভ্রষ্ট করে ফেলল। মন্ত্রীকন্যা আগে থেকেই রেবতের প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং কুচীতে কোনো ভিক্ষুর চির-চীবর পরিত্যাগ করে গৃহস্থ জীবনে প্রবেশ করা কোনো অসাধারণ ঘটনা নয় এবং তার জন্য কোনো পক্ষকেই কোথাও লজ্জিত হতে হয়না। মন্ত্রীকন্যা অভিনয়কালে দর্শকদের সারিতে ভিক্ষু রেবতকে বসে থাকা অবস্থাতে দেখেই ভাবাবেগের বশে জ্ঞান হারিয়েছিল। পরবর্তী ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। রাজমন্ত্রী এবং তাঁর স্ত্রী যারপরনাই খুশি হয়েছিলেন, কারণ রেবতকে তাঁরা এযাবৎকাল পুত্র রূপেই দেখে এসেছেন, এখন দেখবেন জামাতারূপে। রেবত আমার কাছে নতশিরে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করল, এবং ভিক্ষু জীবনে ইতি টানবার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করল। আমার না বলার কিছু ছিল না। অতএব রেবত একদিন চীবর ত্যাগ করে রাজমন্ত্রীর গৃহজামাতা হয়ে গেলো।

ভিক্ষু সুমন ছিল কম্বোজের লোক। তার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল, আমার দেশে, উদ্যানে। আমার মধ্যে যেটুকু জ্ঞানসম্পদ ছিল, তার সবটুকুই প্রায় সে গ্রহণ করেছিল। আমাদের ভিক্ষুদের চিকিৎসাশাস্ত্র কিছুটা অধ্যয়ন করতে হয়। পর্যটনকালে নিজের ও অপরের কাজে লাগে। বুদ্ধ নিজেও সেই উপদেশ দিয়েছেন বলে তাঁর আরেক

নাম ভেষজ গুরু। তবে চিকিৎসাশাস্ত্র সামান্য অধ্যয়ন করেই কুশলী বৈদ্য হওয়া যায় না, তার জন্য হাতে কলমে কাজ শিখতে হয়। সুমন এই শাস্ত্রে পারদর্শী ছিল। অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ পড়ার দায় না থাকলে হয়তো এই শাস্ত্রে সে পারঙ্গম হয়ে উঠত। তাছাড়া কুশলী চিকিৎসক হতে হলে কিছু অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। সুমন সুযোগ পেলেই তার ভেষজ বিদ্যার উপযোগ করে লোকের উপকার করত এবং নিজেও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করত। কুচীতে থাকার সময়ে সে অনেকটা সময় পেয়েছিল যাতে তার অর্জিত বিদ্যাকে সে প্রয়োগ করতে পারে। ফলে অল্পদিনেই তার চিকিৎসার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। চিকিৎসা ছিল তার কাছে এক সাধনা।

একদিন এক কংকালসার চেহারার বৃদ্ধ তার কাছে এল, এবং এসেই অঝোরে কাঁদতে লাগল। অনেক কষ্টে জানা গোলো যে বৃদ্ধের কন্যা মৃতুপথ যাত্রী। সুমন বৃদ্ধের সঙ্গে তার মৃত্যুপথযাত্রিণী কন্যাকে দেখতে গেলো। নগরীর একেবারে শেষ প্রান্তে বৃদ্ধের আবাস। সেখানকার চারদিকে তাকালেই মনে হয় বহুকাল হলো, সুখ সম্পদ এই অঞ্চল থেকে বিদায় নিয়েছে। রাষ্ট্র বিপ্লবের ফলে যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেছে লুঠপাটের মধ্য দিয়ে এই বৃদ্ধ সপরিবারে তারই শিকার। তার প্রতিবেশীদেরও একই হাল। অবারেরা পালাবার আগে বৃদ্ধের বাড়ি লুঠ করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। বৃদ্ধের একমাত্র সক্ষম পুত্র অবারদের তরবারির আঘাতে মৃত্যু বরণ করেছে। শোখে দুঃখে বৃদ্ধের স্ত্রীও গত হয়েছে। এখন এক কন্যাই বৃদ্ধের সম্বল তাও সে মৃত্যুপথ যাত্রিণী। রাজধানীর সমস্ত চিকিৎসকরাই প্রায় তাকে দেখেছে কিন্তু কেউ কোনো আশা দিতে পারেনি।

সুমন বৃদ্ধের সঙ্গে তার সেই ভগ্নস্তূপে গেলো। কুচীর অধিকাংশ বাড়িতে বাড়ির দেয়াল ও ছাঁদ মাটি দিয়ে তৈরি হয় এবং কাঠের ব্যবহার খুবই কম থাকে। বাড়ি ঘরকে এরা লেপে পুঁছে সুন্দর সুন্দর চিত্র এঁকে সাজায়। বৃদ্ধের কাছে বাড়ি মেরামতির অর্থও ছিলনা। ছিলনা কোনো লোকবল। ঘরের অবস্থা দেখে সুমনের করুণা হলো। বাড়ির তিনটি কক্ষের মধ্যে একটিই ছিল যাহোক একটু ভালো। সেই ঘরের এক কোণে বহু পুরানো ফাটা একটি গালিচার ওপরে মেয়েটি ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়েছিল। মেয়েটির কাছে এক বৃদ্ধা বসেছিল। ভিক্ষুকে ঢুকতে দেখে সে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভিক্ষুকে স্বাগত জানাল তারপর ঘরের এক কোণে সরে দাঁড়াল। কুচীরা খুব ভাবপ্রবণ জাতি নয়, তারা একের দুঃখে সাধ্যমতো সাহায্য করে কিন্তু ভাবাবেগে তাড়িত হয়না। বৃদ্ধা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীকে মৃতই ভেবেছিল এবং সমস্ত অবস্থাটাই ছিল নৈরাশ্যজনক। সুমন প্রথম রোগিণীর আচ্ছাদন সরিয়ে তার চেহারা দেখল। কয়েকখানা হাড়ের ওপরে পীতাভ বর্ণের ত্বক, অনেকটা মৃত মানুষের মতো। কোটরাগত চোখ দুটি নিমীলিত থাকায় রোগিণী জীবিত কি মৃত বোঝা যায়না। সুমন অনেকক্ষণ ধরে রোগিণীর নাড়ি দেখল, অতি ক্ষীণ গতি। সুমন এবার তার পেটিকার মধ্যে রাখা ছোট ছোট মৃগচর্মের থলির মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিয়ে থলির গায়ে হাতির দাঁতের পট্টিতে লেখা ওষুধের নাম পড়ে নিশ্চিন্ত হলো। তারপর কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নখ দিয়ে এক রতি পরিমাণ ওষুধ তুলল। এখানে বলে রাখা দরকার যে অন্যান্য ভিষকদের মতো সুমনও তার

ডানহাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর নখ কাটতনা। সুমনের তখন একটাই চিন্তা যে ওষুধ রোগিণী গিলতে পারবে কিনা? সে রোগিণীর ওষ্ঠ ফাঁক করে ভৈষজ্যগুরুর নাম স্মরণ করে ওষুধ দিয়ে এক গণ্ডুষ জল দিলো। তারপর নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। রোগিণী জল এবং ওষুধ দুটোই গিলে নিল।

সুমন এবার বৃদ্ধকে আশ্বস্ত করে বলল, চিন্তার আর কোনো কারণ নেই। তবে আপনার কন্যা প্রায় মৃত্যুর মুখে চলে গিয়েছিল এবং আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র এই একটিই ওষুধ ছিল যার সঠিক প্রয়োগে আপনার কন্যা মৃত্যুমুখ থেকে ফিরে এসেছে। নাগার্জুনের কাছ থেকে শিষ্য পরম্পরায় এই ওষুধটি আমার কাছে এসেছে। এরপর সে খানিকটা আঙুরের রসে জল মিশিয়ে রোগিণীকে খাওয়াল। দিনান্তে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুমন ফিরে এল।

অপরাহ্ন বেলায় সাধারণভাবে ভিক্ষুরা নগরে প্রবেশ করেনা, কিন্তু বৈদ্যরা এ সমস্ত নিয়ম থেকে মুক্ত। সুমন নিজেই আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু বৃদ্ধের ধৈর্য বাঁধ মানেনি, সে নিজেই বিহারে এসে উপস্থিত, তবে তার মুখে হতাশার ভাব ছিলনা। সুমনের রোগিণী জলমিশ্রিত আঙুরের রস এবং ওষুধ খাওয়ার পর সুস্থতার দিকে ফিরছে।

সুমন বৈদ্য হিসেবে খুব অভিজ্ঞ ছিলনা এবং এরকম কঠিন রোগে ওষুধ দেওয়া তো দূরের কথা চোখেও দেখেনি। নিজের চিকিৎসার সাফল্যে তার একটু অহংকার হলো এবং নিদারুণ কষ্টের সময় সে শুধু মৌখিক সান্ত্বনা বাক্য না শুনিয়ে বাস্তবিক অর্থে কিছু করতে পেরেছে। মেয়েটি যেভাবে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে প্রায় ঢলে পড়েছিল সেখান থেকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতেও সময়ের প্রয়োজন। এদিকে সুমনের চিকিৎসার খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত রটে গেলো। ভদন্ত সুমন মৃতকে জীবিত করতে পারেন। প্রথমে রোগিণীর অস্থি ও ত্বকে জীবনের স্বাভাবিক রঙ দেখা দিলো, ধমনীতে রক্ত সঞ্চালনের গতি বাড়তে আরম্ভ করল, দুই চোখ কোটরের বাইরে এল, রুক্ষ কেশে সজীবতা এল। সুমন আগ্রহ ভরে তার রোগিণীর এহেন পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল। পরের দুঃখে আমার হৃদয়ও বিগলিত হয়, কিন্তু সুমন ছিল আমার চেয়েও বেশি কোমল হৃদয়ের। সে নিয়মিত রোগিণীর কাছে যেত, তার ঔষধ পথ্যের বিধান দিত। হঠাৎ সে একদিন আবিষ্কার করল যে মেয়েটি আর সেই কংকালসার চেহারাতে নেই, যেমনটি সে প্রথম দিন দেখেছিল। মেয়েটির নিমীলিত চোখ এখন প্রস্ফুটিত। ভ্রূতে বাঁকা ধনুকের আকার, অপরাজিতা ফুলের মতো নীল চোখ আর তাতে প্রাণের চমক, যেটা তার জীবনদাতাকে দেখে আরও অপরূপ হয়ে উঠত। ছ'মাস কাল কাটার পর সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলো। সুমন শুধু মেয়েটির চিকিৎসাই করেনি, তাদের পরিবারের দায়িত্বও নিয়েছিল। সুমনকে এখানে অনেকেই ভালোবাসত। সুমনের অনুরোধে তারা এগিয়ে এসে বৃদ্ধের সেই লুণ্ঠিত ভগ্নস্তূপকে সুন্দর বাসগৃহে পরিণত করল।

সুমন কিন্তু তার করুণার এরকম ফল হবে, তা স্বপ্নেও ভাবেনি। দুজন পুরুষের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে প্রকৃতির এক নিজস্ব মর্যাদা থাকে কিন্তু স্ত্রী পুরুষের ঘনিষ্ঠতা প্রকৃতির সীমাও লঙ্ঘন করে যায়। অবশেষে সেই ঘটনাই ঘটল যার ফলে আমি আমার

আরেকটি মিত্রকে হারালাম। সুমন তার প্রাক্তন রোগিণী সুন্দরী তরুণীটির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

কুচীতে বাস করা দুবছর হয়ে গিয়েছিল। দু-দুজন বন্ধুকে হারিয়ে আমি এবং সংঘিল মানসিকভাবে বেশ একটু বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিচ্ছিল। এই দেবপুত্র দেবকন্যাদের দেশ আমাদের কাছে ভয়ানক মনে হতে লাগল, যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু মহাচীনের রাস্তা খুলেছে কিনা তখনও ভালো করে জানতাম না।

দিকপরিবর্তন (৫৪৪ খ্রিঃ)

সম্মুখের রাস্তা যথেষ্ট নিরাপদ না থাকায় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কুচীতে আমাদের প্রায় দুবছর কাটাতে হলো, যদিও যুদ্ধ বিগ্রহ চলাকালেও বাণিজ্য সার্থ যাতায়াত করে। তুর্ক এবং তাদের প্রাক্তন প্রভু অবারদের মধ্যেকার যুদ্ধে তুর্করা তূমিনের নেতৃত্বে জয়লাভ করে। অবারদের রাজ্যসীমা তুর্কভূমি থেকে চীন পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এবং প্রকৃতপক্ষে এরা ছিল হুণদের পরবর্তী প্রজন্ম। চীন, পারসিক (সাসানী) ইত্যাদি রাজবংশও হুণদের ভয় পেত। এই যাযাবরের দল যেদিকে তাদের রক্ত চক্ষু ফেরাত সেদিকেই মহাপ্রলয় ঘটে যেত। চীন দখলকারি হুণ বংশীয় তোপাদের এক শাখার নাম ছিল আশিনা। এরা রাজ্যচ্যুত হয়ে পালিয়ে সুবর্ণ পর্বতে আশ্রয় নেয়। ওই অঞ্চল তখন ছিল অবারদের অধীন। অবারেরা আশিনাদের দাস বানিয়ে তাদের লৌহখনিতে কাজে লাগায়। আশিনারা প্রথম দিকে পাঁচশো পরিবার ছিল, কিন্তু দ্রুত বংশ বৃদ্ধির কারণে একশো বছরের মধ্যে এই গোষ্ঠী আবার প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারপর এরা যেসমস্ত অঞ্চল অধিকার করার জন্য অগ্রসর হয়, সেগুলি ছিল গালিচার তাঁবুতে বাস করা যাযাবরদের দখলে। তাদের চক্ষু ছিল আরও নিমিলীত, ভ্রূ তির্যকভাবে ঊর্ধ্বমুখী, গালের হনু প্রকাশিত, চ্যাপ্টা নাক এবং মুখে গোঁফ দাড়ির জায়গায় সামান্য কিছু চুল। হয়তো পার্থক্য ছিল কিন্তু বাইরের লোকরা বুঝতে পারত না, কারা অবার আর কারা তুর্ক। তুর্করাও আবার কোকত্যোর্ক (নীলতুর্ক, য়ানমতুর্ক) এবং করাত্যোর্ক (কালোতুর্ক) এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অবশ্য আমাদের কাছে তুর্ক অবার সকলেই ছিল এক। হাতে পড়লে রক্ষা ছিল না। তবে তাদের কোনো কোনো সর্দার তথাগতর অনুগামী হয়েছিলেন। তোপাসম্রাট বুদ্ধভক্ত ছিলেন। তিনি তাঁর রাজধানীতে এক বিশাল পাহাড়ের মধ্যে গুহা বিহার নির্মাণ করেছিলেন, পরবর্তীতে যে বিহার দেখে আমার বিদর্ভের অনুপম গুহার (অজন্তা, ইলোরা) কথা মনে পড়েছিল। তোপা বংশেরই এক শাখা হওয়ার ফলে তুর্করাও বৌদ্ধধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করত। আমাদের যাত্রাপথ হওয়া উচিত ছিল উত্তরমুখী, কিন্তু সেদিকে বিভিন্ন যাযাবর জাতির মধ্যে যে রকম ধুন্ধুমার লড়াই চলছিল তাতে সেদিকে গেলে কোনদিকে ভেসে যাব, কেউ বলতে পারতনা। যদিও আমার এবং সংঘিলের সেভাবে প্রাণের কোনো ভয় ছিলনা। সংঘিল সঙ্গে থাকায় কিছু সুবিধা হয়েছিল, একে সে ছিল কাংস্য দেশের লোক যার ফলে কুচীর অধিবাসীদের সঙ্গে তার কিছুটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল, কুচীর ভাষাও তার ভালো-

মতো জানা ছিল, আবার একসময় অবারদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকার জন্য তাদের ভাষাও কিছুটা সে জানত। প্রকৃতপক্ষে আমরা অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে চলেছিলাম, তবে সংঘিলের ক্ষেত্রে অন্ধকার আমার মতো নিবিড় ছিলনা।

তুর্ক সর্দার তুমিন সম্বন্ধে অনেক কিছু শুনেছিলাম। সে ছিল বীর এবং সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে সে সহৃদয় ব্যবহার করত। যাযাবরেরা যখন শাসকে পরিণত হয় তখন তাদের সংস্কৃতি চর্চার প্রয়োজন ঘটে। বহুদূর প্রসারিত রাজ্যকে শুধুমাত্র মৌখিক আদেশ দিয়ে শাসন করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে কুচী থেকে যদি আমরা আরও আগে যাত্রা শুরু করতাম, তাহলে আমাদের দুজন সঙ্গীকেও হারাতে হতো না, এবং পথের সমস্যাও খানিকটা কম হতো। খুব বেশি হলে আমরা হয়তো ধরা পড়ে ইলখানের ডেরাতে পৌঁছাতাম। কুচী থেকে আমাদের রওনা হবার দুবছর আগেই অবারেরা তুমিনের কাছ থেকে অন্তিম পরাজয়ের স্বাদ পেয়ে গিয়েছিল (৫৫২ খ্রিঃ)। অবারদের কআন (রাজা) আত্মহত্যা করেছিল। তার দলের কিছু লোক পালিয়ে পশ্চিমে হুংগারি পর্যন্ত পৌঁছায়, আর কিছু চীনের দিকে পালায়। বেশ কিছু লোক বিজেতাদের পক্ষভুক্ত হয়ে তাদের নাম গ্রহণ করে। তুমিনকে সাদা কালিনের আসনে বসিয়ে কআন (রাজা) ঘোষণা করা হয়। না বুনে, শুধুমাত্র পশম জমিয়ে এক ধরনের মোটা কাপড় তৈরি হতো। যাকে তুর্ক ভাষায় বলে নম্‌দা। এই কাপড় তৈরি করা যাযাবরদের এক বিশেষ কৌশল ছিল। কাংস্য দেশের লোকেরাও যাযাবরদের নম্‌দার নকল করার চেষ্টা করেছে কিন্তু তা এত সুন্দর হয়নি। নম্‌দা দিয়ে যাযাবরেরা তাঁবু তৈরি করে। কাঠির তৈরি এক ধরনের কাঠামো তৈরি করা হয় যাকে উটের পিঠে করে বয়ে স্থানান্তরে নেওয়া যায়। মাটিতে সেই কাঠামো খাড়া করে নম্‌দা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। এগুলোই যাযাবরদের বাড়ি ঘর। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি নম্‌দার তাঁবু খুবই আরামপ্রদ। গ্রীষ্মের দিনে তাঁবুর ভেতরটা ঠান্ডা থাকে আর শীতকালে উষ্ণ। তাঁবুর মাথার ওপরে কিছুটা ফাঁক থাকে, তাঁবুর ভেতরে আগুন জ্বাললে ধোঁয়া ওই পথে বের হয়ে যায়। কাঠ দুর্লভ হওয়ায় ইন্ধন হিসাবে উট, ঘোড়া, মেষ ইত্যাদির শুকনো পুরীষ ব্যবহৃত হয়। চটপট আগুন জ্বালানো এবং নেভানোর জন্য তাদের কাছে চামড়ার হাত পাখা থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদের গৃহস্থালী সর্বদাই চলমান সে জন্য তাকে যথেষ্ট যত্ন সহকারে গুছিয়ে রাখতে হয়। অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে যাযাবরেরা যথেষ্ট সন্দিগ্ধ থাকলেও ভারত সম্বন্ধে তারা সব সময় শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করত, কারণ বুদ্ধ সেখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। তুমিন খানের মৃত্যুর পর (৫৫৪ খ্রিঃ) তাঁর পুত্র ইস্তেমিক খান অল্প সময়ের জন্য তুর্ক যাযাবরদের শাসক হন। তবে রাজার ছেলেই রাজা হবে এরকম কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম তুর্কদের মধ্যে নেই। সে জন্য শক্তিশালী সর্দারদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় এবং সবচেয়ে শক্তিশালী সর্দার নম্‌দার তাঁবুতে বসে নিজেকে কআন ঘোষণা করে।

তুর্ক কিংবা অবার কিংবা হুণ সব যাযাবরদের শাসন ব্যবস্থাই এক ধরনের। তুমিন কআনের পুত্র ইস্তেমিক খানকে সরিয়ে অন্য এক সর্দার মুযু (৫৫৪-৫৬০ খ্রিঃ) কআন হয়। আমার ভ্রমণকালে তাঁর রাজ্যে গোলমাল লেগেই ছিল। একদিকে ক্ষমতা হারানো

অবার গোষ্ঠী, অন্য দিকে প্রাক্তন কআন তুমিন খানের গোষ্ঠী মুযু খানকে স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি। পরবর্তীকালে মুযু খান সমস্ত বিরোধিতা দমন করে তাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি চীনের সম্রাটও তাঁকে তোষামোদ করতেন। তাঁর পুত্র তোবা খান (৫৬৯-৫৮০ খ্রিঃ) শুধু নিজের গোষ্ঠীকেই নয় সমস্ত তুর্ক জাতিকেই বৌদ্ধধর্মের আওতায় এনেছিলেন। তুর্কদের মধ্যে পদমর্যাদার প্রকারভেদ আছে। তুর্কদের জনতাকে বলা হয় এল, এবং তাদের প্রধানকে কআন (রাজা)। রাজার নিচের ডানদিকের আসনে যবগু এবং বাঁদিকের আসনে শাদ বসে। তাদের ক্ষমতাও সেভাবেই বন্টিত হয়। কআনের স্ত্রীকে বলা হয় কাতুন (খাতুন-রানী)। কআন শব্দের আরেকটি অর্থ পিতা। সত্যি সত্যি এদের এলের সঙ্গে কআনের সম্পর্ক আমাদের দেশের রাজার মতো নয়, বরং একটা বৃহৎ পরিবারের পিতার মতো। মাকে এরা বলে 'ওগ' আর পুত্রবধূকে বলে 'কেলিন'। কআনের পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত সকলেই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হয় তবে প্রকৃত ক্ষমতা থাকে যবগু ও শাদের হাতে। কআন এবং দুই উপকআনের পরই ক্ষমতাশালী হলো কআনপুত্ররা যাদের 'তরকন' 'ময়ুরুক' এবং 'তুতুক' বলে। তাদের নামের সঙ্গে 'বেগ' উপাধি যুক্ত থাকে। বেগদের নিচে সাধারণ জনতার ছোট ছোট মোড়লেরা থাকে এদের বলা হয় 'করাবুদুন'। কআন কন্যাদের বলা হয় 'অপা' কিংবা 'অকা'। তাদের নিচে থাকে 'ইনি', 'কুতা' 'কেলিন' ইত্যাদি ইত্যাদি। যাযাবরেরা এই মর্যাদাগুলোকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলে। যাযাবরদের মধ্যে মেয়েদের ভূমিকা বেশ মর্যাদাব্যঞ্জক। সাধারণভাবে এদের মধ্যে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের স্থান উঁচুতে। যুদ্ধক্ষেত্রেও মেয়েরা পুরুষের চেয়ে কম যায়না। মৃতদেহ এরা কখনো দাহ করে কখনো কবর দেয় আবার কখনো এমনি ফেলে রাখে। তবে শোক প্রকাশের জন্য এরা নিজেরা নিজেদের চুল ধরে টানে কিংবা বুকে নখের আঁচড় কেটে ক্ষত সৃষ্টি করে। মৃতব্যক্তির ক্রিয়াকর্মে শ্বেতবর্ণের অশ্ব বলি দেওয়া হয়। সাদা পোশাক এদের কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক এবং কালো পোশাক শোকের।

কুচী থেকে রওনা হবার সময় একটা বিষয় জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম যে এখন আমরা যে অঞ্চল দিয়ে যাব সেখানকার মানুষ যাযাবর নয়। কুচী অথবা কুস্তনের মতো নগরে অথবা গ্রামে বাস করে।, অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ এবং ভিক্ষুদের সম্মান করে, যদিও ওই সমস্ত অঞ্চল যাযাবরদের অধীনেই ছিল। যাযাবরেরা তাদের তাঁবু, পশুপাল আর পরিবার পরিজন নিয়ে যেখানে ভালো চারণভূমি পেত যেখানেই থেকে যেত। স্থায়ী বসতি গড়ে থাকা মানুষদের তারা হীন, শাসনের যোগ্য মনে করত এবং সেরকমই ব্যবহার করত। ফলে স্থায়ী বসতি বাসীরাও যাযাবরদের ভয় পেত। এই সমস্ত পথে যাতায়াতকারী বণিক সার্থরা সানন্দে তাদের সঙ্গে একাধিক ভিক্ষুকে নিয়ে যেত, তাদের আহারাদিরও ব্যবস্থা করত। এর দুটো কারণ ছিল। প্রথমত বণিকেরা অধিকাংশই হতো বুদ্ধ অনুগামী, তাছাড়া পথে কোনো দৈব বিপদ আপদে এলে এই ভিক্ষুরা মন্ত্রবলে সেগুলো দূর করতে পারবে বলে তারা বিশ্বাস করত। এছাড়াও একটা কারণ ছিল যে যাযাবরদের অঞ্চল দিয়ে চলার সময় সঙ্গে ভিক্ষু থাকলে লাভ হয়, কারণ তুর্ণ যাযাবরেরাও ভিক্ষুদের সম্মান করে। আমরা একটি আগ্রহী বণিক দলের সঙ্গে ছিলাম।

পথে কিছু যাযাবরের সঙ্গে দেখা হলো। সাধারণভাবে যাযাবর বলতে যেমন আমরা বুঝি, তারা ঠিক সেরকম ছিল না। তাদের গায়ে ছিল চীনাংশুকের (রেশম) চোগা। তাঁবুর সাজসজ্জাতেও এমন সমস্ত মহার্ঘ বস্তু ব্যবহার করত যা একমাত্র কাংস্য দেশের সামন্তদেরই ব্যবহার করতে দেখেছি। আমাদের পথ ছিল পূর্বদিকে, ডানদিকে সীতা (তরিম) নদী প্রবাহিত হয়েছে। রাস্তা ছিল কখনো নদীর একেবারে কিনারা ঘেঁসে আবার কখনো বেশ খানিকটা দূরে। পথে জায়গায় জায়গায় গ্রামে বসতি ছিল। ক্ষেতে গম এবং বাজরা ছাড়া অন্য ফসলও দেখতে পেলাম, তাছাড়া আঙুরের বাগান তো আছেই। প্রথম বড়ো বসতি পেলাম যার নাম ছিল অগ্নি (অবিনি, করাশর)। এখানকার রাজা তুর্কদের অধীন। এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে চারটি পাহাড়ের মাঝে বাঁধ বেঁধে এক বিশাল কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সেখান থেকে খাল কেটে সেচের জন্য দূর দূরান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অগ্নিতে দশটি বিহার আছে যেখানে হাজার দুয়েক ভিক্ষু বাস করে। এখানকার ভিক্ষুরা সর্বাস্তিবাদী এবং মহাযান পন্থী তবে মাংসাহারে তেমন নিষেধ নেই। আমরা যে বিহারে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার নাম অরণ্য বিহার। এখানকার ভিক্ষুদের কাছে আগে থেকেই আমাদের আসার খবর ছিল। বিহারে পৌঁছানো মাত্রই যে ধরনের অভ্যর্থনা পেলাম তাতে বুঝলাম এখান থেকে বিদায় নেওয়াও যথেষ্ট কষ্টকর হবে। অগ্নি থেকে দশ দিনের পথ অতিক্রম করে পরবর্তী নগরী। অগ্নির সীমানা ছুঁয়ে প্রবাহিত নদীটি কিন্তু সীতায় গিয়ে মেশেনি, নদীটি এক বিশাল ক্ষার সরোবরে (ব্যারচকুল) বিলীন হয়েছে।

অগ্নি ছাড়ার পর আমরা যে পথে চলেছিলাম, সেটি ছিল সুন্দর এবং নিরাপদ। আমাদের পথ ছিল কখনো পূর্ব কিংবা উত্তরপূর্ব দিকে। পথে পাহাড়, আবার শ্যামল সমতলভূমি উভয়ই পড়ল। আমাদের লক্ষ্য করাখীজা (তুর্ফান) নগরী, চীনারা যাকে বলে কাউ-শাঙ। অগ্নির মতো কাউ-শাঙও বাণিজ্য পথের ধারে অবস্থিত হওয়ায় বেশ সমৃদ্ধ নগরী। এখানকার বণিকেরা বেশ ধনী। সমৃদ্ধির বিচারে একে কুচীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। কাউ-শাঙ থেকে একটি বাণিজ্য পথ উত্তরের গিরিপথ হয়ে আরও উত্তরে গিয়েছে। আরেকটি গেছে কুচীর দিকে, যে পথে আমরা এসেছি। এখানকার শ্রেষ্ঠীদের বাড়ি ঘর খুব সুন্দর, প্রত্যেক বাড়ির সঙ্গেই লাগায়ো আঙুর বাগান। কাঠের অভাবের জন্য কয়েকটি বিশেষ ধরনের গাছ যত্নের সঙ্গে পালন করা হয়। শুনলাম উত্তরের পাহাড়ে দেওদার এবং ভূর্জপত্রের গাছ আছে, বিহারে আমি ভূর্জপত্রের ব্যবহার দেখেওছি। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করতে অনেক দিনের পথ অতিক্রম করতে হয় যার ফলে সেগুলি অত্যন্ত ব্যয় বহুল হয়ে পড়ে। কাউ-শাঙ থেকে বের হবার পর আমরা সেরকম বসতি বা মানুষজন আর পাব না, যাদের সঙ্গে আমাদের আকৃতি বা প্রকৃতির মিল আছে। অতএব কাউ-শাঙ ছাড়ার আগেই সে সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব তথ্য জেনে নেবার চেষ্টায় রত হলাম। কাউ-শাঙ থেকে চীনের সীমানা একমাসের পথ এবং আরও দেড় মাসের পথ পার হলেই চীনের মহাপ্রাচীর।

কাউ-শাঙে পাঁচ-সাত দিন কাটিয়ে আবার পথে বের হলাম। দক্ষিণে মরুভূমি, মানুষজনের বসতি খুবই কম অতএব উত্তরের পাহাড়ের সমান্তরালে কখনো বা গিরিপথ

হয়ে আমরা চলেছি। সর্বত্রই জল, আশ্রয় ইত্যাদির সুবিধা ছিল। পাহাড়ে যাযাবরদের অস্থায়ী বসতি ছিল। প্রথম দিকে তাদের সান্নিধ্যে এলে মনের মধ্যে যেরকম একটা শংকার ভাব দেখা দিত পরের দিকে তেমন আর হতো না। সংঘিল বলত মানুষ সর্বত্রই প্রায় এক স্বভাবের। আমার দীর্ঘ পর্যটকের অভিজ্ঞতাও আমাকে শিখিয়েছিল যে মানুষ স্বভাবগতভাবে উদার এবং কোমল, জীবনের পরিবেশ, পরিস্থিতিই তাকে কঠোর হতে বাধ্য করে। যেখানে লুঠপাট ছাড়া মানুষের বাঁচার আর কোনো উপায় নেই, সেখানকার মানুষের মধ্যে লুটেরার হিংস্রতা দেখা যাবেই। এখানে চলার পথে অনেক সময় যাযাবর বেগ তার তাঁবুতে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছে, নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেছে। তাদের স্ত্রীরা আমাদের দিয়ে পূর্জার্চনা করিয়েছে। যাযাবরদের মেয়েরা কুচীর মেয়েদের মতোই সুন্দরী। শুনলাম এরাও 'স্ত্রী রত্ন দুষ্কুলাদপি' মন্ত্রে বিশ্বাস করে। দেখলাম যাযাবর পুরুষেরা তাদের রমণীদের বেশ মান্য করে। এদের নিজস্ব দেবতা এবং তার পুরোহিতও (শামান) আছে। তা হলেও এরা বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বকে দেবতা হিসেবে স্বীকার করে।

পাহাড়, সমতলভূমি শেষ করে অবশেষে মরুভূমিতে প্রবেশ করতেই হলো। চলতে চলতে দুটি মরুভূমির মধ্যিখানে এক শস্য শ্যামল নগরী (হামি) পেলাম। এখানে এক সংঘারামে ঠাঁই নিলাম। চারদিকে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলছে খবর পেতাম। এখানে দেখলাম বেশ কিছু যাযাবর, নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। আমরা যে বিহারে ছিলাম সেটি কোনো এক অবার রাজার তৈরি। বিহারে এই প্রথম আমরা অবার জাতির ভিক্ষু দেখতে পেলাম। শুনলাম একজন তুর্ক শ্রমণেরও সেখানে আছে। স্বাভাবিকভাবেই তার সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী হলাম। শ্রমণেনরটি আঠারো বছরের তরুণ, মায়ের দিক থেকে সে কুস্তনী এবং সে জন্যই সে ভিক্ষু হয়েছে, সাধারণত দেখা যায় যাযাবরদের মধ্যে একমাত্র অবাররাই কয়েকজন ভিক্ষু হয়েছে। তুর্ক তরুণ, আমার সেখানে থাকার সময়েই শ্রমণের পর্যায় অতিক্রম করে ভিক্ষু হলো এবং আমি তার নাম দিলাম শান্তিল। আমি আর সংঘিল সেই তরুণ ভিক্ষুর যথাক্রমে উপাধ্যায় ও আচার্য হলাম।

হামিনগরীর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। কুচী এবং হামির লোকরা বস্তুত একই জাতিভুক্ত। যদিও পশুপালনই এখানকার প্রধান জীবিকা তবুও এখানকার লোক যাবাবর নয়। হামি নগরী থেকে উত্তরের দিকে কোনো গ্রাম, বসতি, চাষ আবাদ নেই। সেখানে লোকে নম্‌দার তাঁবুতে থাকে, উট, ঘোড়া, চমরী আর মেষপালই তাদের সম্পত্তি। এরা ঘোড়সওয়ার হিসেবে দারুণ। লাগাম, চাবুক ছাড়াই ছোট ছোট বাচ্চারা ঘোড়ার পিঠে টিকটিকির মতো লেগে থেকে দুরন্ত গতিতে ছোটে। আশ্চর্যের বিষয় ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই এরা তীর ধনুক দিয়ে অদ্ভুত লক্ষ্যভেদ করে। পশুপালন ছাড়া শিকারের মাধ্যমেও এদের খানিকটা মাংস সংগ্রহ হয়। খাদ্যে শস্যের ব্যবহার কম, দুধ খায় প্রচুর। তাছাড়া ঘোড়ার দুধ থেকে তৈরি এক প্রকার মদ এদের প্রিয় পানীয়। এদের অনেককে দেখেছি ঘোড়ার পিঠে বসেই তার শিরা কেটে দিয়ে রক্তপান করতে। এই যাযাবর গোষ্ঠী প্রাচীন হুণদের বংশ। চীনের পরাক্রমী সম্রাটও এদের ভয় পায় এবং

আপদে বিপদে এদের সাহায্য ভিক্ষা করে। নিজেদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি শত্রু সৈন্য দেখলে মুখোমুখি যুদ্ধ এড়িয়ে যায়। এদের স্থায়ী বাড়ি ঘর সম্পদ না থাকায় বিজয়ী বাহিনী লুটপাট করার মতো কিছুই পায়না, ফলে যাযাবরেরা হীনবল হয় না। শত্রুর বিশ্রামের সুযোগে এরা অতর্কিতে হামলা করে। কোনো বড়ো সৈন্যদল এদের তাড়া করে বেশি দূর যেতে পারে না, কারণ রসদ সরবরাহের প্রশ্ন থাকে। চীনারা প্রথম প্রথম এদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এখন মৈত্রীর সম্পর্ক রেখে চলে।

হামিনগরীকে কোনো বিশেষ দেশের সীমানা না বলে আন্তর্জাতিক সীমানা বলাই ভালো। এখানকার বড়ো বড়ো বণিকেরাও আদতে পারস্য, কুস্তন, খস্‌গিরি ইত্যাদি অঞ্চলের লোক। অতিথি সৎকারকে এরা এক মহৎ কাজ বলে মনে করে এবং অতিথির সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কেবল গৃহকর্তা নয়, তার স্ত্রী কন্যারাও এগিয়ে আসে। এজন্য এদের সম্বন্ধে কিছু নিন্দামন্দও প্রচলিত আছে, তবে যারা নিন্দা করে তারা এদের মনের আবেগকে বুঝতে অক্ষম। বেশ কিছু ভিক্ষুকেও দেখেছি এই ধরনের অতিথি সেবার সুযোগ নিতে যেটা ছিল খুবই খারাপ। অধিকাংশ লোক বুদ্ধের অনুগামী, কিছু মসীহী (ইহুদী) এবং কিছু পারসিক (মানী) ধর্মের লোকজনও এখানে আছে। হামি থেকে আমাদের যাত্রাপথ ছিল দক্ষিণ চীনের দিকে। ওই অঞ্চলে যুদ্ধ ভীতি থাকার জন্য বণিক সার্থবাহরাও সাবধানী পদক্ষেপ ফেলত। সারা গ্রীষ্ম এবং বর্ষা হামিতেই কাটাতে হলো। তার একটা কারণ পথের বিপদ আর দ্বিতীয় কারণ ছিল নতুন ভিক্ষু শান্তিলের পরিবারের অনুরোধ। বর্ষার সময়কাল এখানে খুব সামান্য। শীতে বরং এখানে হিম বর্ষা হয়। সার্থবাহরা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শীতকালেই পথ চলে কারণ তখন মরুভূমিতে ঝড় উঠে সার্থবাহকে পথভ্রষ্ট করেনা। মরুভূমির ঝড় বড়ো ভয়ানক জিনিস। ঝড়ে মানুষজন ক্ষেত খামার অনেক সময় বালির নিচে চাপা পড়ে যায়। বালি জমে অশ্বক্ষুরাকৃতির পাহাড় সৃষ্টি করে। এবারের যাত্রায় শান্তিলও আমাদের সঙ্গী হবে।

শীত আরম্ভ হলো। তাড়াতাড়ি করতে করতেও আরও একমাস কেটে গেলো। শান্তিলের পিতা, যিনি ছিলেন একজন তুর্ক বেগ, তিনি নিজে আমাদের চীন সীমান্ত পর্যন্ত পৌছে দেবেন। তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল কে জানে, তিনি তাঁর বিশাল তাঁবুর পরিবার, বিক্রয়যোগ্য পশুপাল, যুদ্ধে বিজিত দাসদাসী, যারা অধিকাংশই কাংস্য দেশের লোক, তাদের সকলকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। শুভমুহূর্ত দেখে মঙ্গলাচরণ সেরে অবশেষে বের হওয়া গেলো। এই প্রথম কোনো যাযাবর পরিবারের সঙ্গে আমার ভ্রমণ, জ্যোৎস্না রাত্রি। জোর কদমে পথ চলা চলছিল। আগামীকাল দিনের এক প্রহর অন্তের মধ্যে পরবর্তী আশ্রয়স্থল খুঁজতে হবে। তাঁবু বহনকারী উটের দলকে সকলের আগে রওনা করানো হয়, তারা আগে পৌছিয়ে তাঁবুর ব্যবস্থাদি করে। উটের পর অন্য লোকজন জিনিসপত্র এবং সব শেষে বেগ এবং তার অশ্বারোহীর দল। এদের একটা জিনিস আমার খুব ভালো লাগল যে কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে বেগ তার অনুচর, ভৃত্যদের চেয়ে পিছিয়ে থাকেনা। পরিস্থিতি, পরিবেশ অনুযায়ী আমাদের ভিক্ষুদেরও অনেক নিয়ম শিথিল করতে হয়। যদিও ভিক্ষুদের পায়ে হেঁটে যাত্রা করাই নিয়ম, কিন্তু

এখানে আমাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমি সেই মুহূর্তে নিয়ম ভাঙতে ইচ্ছুক ছিলাম না, আমার অনাগ্রহ দেখে বেগও আর ঘোড়ায় চড়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন না। আমি আর সংঘিল পদব্রজে যাচ্ছি দেখে শান্তিলও তার অশ্ব পরিত্যাগ করল। আমাদের তিনজনের জন্য একটি পৃথক তাঁবু এবং দুজন পরিচারকের ব্যবস্থা ছিল। আমরা হাঁটাপথের যাত্রী, তাই আমাদের তাঁবুও অনেক আগেই উটের পিঠে চলে যেত এবং আমরাও তখনই রওনা দিতাম। ফলে বেশির ভাগ সময় আমরাই অন্য সকলের আগে তাঁবু বাহকদের পরেই নতুন জায়গাতে গিয়ে পৌঁছাতাম। অবাক হয়ে এক নগ্ন নির্জন স্থানকে কয়েক দণ্ডের মধ্যে এক বসতি হিসেবে গড়ে উঠতে দেখতাম। পশুগুলোকে বিচরণের আগে তাদের দুখ দুইয়ে নেওয়া হতো। উটের দুধ খেতে প্রথম প্রথম আমার খুব খারাপ লাগত, অনেকটা ছাগলের দুধের মতো অস্বস্তিকর গন্ধ। তবে অভ্যাসে মানুষের রুচি পরিবর্তিত হয়। কলসি কলসি দুধ দেয় এরকম উট এখানে অত্যন্ত উপযোগী। অল্পকয়েক দিনের মধ্যেই আমিও উটের দুধে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। নতুন জায়গাতে পৌঁছানো মাত্রই সদ্য দোহন করা উটের দুধ আসত পানের জন্য। ভিক্ষুদের অপরাহ্নের পর আহার নিষিদ্ধ তাই দুপুরেই এভাবে খেয়ে নিতাম। ফলে পরদিন দুপুর পর্যন্ত শরীর ঠিক থাকত। যাযাবরদের প্রধান আহার্যই ছিল মাংস। সঙ্গে কিছু শুকনো ফল। ফলে বিনয়পিটকের নিয়ম মেনেও প্রাণধারণের জন্য আমাদেরও মাংসাহার করতে হতো। চীন দেশে পৌঁছে অবশ্য আমি মাংসাহার একেবারেই পরিত্যাগ করেছিলাম, কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা। যাযাবরেরা মাংস পুড়িয়ে খেতে পছন্দ করে। মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়ে তাতে আগুন জ্বালা হয়। তারপর একটা ভেড়া মেরে তার চামড়া ছাড়িয়ে গর্তের আগুনে রেখে বালিচাপা দেওয়া হয়। তবে এ ধরনের সুস্বাদু মাংস বেগ বা তার অতিথিরাই আস্বাদনের সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য, আমরা বেগের অতিথি ছিলাম বলে সেই সুযোগ পেয়েছি। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় শান্তিলের মা দাসীদের সঙ্গে করে আহার্য পানীয় নিয়ে আমাদের তাঁবুতে আসতেন। কোমল নম্‌দের ওপরে যাযাবর ভূমির অত্যন্ত কোমল মৃগচর্ম (সমুর) বিছানো থাকত, তার ওপরে আমরা তিনজন ভিক্ষু বসতাম। উপাসিকা আমাদের ভিক্ষা পাত্রে আহার্য বস্তু দিয়ে করজোড়ে নিবেদন করতেন, আমরাও তাঁকে সুখী হও বলে আশীর্বাদ করতাম। আহারের পর কিছু ধর্মালোচনা হতো, শান্তিল দোভাষীর ভূমিকা নিয়ে আমার কুস্তনী ভাষার উপদেশকে তুর্ক ভাষায় অনুবাদ করত।

এক সপ্তাহ বেশ নির্বিঘ্নে যাত্রা চলল, আমার ভালোই লাগছিল। যাযাবরেরাও এক ধরনের পর্যটক। আমৃত্যু তারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তায় ঘাস, জল ইত্যাদির অভাব ছিলনা। চীনে পৌঁছে বেগ তার পশুপাল বিক্রি করে চীনের মহার্ঘ চীনাংশুক কিনবেন। সেদিন সূর্যোদয়ের সময়। পরবর্তী আশ্রয়স্থল এক যোজন দূরে। সমতল ভূমিতে চলছিলাম বলে বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। দেখলাম শতাধিক অশ্বারোহী দ্রুত আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। দেখা মাত্রই আমাদের লোকেরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল, কারণ তাদের অধিকাংশই পদাতিক, সামান্য কিছু অশ্বারোহী। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম কোনো ভ্রাম্যমাণ তুর্ক ঘোড়সওয়ারের দল,

স্থানান্তরে চলেছে। কিন্তু আমার সঙ্গীরা তীর ধনুক প্রস্তুত করে অপেক্ষা করতে লাগল। শান্তিল বলল যারা আসছে তারাও তুর্ক তবে লুঠপাটের সুযোগ থাকলে ওরা নিজেদের লোকজনকেও রেয়াত করেনা। বণিক সার্থ বা বেগের তাঁবু লুঠ করলেই মূল্যবান জিনিস পাওয়া যাবে এটা ওরা জানে। কআন জানতে পারলে এদের কঠিন শাস্তি দেয়, সেই জন্য লুঠেরারা লুঠপাটের কোনো চিহ্ন রাখে না সকলকেই মেরে ফেলে।

সঙ্গীদের আশংকাই সত্য হলো। আমাদের দলের লোকেরা আগন্তুকদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা এক ঝাঁক তীর ছুঁড়ে তার জবাব দিলো। প্রত্যুত্তরে আমাদের লোকেরাও পশুপালের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ল কিন্তু হামলাকারীরা ছিল আমাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। চোখের সামনে উভয়পক্ষের অনেক লোককে হতাহত হতে দেখলাম, তারপরই আমি জ্ঞান হারাই।

যখন জ্ঞান ফিরল, তখন গভীর রাত্রি, চারদিক অন্ধকারে ঢাকা শুধু মেঘমুক্ত আকাশে নক্ষত্ররাশি ফুলের মতো ফুটে আছে। ঘটনা কি ঘটেছে জানতে ইচ্ছা হলো কিন্তু তখনই মাথায়, বাঁ হাতে এবং পেটে যন্ত্রণা বোধ হলো। ডান হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি আমার সারা শরীর রক্তে ভেজা। সারা শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হলো। প্রাণ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি শুধু আমার জীবনের কথা ভাবিনি। আমার সঙ্গী দুজনের কথাও মনে হচ্ছিল। প্রথমে কান সজাগ করে শোনার চেষ্টা করলাম। কাতর গোঙানির শব্দ শুনতে পেলাম। এমন সময় কারও হাত এসে আমার গায়ে পড়ল, আমি সামান্য নড়তেই শান্তিলের ক্ষীণ কণ্ঠ শুনতে পেলাম। আমি বললাম, বেঁচে আছি তবে আহত, বোধ হয় পেটে তীর বিঁধে আছে। শান্তিল আমার কথা শুনতে পেয়ে কঠিন হাতে টান মেরে তীরটাকে খুলে ফেলল, ফলে ক্ষতস্থান একটু বর্ধিত হলো। কিন্তু বেঁচে থাকতে গেলে ওটা করতেই হবে। জেনে আনন্দ হলো যে শান্তিল অক্ষত আছে। সংঘিলের কথা জিজ্ঞেস করতে শান্তিল বলল, কাছেই সেও অজ্ঞান হয়ে আছে। সংঘিলকে দেখার কথা বলেই আবার আমি জ্ঞান হারাই। পুনরায় যখন জ্ঞান ফিরল তখন সকাল হয়ে গেছে, চারদিক রোদে ঝলমল করছে। শান্তিল আমার পাশে ম্লানমুখে বসেছিল। সংঘিলের কথা জিজ্ঞেস করতে সে অনেক কষ্টে বলল, সংঘিল আর আমাদের মধ্যে নেই। অন্যদিকে দেখলাম প্রচুর হতাহত লোক পড়ে আছে আর হামলাকারীরা লুণ্ঠিত মালপত্র গোছাতে ব্যস্ত। আমার জ্ঞান ফিরতে দেখে তাদের মধ্য থেকে দুজন আমার পাশে এসে বসল। বুঝলাম তারা আমাকে এরকম অবস্থায় ফেলে যেতে রাজি নয়। শান্তিলের সঙ্গে আগেই তাদের অনেক কথা হয়েছে এবং আমার পরিচয়ও তারা জেনেছে। একজন উঠে গিয়ে দলনেতাকে ডেকে আনল। দলনেতা আমার কাছে এসে বলল, আপনি আহত হওয়ায় আমরা খুবই দুঃখিত। আপনার সঙ্গী বেগ কোনো তুর্ক নয় এক অবার রাজকুমার। সে ছদ্ম পরিচয়ে ছিল কিন্তু আমরা শত্রুদের সমস্ত খবর রাখি এবং কখনোই ছেড়ে দিইনা। আমার ওপরে আদেশ ছিল বেগকে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ধরে নিয়ে যেতে হবে, আপসোস তাঁকে জীবিত পাইনি। তাঁর সমস্ত সম্পদ, স্ত্রী পরিবার এখন আমাদের অধিকারে। আপনাকে আমরা এ অবস্থায় ছাড়তে পারিনা। আমাদের কআন এবং যবগু ভিক্ষুদের অত্যন্ত মান্য করেন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তাঁরা অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।

যাযাবরদের ভূমিতে (৫৫৫-৫৫৬ খ্রিঃ)

আমাদের যাত্রাপথ এমনভাবে বদলে গিয়েছিল যে মাসাধিক কাল ধরে আমরা বুঝতেই পারিনি যে কোন দিকে চলেছি। শান্তিল যে নিহত অবার রাজকুমারেই পুত্র এটা তুর্করা বুঝতে পারেনি। শান্তিলের চেহারায় তার বাবার চেয়ে মায়ের সঙ্গেই বেশি মিল ছিল। যদি শান্তিলের পিতার কোনো অনুচর জীবিত থাকত তাহলে হয়তো এই রহস্য ভেদ হবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তুর্করা তাদের কাউকেই জীবিত রাখেনি।

তুর্ক সর্দারের ব্যবহারে শিষ্টাচারের অভাব ছিলনা, তার লোকজন আমাকে সাবধানে বহন করে নিয়ে চলেছিল। চলতে চলতে বেগ বলছিল– বহুকাল আমরা তুর্করা অবারদের দাস ছিলাম, এখন আমাদের রাজত্ব। অবারদের রাজত্বকালে তোমরা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করেছ। তোমরা শান্তিপ্রিয় লোক। যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করো না, হাতিয়ার দিয়ে আত্মরক্ষা পর্যন্ত করো না। তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো শত্রুতা নেই। তোমাকে আমরা আমাদের যবগুর কাছে নিয়ে যাব, সে তোমাদের সযত্নে রাখবে। আমার ক্ষতস্থান শুকোয়নি। বেগের চিকিৎসকেরা আমার আঘাতের চিকিৎসা করছিল। অনেক পথ ঘুরে অবশেষে আবার সেই হামিনগরীতেই ফিরে এলাম। নগরীর বাইরে এক রাত্রি কাটিয়েই বেগ পাঁচজন সওয়ারের সঙ্গে আমাদের নিয়ে রওনা হলো তার যবগুর উদ্দেশে।

তখনো জানিনা যে শান্তিলের মায়ের কি হয়েছে। স্বামীকে হত্যা করার পর আক্রমণকারীরা তাঁকে নিজেদের জন্য রেখে দেবে এটাই নিয়ম তবে তাঁর বয়স হয়েছে দেখে হয়তো ছাড় পেতে পারেন। পরে জেনেছি তিনি তাঁর পিত্রালয়ে চলে যান এবং সারা জীবন ভিক্ষুণী হয়ে কাটান। ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা শান্তিলের পক্ষে অত্যন্ত মর্মভেদী ছিল।

হামি থেকে যে পথে আমরা চলেছিলাম সেখানে বেশ জলকষ্ট ছিল। তুর্করা সমস্ত গ্রাম, বসতি ধ্বংস করে চারণভূমিতে পরিণত করার ফলে যেখানে সেখানে জল পাওয়া যেতনা। আমার সমস্ত ক্ষত নিরাময় হতে অনেক সময় লাগল। চিকিৎসা বিদ্যার কিছুটা আমার জানা ছিল উপরন্তু একজন দক্ষ চিকিৎসক দীর্ঘকাল আমার যাত্রা সঙ্গী ছিল। আমি নিজেই শান্তিলের সাহায্যে ক্ষতে নিজের ঔষধ প্রয়োগ করি এবং তাতেই সুস্থ হয়ে উঠি।

একটা ছোট পার্বত্য নদীর উৎস ধরে আমরা পাহাড়ের ভিতরে প্রবেশ করলাম। বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত জায়গা থাকা সত্ত্বেও বিশ্রাম নেওয়া হলো না, বেগের তাড়া ছিল। দু-তিন দিনের মধ্যেই সেই পাহাড় পার হয়ে এক বিশাল হ্রদের দক্ষিণপূর্ব কিনারার বরকুল নগরীতে পৌছালাম। নগরীর উত্তর এবং দক্ষিণে একই আকৃতির দুটি পাহাড় আছে। একটিকে আমরা অতিক্রম করে এসেছি এবং পাহাড়ের ওপর থেকেই বরকুল নগরীকে দেখতে পেয়েছিলাম। মরুভূমির মধ্যে এরকম একটি বিশাল হ্রদের অবস্থান একথাই জানান দেয় যে হ্রদের জল লবণাক্ত। আমার কেবল মনে হচ্ছিল যে সিংহলের ব্যাধ জাতির সঙ্গে যাযাবরদের জীবন যাত্রার বেশ কিছু মিল আছে। ব্যাধেরাও ঘর বাড়ি

নির্মাণ করেনা, চাষ-আবাদ করে না, শিকার আর ফলমূলের ওপরেই নির্ভর করে এবং গ্রাম ও নগরবাসীদের প্রতি সুযোগ পেলেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। যাযাবরেরাও অনেকটা সেই রকম। তবে অমিলও কম নয়। যাযাবরেরা নাগরিক জীবনের সঙ্গে যেভাবে পরিচিত ব্যাধেরা সেভাবে নয়। যাযাবরেরা পশুপালকের ওপরে এখনো উঠতে পারেনি বা উঠতে চায়নি কারণ তারা চাষবাসকে ঘৃণা করে। কিন্তু শিল্পকলা সম্বন্ধে এরা খুবই আগ্রহী। বয়ন এবং অন্যান্য শিল্পে এদের নৈপুণ্য অন্য জাতির ঈর্ষার কারণ হতে পারে। ধাতুশিল্প সম্পর্কে এদের জ্ঞান বেশ উন্নত আছে। তুর্করা প্রথম দিকে অবারদের অলতুন ইইশ (সুবর্ণগিরি)-এর দক্ষিণে লোহার খনিতে কাজ করত। পাহাড়টির সুবর্ণগিরি নাম সার্থক, কারণ এর উত্তরাংশে অনেক বড়ো বড়ো সোনার খনি আছে।

হ্রদের কিনারায় বরকুল ছিল আমাদের যাত্রাপথের শেষ নগরী। বরকুলে সংঘারাম ছিল, ভিক্ষু ছিল তবে তুর্কদের চেয়ে কুচী অঞ্চলের লোক বেশি ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল বণিক এবং শিল্পকার। নগরীর উপকণ্ঠে কয়েকটি গ্রাম ছিল যেখানে সামান্য চাষ-আবাদ হয়। বরকুল থেকে বের হয়ে পশ্চিম দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি কিছুদূর গিয়ে সৌগ্দীগামী পথের সঙ্গে মিশেছে। সেজন্যই বরকুলে বেশ কিছু সৌগ্দী বণিকও আছে। আরেকটি পথ উত্তরে পাহাড়ের সোনার খনির দিকে গিয়েছে। সেই পথে যাতায়াতের অনেক বিধি নিষেধ ছিল। তুর্ক এবং তার আগে অবার এরা কেউই চায়নি যে বাইরের লোক তাদের সোনার খনির সন্ধান জানুক। সোনাই বোধ হয় পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি যুদ্ধের কারণ। যাযাবরেরা যুদ্ধ লাগলে তাদের তাঁবুর বসতি, পরিবার পরিজন, পশুপাল সবই স্থানান্তরে সরিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু সোনার খনিকে সরিয়ে অন্যত্র নেওয়া যায় না। এখন যারা সোনার খনিতে কাজ করে তাদের অধিকাংশই তুর্কদের দাস।

বরকুল থেকে আমরা উত্তরপূর্ব দিকে যাত্রা করেছিলাম। যে পাহাড়টিকে মনে হয়েছিল অত্যন্ত কাছে আদতে সেটি ছিল অনেক দূরে। স্বচ্ছ ধূলিহীন মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ আর হালকা বাতাসে এরকম বিভ্রম হয়ে থাকে। সম্মুখের ভূমি ছিল সমতল, মাঝে মধ্যে ফরাসের গাছ কিংবা অন্য কোনো গুল্ম। ফরাস গাছ আমি মথুরার কাছেও দেখেছি যদিও সেখানকার মাটি বালুকা প্রধান নয়। এখানেই একটি জায়গা বেছে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হলো। উটেরা এই ফরাস গাছ খেতে খুব পছন্দ করে। ভারতের উটের পিঠে একটি করে কুঁজ থাকে। কিন্তু এখানকার উটের আছে দুটি। এদের শরীরের লোক অত্যন্ত নরম, এবং তা থেকে বোনা বস্ত্র স্থানীয় অধিবাসীদের খুব প্রিয়। সমতল ভূমিতে চাকা লাগানো উট বা অশ্বচালিত শকটও দেখতে পেয়েছিলাম। আমরা দ্রুতগতিতে চলেছিলাম। একটা পাহাড়ের ওপরে উঠতে হলো, যেখানে হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা পেলাম। সঙ্গী বেগ এবং তার সহচরেরা সকলে চামড়ার পোশাক পরেছিল। বেগের পরনে ছিল হলুদ রঙের মৃগ চর্মের চোগা। মাথায় মৃগচর্মের কানঢাকা টুপি। হাঁটু পর্যন্ত নম্‌দের মোজা এবং জুতো। আমাদের ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে দেখে বেগ লোমশ চামড়ার চাদর এনে দিলেন। ভিক্ষুদের পক্ষে বারণ থাকা সত্ত্বেও আমাকে তুর্কদের দেওয়া ঘোড়ায় চড়েই এতদূর আসতে হয়েছে, কারণ বেগের তাড়া ছিল এবং পায়ে

হেঁটে বেগের দলবলের সঙ্গে তাল রাখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না, যদিও আমার ক্ষত নিরাময় হয়ে গিয়েছিল। পাহাড় থেকে আমরা এক তৃণভূমিতে নামলাম। দূর থেকেই আমরা তুর্কদের শিবির দেখতে পেলাম।

তুর্কদের শিবির অর্থে যবগুর শিবির। একটা জনশ্রুতি ছিল যে কআন মোযু খানের পর যবগুই কআন হবেন। তাঁর তাঁবুর সংখ্যা এত ছিল যে তার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা সব সময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারে। যাযাবরদের পরিবারকে এক অর্থে সৈনিক পরিবার বলা যায়। যবগু যখন যেখানে তাঁবুর নগরী গড়ে বাস করেন তখন সেটি হয়ে ওঠে একটি স্কন্ধাবার বা সেনা ছাউনি। যবগুর শিবিরটি অন্যান্যদের তাঁবুর চেয়ে আকারে ও আয়তনে বড়ো ছিল। প্রধান তাঁবুর সামনে সমতল ছাদের মতো আরেকটি তাঁবু যেটি রঙ-বেরঙের কাপড় দিয়ে তৈরি এবং যার মধ্যে সুন্দর সুন্দর সূচী শিল্পের কাজ বর্তমান। আমাদের পৌঁছাবার দুদিন আগে এখানে প্রচুর তুষারপাত হয়েছিল, এখনো তার চিহ্ন চারদিকে বর্তমান ছিল। আমার মনের মধ্যে তখন এক অদম্য কৌতূহল, যবগু আমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে। বেগ অবশ্য বলেছিল যে যবগুর মা বৌদ্ধ সেজন্যই সে ভিক্ষুদের যথেষ্ট সম্মান করে এবং আমাদের নিয়ে আসার আদেশও তাঁর। বেগ আরও বলেছিল– যদি তোমাদের না পেতাম তাহলে অন্য যে কোনো জায়গায় থেকে একজন ভিক্ষুকে ধরে নিয়ে আসতাম। চারদিন আগেই আমাদের আসার খবর যবগুর কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। যবগুর তাঁবু থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে আমাদের বেগের তাঁবু পড়ল।

পৃথিবীর রকমারি বৈচিত্র্য নানা দেশ না ঘুরলে জানা যায় না। সিংহলের অনুরাধাপুরে যখন ছিলাম, সেখানে তখন ঋতু পরিবর্তন দেখিনি। এক মাত্র বর্ষা হওয়া আর না হওয়াই ছিল ঋতু। শীত গ্রীষ্ম বলে আলাদা কিছু ছিল না। রাত্রিতে আকাশ পরিষ্কার থাকলে আমি উত্তরাকাশে ধ্রুবতারাকে দেখার চেষ্টা করতাম। উদ্যানে ধ্রুবতারাকে পেতাম মাথার ঠিক ওপরে। মনে হতো একটু ওপরের দিকে হাঁটলেই আরও কাছে চলে আসবে। এখানে দিন রাত্রির প্রভেদ ছিল অদ্ভুত। দিন খুব বেশি হলে এক দেড় প্রহর (চার পাঁচ ঘণ্টা) থাকত, তারপর সবটাই রাত্রি। বেগ আমাদের আসার খবর দিয়ে একজন দূতকে যবগুর শিবিরে পাঠাল। দূত ফিরে এসে জানাল যে যবগু পরদিন সকালে ভিক্ষুদের সঙ্গে মিলিত হতে চান। সেই রাত্রি অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ মনে হলো। যদিও ইদানীং আমাদের ওপরে সেভাবে নজর রাখা হচ্ছিল না, তবুও আমরা বন্দীই ছিলাম।

পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আহার শেষ করলাম। ভিক্ষুদের জন্য একাহারের নিয়মটি ভালো। সিংহলে সকালে প্রাতরাশ এবং দুপুরে ভরপেট আহার পেতাম। এখানে রাত্রি তাড়াতাড়ি হয় অতএব একাহারই সই। যবগুর দুই অনুচর দুটি সাদা ঘোড়া নিয়ে আমাদের শিবিরের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়াল। ঘোড়া দুটি সাধারণ তুর্ক ঘোড়ার চেয়েও বড়ো আকারের। চড়ার সময় সহিস ভরসা দিলো যে কোনো ভয় নেই, বিশেষ শিক্ষিত ঘোড়া। আমাদের সঙ্গী বেগও অনুরূপ একটি ঘোড়ায় চড়ে আমাদের সঙ্গ নিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা যবগুর শিবিরে পৌঁছে গেলাম। যবগু শিকারে

যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। দিন ছোট হওয়ায় সকালেই শিকারে বের হতে হয়। যবগুর পরনে মৃগচর্ম আর মখমল মিশ্রিত চোগা। দীর্ঘ চুল খোলা, কপালে একটা সাদা রেশমের ফেট্টি বাঁধা। যবগুর অনুচরেরা কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ বা উটের পিঠে সওয়ার ছিল।

যবগু আমার সঙ্গে কথা বলে বেশ খুশি হলেন, এবং পথের কষ্টের জন্য ক্ষমা চেয়ে বললেন– আপনি শুধু আমার অতিথিই নন, আমার শিক্ষকও। আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে আমার। তারপর একজন পার্ষদকে দেখিয়ে বললেন, আপনার যখন যা কিছু প্রয়োজন হবে একে বলবেন, এখন থেকে এ লোকটি আপনার সেবাতেই কেবল নিযুক্ত থাকবে। তারপর যবগু আমার কাছ থেকে করজোড়ে বিদায় চাইলেন। যবগুর পার্ষদ আমাদের থাকার জায়গাতে নিয়ে গেলো। দূর থেকে যে বিশাল তাঁবুটিকে আমরা দেখেছিলাম, এখন তার কাছে আসতেই তাঁবুর গায়ে সোনার কারুকাজে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলো। আমি যবগুর দরবার যেখানে বসে সেই তাঁবুটি দেখতে চাইলে অনুচরটি সানন্দে সেখানে নিয়ে গেলো। বিশ্বের অন্যান্য রাজা রাজড়ার দরবারের মতোই এই যাযাবর সর্দারের দরবারও নানা বৈভবে পরিপূর্ণ। তবে অন্য রাজদরবারের সঙ্গে এই দরবারের একটা বিশেষ পার্থক্য চোখে পড়ল, সেটা হলো দরবারে চিত্ত বিনোদনের জন্য মেয়েদের কোনো ভূমিকা নেই যদিও দরবারে যবগুর স্ত্রীরা উপস্থিত ছিল। দরবারে উপস্থিত সকলের চেহারাই ছিল বেশ বীরত্বব্যঞ্জক।

শীত শেষ হলো (৫৫৫-৫৫৬ খ্রিঃ)। এর আগে কখনও এত ঠাণ্ডা অনুভব করিনি। হিমালয়ের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অঞ্চল আমি গ্রীষ্মের মরসুমে অতিক্রম করায় তার তীব্রতা টের পাইনি। তাছাড়া চলার মধ্যে থাকার ফলে ঠাণ্ডা অতটা অনুভব করিনি। কিন্তু এখানকার ঠাণ্ডা যেন হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। যদিও আত্মগর্ব প্রকাশ করতে চাইনা, কিন্তু এটা ঘটনা যে যবগু আমার কাছ থেকে তথাগতর জীবন ও উপদেশ শুনে বুদ্ধভক্ত হয়ে যান, এবং বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের শরণ নিয়ে উপাসক হয়ে ওঠেন। যবগু অত্যন্ত বীর যোদ্ধা ছিলেন। অবারদের সঙ্গে নির্ণায়ক যুদ্ধে তিনি তাঁর কাকা তুমিনের হয়ে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। বীরত্ব ছাড়াও তাঁর মধ্যে এমন কতগুলো গুণ ছিল, যেগুলো সাধারণভাবে যাযাবরদের মধ্যে দেখা যায় না। তাঁর হৃদয় কোমল ছিল এবং এক অতৃপ্ত জ্ঞান পিপাসা সর্বদাই তাঁকে তাড়া করে ফিরত। যদিও উপরোক্ত গুণাবলীর সঙ্গে বীরত্বের কোনো সম্পর্কই নেই, তবুও রক্তের স্রোতের মধ্যে যাদের জন্ম, তার মধ্যেই লালিত পালিত এবং সেখানেই যাদের জীবনের অন্ত ঘটে সেরকম যাযাবর যোদ্ধাদের মধ্যে ওরকম গুণাবলী দেখতে পাওয়া আশ্চর্যের বৈকি। অবারদের কআনও বুদ্ধ ভক্ত ছিল, কিন্তু তুর্করা এতকাল তাদের লোকধর্মই মেনে চলত। যবগুর বক্তব্য ছিল যে তাঁদের পূর্বজ চীনদেশের সম্রাট তোবা বুদ্ধভক্ত ছিলেন। তিনি অনেক গুহা বিহার নির্মাণ করেছিলেন, যেখানে ভিক্ষুরা বাস করত। আজও সেই গুহা বিহার অটুট আছে। যবগুর সঙ্গে আমার অনেক বিষয়েই কথাবার্তা হতো, কিন্তু ভাষা খানিকটা প্রতিবন্ধকতার কাজ করত। আমি মোটামুটি কাজ চালানোর মতো তুর্ক ভাষা জানতাম, তা দিয়ে আর যাই

হোক অভিধর্মের (বৌদ্ধদর্শন) ব্যাখ্যা করা চলত না। তুর্কভাষার কোনো পুঁথিপত্র পেলে না হয় শান্তিলের সাহায্যে একটা শব্দকোষ তৈরি করার চেষ্টা করতাম। যবগুর রাণীও, স্বামীর প্রতি ভালোবাসার কারণে নাকি স্বইচ্ছায়, বুদ্ধের ভক্ত হয়েছিলেন। তাঁর আরেকটি শখ ছিল, আমার মুখ থেকে আমার সুদীর্ঘ ভ্রমণ বৃত্তান্ত শোনা।

প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমার লক্ষ্য হবে চীনদেশ, যেখানে গিয়ে গ্রন্থ অনুবাদের কাজে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করব। আমার জানা ছিল যে আমার দেশের অনেক মহান ব্যক্তি অতীতে সেই পূণ্য কাজ সমাপন করেছেন। বেশ কিছু তালপাতার পুঁথি আমি উদ্যান থেকেই সঙ্গে এনেছিলাম। বুদ্ধিলের নিজের হাতে লেখা 'প্রমাণ সমুচ্চয়' তো আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল। অভিধর্মকোষের সমস্ত সূত্র আমার কণ্ঠস্থ ছিল। 'যে বিদ্যা কণ্ঠস্থ থাকে কেবল তাই নিজের' এই আপ্ত বাক্য স্মরণে রেখে আমি অনেক গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করেছিলাম। আমার আনা সমস্ত গ্রন্থই রক্ষা পায়নি। সংঘিলের সঙ্গে বেশ কিছু গ্রন্থকেও আমি হারিয়ে ছিলাম। কেবল মাত্র আমার শরীরের সঙ্গে বাঁধা কিছু গ্রন্থ রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলাম।

যবগু এবং তাঁর স্ত্রী যখন আমার কাছে আমার ভ্রমণ কাহিনি শুনতে চাইতেন, তখন আমার নিজের জন্মভূমির কথা মনে পড়ত। যাযাবরদের মাতৃভূমির প্রতি সেরকমভাবে কোনো টান থাকে না। মাঝে মধ্যেই উদ্যানের সেই রমণীয় মাটির কথা মনে পড়ত। আর মনে পড়ত সিংহল দ্বীপের কথা যেখানে আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে হারিয়েছি আর এখন রয়েছি ছোট ছোট পাহাড় আর তুষারাবৃত অত্যন্ত ঠাণ্ডা এক অঞ্চলে। যবগুর আতিথেয়তায় ভালোই ছিলাম। কিন্তু এভাবে থাকা তো আমার জীবনের উদ্দেশ্য নয়, আমার জীবনের উদ্দেশ্য চীন দেশে যাওয়া। সেখানে যেতে না পারলে এখানে সমস্ত সুখ ও আরামের মধ্যে থেকে আমার কি লাভ? মাঝে মধ্যে মনে হতো, হয়তো চিরটা কালই কেটে যাবে এই যাযাবরদেও মধ্যে, জীবনের লক্ষ্য কোনো কালেই আর পূর্ণ হবেনা। তবে যাযাবরদের সান্নিধ্যে এসেও এক অজানা অচেনা জগতের সন্ধান পেয়েছিলাম। আমার কাজ ছিল তুর্ক ভাষায় 'অভিধর্ম কোষের' অনুবাদের চেষ্টা করা আর শান্তিলের সঙ্গে বসে ভবিষ্যতের পরিকল্পনার করা। শান্তিল বয়সে আমার চেয়ে ছোট হলেও তার ব্যবহারিক জ্ঞান আমার চেয়ে বেশি ছিল। সে বলত– 'এ অঞ্চলে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকে, হয়তো আবার এমন একটা দিন আসবে তখন আমিও আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।' তার কথার উত্তর আমার কাছে ছিল না, তাই আমি আমার কাজ অর্থাৎ অনুবাদের কাজেই মন দিয়েছিলাম। এদেশে তালপাতা পাওয়া যায় না, কিন্তু ভূর্জপত্র পাওয়া যায়। এমনিতে তুর্ক যাযাবরেরা লেখাপড়ার ধার ধারেনা। কিন্তু অবারদের বিশাল সাম্রাজ্যের (কোরিয়া থেকে কাস্পিয়ান সাগর) দখল পাওয়ার পর থেকে রাজ্য চালানোর জন্য কিছু লেখাপড়া জানা লোকের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। যবগু আমাকে তুর্ক লিপিতে লিখতে দেখে তিনিও অক্ষর পরিচিত হতে চাইলেন। মনে হতে পারে এ তো অতি সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুব সহজ ব্যাপার ছিলনা। তুর্ক ভাষায় একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উচ্চারণও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন রাজাকে এখানে কগান উচ্চারণ করে, কেউবা ঘকান,

কেউ কআন কিংবা কান উচ্চারণ করে। এরকমভাবে যবগু নামেরও অনেক উচ্চারণ হয়। আবার সমস্ত তুর্ক জাতির মধ্যেও সম উচ্চারণের ভাষা সর্বত্র ব্যবহৃত হয়না। সমস্ত বিষয় দেখে আমার মনে হয়েছিল মাত্র সতেরোটি অক্ষর দিয়েই তুর্ক বর্ণমালা তৈরি করা সম্ভব।

শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে তুষারের বিস্তৃত গালিচা আরও পুরু হচ্ছিল। হিমবৃষ্টি আমার কাছে নতুন ছিলনা, কিন্তু এখানে তার রূপ ছিল ভয়ংকর। তুষারপাতের সময় সমস্ত প্রকৃতিই যেন কর্পূরশ্বেত বর্ণ ধারণ করে। আমাদের তাঁবু ছিল সাদা রঙের নম্‌দার তৈরি। তার ওপরে কয়েক আঙুল পুরু হয়ে তুষার জমত, দেখে মনে হতো নমদার কাপড়ই পুরু হয়ে গেছে। পরিচারক এসে তুষার ঝেড়ে দিত। তাঁবুর মধ্যে আমরা তখন আপাদমস্তক কোমল মৃগচর্মে ঢেকে, আগুন জ্বেলে বসে কথাবার্তা বলতাম। দিন ছিল মাত্র এক দেড় প্রহরের আর বাকি সময়টা দীর্ঘ রাত্রি। এই বিশাল দীর্ঘ রাত কাটানোই ছিল কষ্টের। সকলেই উদগ্রীব হয়ে বসন্তের প্রতীক্ষা করত। সে বছরের শীতকে আমার দীর্ঘতম শীত ঋতু বলে মনে হয়েছিল। অবশেষে পাঁচমাস পর বসন্তের আবির্ভাব হলো।

যবগু আমার সঙ্গে বসন্তকাল অন্য কোথাও কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমাকে শ্যামলভূমি আর অরণ্যের জন্য আক্ষেপ করতে দেখে যবগু বলতেন এখান থেকে উত্তরে দেবদারু আর ভূর্জপত্রের গাছের এত গভীর অরণ্য আছে যা তোমার চিন্তার বাইরে। আমি কি ধরনের অরণ্য দেখেছি তা যবগুর জানা নেই, আবার তাঁর কথিত গভীর অরণ্যের কথাও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা সম্ভব ছিলনা। আমি সঙ্গে না থাকলে যবগু হয়তো তাঁর কআনের সঙ্গে দেখা করার জন্য পশ্চিম দিকে যেতেন কিন্তু আমার জন্য তিনি উত্তরে যাত্রা করা স্থির করলেন। উত্তরে তাঁর রাজত্বের ভৌগলিক সীমা সম্বন্ধে তাঁর নিজেরও কোনো ধারণা ছিলনা। সেই গভীর অরণ্যে তুর্ক ছাড়া অন্য জাতির লোকেরও বাস ছিল। তারা তাদের স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল যা সম্পূর্ণভাবে শান্ত হয়নি। যবগু অবশ্য তার জন্য স্থানীয় লোকদের চেয়ে নিজের লোকেদেরই বেশি দায়ী করতেন। তিনি বলতেন কঠোর দণ্ড বিধান করেই শুধু শাসন পরিচালনা করা যায় না। অথচ আমাদের লোকেরা তাই করছে। যবগুর কয়েক সহস্র তাঁবু যাত্রা শুরু করল। যাযাবরেরা লেখাপড়া না জানলেও চাঁদের কলার হ্রাস বৃদ্ধির নিয়ম জানত এবং সেইভাবে মাসের গণনা করত। কিন্তু ঋতু পরিবর্তনের বিষয়টি সৌরমাসের নিয়মে চলে, চান্দ্রমাসের নিয়মে নয়, একথাটা যবগুকে বোঝাতেই তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আমি জানতাম যে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিত শেখা এত সহজে হয়না সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, সেজন্যই তাঁকে বিষয়ের খুব গভীরে না নিয়ে গিয়ে সাধারণভাবে বিষয়টি বুঝিয়েছিলাম।

আমাদের যাত্রাপথ মরুভূমির মধ্য দিয়ে ছিলনা, কিন্তু চারদিকের গাছপালা শূন্য প্রকৃতি প্রতিমূহূর্তে মরুভূমিকেই মনে পড়াচ্ছিল। অনেকগুলো ছোটখাটো নদী পার হবার পর পশ্চিমদিকে বিশাল এক প্রবাহিত নদী দেখলাম, যার জল ছিল স্বচ্ছ নীলাভ রঙের। স্নান করাটা যাযাবরদের কাছে সৌখিন বিলাস। শীতের সময় বাদ দিলে,

শরীরে অল্পস্বল্প ঘাম হয় এবং কাছে গেলে অস্নাত শরীরের দুর্গন্ধ টের পাওয়া যেত। এখানে সামনে প্রবাহিত নদী, রোদের তেজও ছিল যথেষ্ট, অতএব আমরা দুজন নদীতে নেমে মহানন্দে স্নান করলাম। জল ভালোই ঠাণ্ডা ছিল। যবগুও আমাদের দেখাদেখি স্নানে উৎসাহী হলেন। দেখতে দেখতে যবগুর অনুচরের দল এমনকি ছোট ছোট বাচ্চা ছেলেরাও মহানন্দে নদীতে ডুব দিয়ে স্নান করল। পরনের পোশাক তীরে রেখে সকলে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল। বালক, যুবা কিংবা প্রৌঢ় সকলেই ছিল নগ্ন, কিন্তু কারও শরীরই স্থূলকায় অথবা উদরের আধিক্য ছিলনা। ইতিপূর্বে আমি স্ত্রী পুরুষের নগ্ন হয়ে স্নান করা দেখে বিশেষ বিস্মিত হইনি।

নদী পার হয়ে এরই একটি ছোট উপনদীর উজান ধরে আমরা এক পাহাড়ে (খংচাই) পৌছালাম। আমার দেশের মতো অত দীর্ঘ দেবদারু গাছ সেখানে দেখতে পাইনি, কিন্তু গাছগুলোকে খুব কাছাকাছি নিবিড় সন্নিবিষ্ট দেখেছিলাম। বৃক্ষহীন প্রান্তরে বসবাসকারি যাযাবরেরাও গ্রীষ্মের উত্তাপের মধ্যে এরকম একটি সবুজ অরণ্য দেখে বেশ অবাক হয়েছিল। পশুপালের মধ্যে উটের সংখ্যা কমে গিয়ে তার জায়গা নিয়েছিল চমরী গাই। মধ্যদেশে মোষ জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে এর আকৃতিগত মিল আছে। এদের গায়ের লোম এত দীর্ঘ হয় যে মাটি স্পর্শ করে। এদের দুধ, মাখনে পুষ্টিও বেশি, মাংসও সুস্বাদু। পোষ মানা চমরী ছাড়া বন্য চমরীও এখানকার অরণ্যে দেখতে পাওয়া যায়, যাদের আকৃতি আরও বড়ো। আমাদের যবগু বন্য চমরী শিকারে খুব উৎসাহী ছিলেন। তবে পালিত চমরী যতই শান্ত হোক না কেন, বুনো চমরী মোটেই তেমন নয়, তাদের শিকার করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। হাতির মতো বিশাল আকার, তার ওপরে মাথায় তীক্ষ্ণ এবং দীর্ঘ শিঙ, যার স্পর্শ মানে অবধারিত মৃত্যু। দু-একটা তীরে এরা ঘায়েল হয় না। তবে যাযাবরেরাও দক্ষ শিকারী। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে বসেই লক্ষ্য ভেদ করতে পারে। পঞ্চাশজন মানুষের সমান শক্তি থাকা সত্ত্বেও বুনো চমরীকে সেই সাড়ে তিন হাত মানুষের কাছে হার মানতেই হয়। অরণ্য যত বেশি গভীর বুনো জন্তু জানোয়ারের সংখ্যাও সেখানে বেশি। বুনো চমরী ছাড়া, ভালুক, দুষ্প্রাপ্য হরিণ (সমুর) ইত্যাদি জন্তুও শিকার করা হতো। শিকারে যবগুর অনুচরেরাও উৎসাহী ছিল কারণ অরণ্যে প্রচুর সহজলভ্য পশুখাদ্য পাওয়া যেত আর মানুষের জন্য পাওয়া যেত তাজা মাংস। শিকার ব্যক্তিগত এবং সামুহিক দুই জাতীয় হতো। তবে সামুহিক শিকারই বেশি সাফল্য লাভ করত। আপাদমস্তক সশস্ত্র সাজে সজ্জিত হয়ে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত বনভূমিকে বৃত্তাকারে ঘেরাও করে, তারপর বিকট আওয়াজ করে বৃত্তকে ছোট করে আনত। ভীত সন্ত্রস্ত বন্য পশুর দল বৃত্তের কেন্দ্রে জমা হতো, আর তাদের চারদিকে থাকত মানুষের প্রাচীর। জন্তুদের মধ্যে যাদের ক্ষমতা থাকত তারা সেই প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা করত। তবে চমরী গাই ছাড়া আর কেউ বিশেষ সেই প্রাচীর ভাঙতে সমর্থ হতো না। যেদিন সামুহিক শিকার হতো সেদিন তাঁবুর সামনে মৃত পশুর স্তূপ জমে উঠত। শিকারের পর হতো উৎসব। ঘোড়ার দুধের তৈরি মদিরা পান চলত যথেচ্ছভাবে তার সঙ্গে ঝলসানো মাংস।

পাহাড় অতিক্রম করে আমরা আবার এক মহানদীর (সেলিঙ্গা) কিনারায় পৌছালাম। এখানে যে রমণীয় দৃশ্যাবলী আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল তা হিমালয়ের নৈসর্গিক দৃশ্যের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না। চারদিকে কয়েকটি ছোট পাহাড়। ডানদিকে অবশ্য একটা হিমাচ্ছাদিত শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছিল, যা আমাকে উদ্যানের কথা মনে পড়িয়েছিল। আমাদের দেশে যেমন হিমাচ্ছাদিত পর্বতচূড়াকে কোনো দেবতার বাস মনে করা হয় এখানেও তেমনিভাবে হিমশিখরকে (বোগদাউলা, উলুসতুই) পবিত্র মনে করে। যদি না যবগু ত্রিশরণ নিয়ে বুদ্ধ হয়ে যেতেন, তাহলে দেবতার সম্মানে একটি সাদা ঘোড়াকে অবশ্যই বলি দিতেন। তবে যবগু না দিলেও তাঁর অনুচরেরা একটি ছোট সাদা ঘোড়াকে দেবতার নামে তরবারি দিয়ে হত্যা করল। তুর্কদের ঘোড়া আকারে একটু ছোট হয়। এই জাতীয় ঘোড়াগুলির খাদ্য গ্রহণ কম, অথচ তৃণভূমি কিংবা পাহাড় সর্বত্র দ্রুত গতিতে ছুটতে পারে। কম্বোজ কিংবা বাহল্যিক দেশের ঘোড়া বেশ বড়োসড় হয়। শোভা বাড়ানোর জন্য ওরকম ঘোড়া যবগুও কয়েকটি রেখেছিলেন। এরা দেখতে খুবই সুন্দর, গায়ের রঙ লাল, সাদা অথবা নানা রঙে চিত্র বিচিত্র। সমতল ভূমিতে এই ঘোড়াগুলো হূণদের ঘোড়ার চেয়েও দ্রুত ছুটতে পারে কিন্তু স্বভাবে শান্ত প্রকৃতির হয়। তুর্করা এগুলিকে বলে বুসুম (শক) ঘোড়া।

আমাদের পরবর্তী পথ ছিল সেই মহানদী সেলিংঙ্গার কিনারা ধরে পূর্বোত্তর দিকে। যেমন যেমন এগিয়ে চলেছি তেমন তেমন বনস্পতির শ্রীবৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছি। যবগু প্রথমে যখন বলেছিলেন তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়নি এখন স্বচক্ষে সেই অনন্য সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হলাম। পাহাড়গুলো বেশি উঁচু না হওয়ায় সহজেই ওঠা সম্ভব হয়েছিল। সমস্ত পাহাড়ই চিরহরিৎ দেবদারু গাছে ভরা আর তারই মধ্যে মধ্যে সাদা বল্কলের ভূর্জ গাছের সহাবস্থান। মহানদীর উত্তরে জংলি লোকদের (যাকৃত এবং করগিস) এলাকায় পৌছাবার পর তারা মহার্ঘ মৃগচর্ম, মধু এবং কিছু সোনা উপঢৌকন নিয়ে যবগুর কাছে এল। এমনিতেই যবগু উদার চিত্তের লোক ছিলেন, তার ওপরে বুদ্ধ উপাসক, আগন্তুকদের যথেষ্ট বিনয় এবং সম্মান দেখালেন। যবগুর অনুচরেরা অবশ্য যবগুর আচরণে অখুশি হয়ে বলাবলি করছিল যে এরা চমরী বা ভালুকের চেয়ে কম হিংস্র নয়। আমাদের প্রভুর সঙ্গে এরা বিশ্বাসঘাতকতা করবেই। আমি এবং শান্তিল তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করতাম না। যদিও শান্তিল বলত, যবগুর নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা উচিত। আমরা উত্তরের দিকে সেই অরণ্যচারীদের ভূমিতে চলে এসেছিলাম, যারা মালপত্র পরিবহনের জন্য বল্গা হরিণ ব্যবহার করে, এরা তুষারাবৃত অঞ্চলে থাকার জন্য কুকুরে টানা দুচাকার গাড়িও ব্যবহার করে। লৌহ নির্মিত হাতিয়ার এরা তুর্কদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে। এদের তাঁবু থেকে আরম্ভ করে পোশাক পরিচ্ছদ সবই চামড়ার তৈরি এবং এদের আহার্য মাংস।

মহানদী থেকে খানিকটা দূরে কয়েকটি সবুজ পাহাড়ের মাঝখানে একটা হ্রদ ছিল। একদিনে যবগু বুঝে নিয়েছিলেন যে নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী আমি বিশেষ পছন্দ করি। সেজন্য তিনি একদিন কয়েকজন অনুচর এবং আমাদের দুজনকে নিয়ে হ্রদের কাছে গিয়েছিলেন। হ্রদের বুকে হাজার হাজার পাখির মেলা। ভারতেও দেখেছি শীতকালে

কোনো কোনো অঞ্চলে জলাশয়ের ধারে এরকম পাখির মেলা বসে। শীতকালে এই সব পাখিরা উত্তর থেকে দক্ষিণে আসে আবার গরম পড়লে তাদের পুরানো জায়গার দিকে ফিরে যায়। তুর্করা এই পরিযায়ী পাখিদেরও শিকার করত, কিন্তু এবার যবগু পাখি শিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আহার্যের প্রয়োজনে যদি প্রাণী হত্যা একান্তই জরুরি হয়ে পড়ে তাহলে এমন একটি প্রাণীকে বেছে নেওয়া উচিত যাদের একটির মৃত্যুতেই শতাধিক লোকের ক্ষুধা মিটতে পারে। এমন প্রাণী হত্যা করা কখনোই উচিত নয় যাদের একাধিক মিলিয়েও হয়তো একজনের ক্ষুন্নিবৃত্তি হবেনা, যদিও আমি তুর্কদের মধ্যে অনেককে দেখেছি এক একটা আস্ত ভেড়া খেয়ে ফেলতে। এরকম লোকেদের কয়েকটি পাখি বা দু-একটি মাছে কি হবে? এখন দিন বড়ো এবং রাত্রি ছোট ছিল। দিনের পড়ন্ত বেলা, অনুচরেরা ফেরার তাড়া দিচ্ছিল, কিন্তু চারিদিকের পরিবেশ এতই শান্ত, মনোমুগ্ধকর ছিল যে সে জায়গা ছেড়ে চলে আসতেও ইচ্ছে করছিল না। আমাদের সঙ্গে ছিল পঞ্চাশ জন অনুচর অতএব নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু মার্জারের মতো নিঃশব্দ চরণে একদল বুনো কখন যে আমাদের কাছাকাছি চলে এসেছিল টের পাইনি। কাউকে হাতিয়ার তোলার অবকাশ মাত্র না দিয়ে তারা আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহত করে কাউকে নিস্কৃতি দেওয়া এদের অজানা, আর তুর্করাও যেভাবে পারল আত্মরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেখানে প্রতি একজনে দশজন সেখান শুধু বীরত্বে কাজ হয়না। আর আমরা দুজন তো ভিক্ষু, অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ। তাছাড়া তুর্কদের শত্রুদের সঙ্গে আমাদের কোনো বৈরিতা ছিলনা, অতএব আমরা নীরবে রক্তপ্রবাহ দেখতে লাগলাম। আমাদের সঙ্গীরা লড়তে লড়তে জঙ্গলে ঢুকল, এমন সময় হ্রদের বুকে অনেকগুলি নৌকা দেখতে পেলাম। লম্বা লম্বা গাছের মাঝখানের অংশ তুলে ফেলে নৌকাগুলো তৈরি এবং তার প্রত্যেকটিতে পনোরো-কুড়িজন লোক তীর ধনুক নিয়ে বসে। পারে নেমে তারা যবগুর ছোট তাঁবুতে ঢুকে পড়ল। হ্রদের কিনারায় রাত্রিবাসের কোনো পরিকল্পনা ছিলনা, সে জন্যই সাধারণ কয়েকটি তাঁবু আর আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছু আনা হয়নি। তারা বিকট শব্দ করতে করতে আমাদের কাছে এল। প্রতি মুহূর্তে ভাবছিলাম, এবার আমার যাত্রা মহাযাত্রায় পরিণত হবে। কিন্তু তাদের একজন কাঁধে তরবারির বদলে হাত রাখল। আমরা কেউ পরস্পরের ভাষা জানতাম না, এমনকি তুর্ক ভাষা জানে এমন কেউও তাদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু ইঙ্গিত মানুষের কাছে এক অপূর্ব ভাষা। সেই ভাষাতেই সে আমাকে বলল,–ভয় পেওনা।

শীত সমুদ্র এবং মহা মরুভূমি (৫৫৬–৫৫৭ খ্রিঃ)

সেই আরণ্যক মানুষদের কাছে আমার কোনো আশাই ছিলনা, কারণ এদের হিংস্রতার অনেক কাহিনিই শোনা ছিল। তবে তাদের ইঙ্গিত দেখে মনে হলো হয়তো সব আশা শেষ হয়নি। তারা আমাদের তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিলো। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তেই যাত্রা করা আমাদের কাছে একই ব্যাপার আর এরকম যাত্রার সুযোগতো খুব

কম পর্যটকের ভাগ্যেই জোটে। হ্রদের কিনারায় তাদের নৌকা নোঙর করা ছিল। আমরা আমাদের জিনিস পত্র, তার মধ্যে কয়েকখানা গ্রন্থও ছিল, পিঠে বেঁধে তাদের সঙ্গে চললাম। যবগু এবং তাঁর সঙ্গীদের এরা ধরতে পারলে জীবিত রাখবে না, এটা বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমরা তাঁদের কিই-বা সাহায্য করতে পারতাম? আমরা নৌকায় বসার পর তীর গতিতে উত্তরদিকে চলল। এ দিকটায় অরণ্য এত ঘন মনে হয় যে কোনো কোনো জায়গায় জীবনে কখনও সূর্যের আলো ঢোকেনি। তবে সূর্যের আলো না ঢুকলেও তাপ ঢোকে আর তাতেই তুষার গলে সবুজ ঘাস জন্মেছে। এই অরণ্যের মধ্যে সঠিক পথ চিনে চলা একমাত্র এদের পক্ষেই সম্ভব। তুর্করা মরুভূমিতে পথ চিনতে পারে কিন্তু এই গভীর অরণ্যে তারাও অসহায়। আমাদের সঙ্গে দশজন বনচর ছিল, অবশিষ্টরা তাদের সঙ্গীদের সাহায্যের জন্য থেকে গিয়েছে। দিন দীর্ঘ হওয়ায় তখনও দিনের আলোর রেশ মিলিয়ে যায়নি। জঙ্গলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি ঘটল। লোহা এবং চকমকি পাথর ঠুকে তারা আগুন জ্বালল। আগুন জ্বালার কারণ যাতে বুনো জন্তু জানোয়ার এদিকে না আসে। তারা কাঁচা মাংস খেতেই অভ্যস্ত এবং তা থেকে আমাদেরও খানিক দিতে চাইল। আমরা যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলাম। শরীরে ক্লান্তি ছিল অতএব সেই বিশ্রামের জায়গাতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখলাম শতাধিক লোক সেখানে উপস্থিত হয়েছে।

আমরা কেবল নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারছি, আর ওদের সঙ্গে আলাপ-চারিতা চালাতে হচ্ছে আকারে ইঙ্গিতে। এবং এরকমই চলবে, যতদিন না ওদের ভাষার কিছু শব্দ শিখতে পারি। ওরা নিজেদের মধ্যে খুব হাসাহাসি করছিল। আমরা দুজনে নিজেদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় কথা বলছিলাম। ভয়ে তুর্ক ভাষা বলিনি, কারণ সেই ভাষা এদের কারও জানা থাকতে পারে। পৃথিবীর উত্তর সীমান্তের কাছাকাছি (সাইবেরিয়া) এই অরণ্যে আমরাই বোধ হয় প্রথম কেউ যারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলল। বারবার আমার যবগুর কথা মনে হচ্ছিল। তাঁর মতো ভদ্রসজ্জন আমি কমই দেখেছি। বনচরদের মধ্য থেকে একজন আমাদের কাছে এসে তুর্ক ভাষায় বলল,– তোমাদের কোনো ভয় নেই, ওঠ আমরা এখন রওনা হব। আবার আহারের কথা উঠল। আমরা বললাম, দ্বিপ্রহরের পর আমরা আর আহার করিনা। আমাদের পরনে ছিল তপ্ত তামা রঙের মোটা পশমী সংঘাটি আর সেই রঙেরই চীবর। এরকম পোশাকও বোধ হয় তারা এই প্রথম দেখল। এদের মুখে দাড়ি গোঁফের চিহ্ন মাত্র নেই এবং মাথার চুল জীবনে কাটা হয়নি। আমাদের মুখাবয়বেও তাদের মতো মঙ্গোলীয় ধাঁচ ছিলনা। এরা এদের জাতির বাইরের লোক বলতে তুর্ক আর অবারদেরই এ যাবৎকাল দেখে এসেছে যাদের সঙ্গে এদের কিছুটা আকৃতিগত মিল আছে। শান্তিলের পিতা একজন অবার হওয়া সত্ত্বেও শান্তিলের চেহারায় সেই ছাপ ছিলনা। তুর্ক জানা সেই প্রৌঢ় বনচর অন্যদের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি অভিজ্ঞ ছিল। মনে হয় ভেট উপঢৌকন নিয়ে সে কয়েকবার তুর্ক শিবিরে যাতায়াত করেছে। বহির্জগতের কিছু খোঁজ খবর সে রাখত। সে অনেক ভেবে আমাদের বলল– তোমরা দেববাহন? তারপর সে কথাটা তার সঙ্গীদেরও বলল। পুরোহিত, দেববাহন এবং চিকিৎসক, এই তিনটি কাজ যারা করে

তাদের এরা বলে শামান। প্রৌঢ় বনচরের প্রশ্নের উত্তরে শান্তিল ঘাড় নেড়ে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করায় সে প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং তাদের ভাষায় তার অভিজ্ঞ দৃষ্টির কথা সগৌরবে বলতে লাগল। সে আরও বলল এই দেববাহনেরা মৃতকে জীবিত এবং বৃদ্ধকে নবযুবকে পরিণত করতে পারে। বৃদ্ধকে নবযুবকে পরিণত করাটা এদের কাছে বেশি জরুরি বিষয় কারণ বৃদ্ধদের জীবিত রাখার রেওয়াজ তাদের মধ্যে নেই। এরা বৃদ্ধদের এমন দুর্গম অঞ্চলে ছেড়ে দিয়ে আসে যাতে স্বাভাবিকভাবেই তারা মারা পড়ে।

এবার তারা খানিকটা পোড়া মাংস আমাদের খেতে দিলো। রাত্রিবাসের কাছেই জলের ব্যবস্থা ছিল। বারবার তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার ফল ভালো নাও হতে পারে এই ভেবে সেই লবণবিহীন পোড়া মাংস খেয়ে নিলাম। বিনা লবণে খেতে অভ্যস্ত হতে মানুষের বেশিদিন লাগেনা এটা আমি আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি। এরপর আমরা পাহাড়ের চূড়ার দিকে হাঁটতে থাকলাম। পাহাড় খুব উঁচু না থাকায় চড়াইও কঠিন ছিলনা। তুর্ক জানা লোকটি মাঝে মধ্যে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে যাচ্ছিল।

তিনদিন ধরে একই রকম প্রাকৃতিক পরিবেশে পথ হাঁটলাম, কখনো পাহাড়ের চূড়ায় আবার কখনো সমতলে। তারা ধীর গতিতে চলছিল। মাঝে মধ্যে কোথাও থেমে নিজেদের জন্য শিকার করে নিচ্ছিল। যে জঙ্গলে সহজেই পর্যাপ্ত শিকার মেলে, সেখানে আহার্য বহন করা নিরর্থক। মাঝে মধ্যে প্রাকৃতিক জলাশয়ে তারা মাছ ধরত, রাত্রিতে জলচর পাখি শিকার করত। চতুর্থ দিন দুপুর বেলা জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গা থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলাম এবং সেদিকেই চললাম। দেখলাম বল্গা হরিণ চরে বেড়াচ্ছে। আমাদের গোরু মোষের মতো এগুলো বনচরদের পালিত পশু। কিছুদূর গিয়েই দশ-বারোটা চামড়ার তাঁবু দেখতে পেলাম। সেখানে সমবেত স্ত্রী পুরুষেরা আমাদের দেখে হর্ষধ্বনি করে উঠল এবং আমাদের প্রৌঢ় দোভাষীকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করল। তাঁবুগুলিকে অবশ্য কাঠের খুঁটির ওপরে চামড়ার ছাউনি বলাই ভালো। এদের জীবনে বস্ত্রের ব্যবহার নেই কিন্তু তা বলে এরা বস্ত্রের সঙ্গে অপরিচিত নয়। শীতের তীব্রতার জন্য এখানে গরম পোশাকের প্রয়োজন বেশি এবং এখানে হরিণ সহজলভ্য হওয়ায় তার চামড়াকেই এরা সেই কাজে ব্যবহার করে। এরা মেষ পালন করে না।

তুর্ক ভাষা জানা লোকটিকেই এদের দলপতি বলে মনে হলো, কারণ এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি যে তার মাথায় অন্যদের চেয়ে আলাদা একটা টুপি যাতে পাখির পালক গোঁজা। এদের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করা বেশ মুশকিল। শান্তিলের মতে এদের চেহারা কুৎসিত। আমি তাকে বললাম, হতে পারে এরাও আমাদের তেমনই কুৎসিত দর্শন ভাবছে। আমরা যাওয়া মাত্রই মেয়েদের একটা দল এসে আমাদের দুজনকে ঘিরে ধরল। অনেকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আমার চীবরটিকে লক্ষ্য করছিল। কয়েকটি তরুণী যখন আমার মুণ্ডিত মস্তকে হাত বোলাতে এল তখন মনে হলো, এরা আমাদের খেলনা জাতীয় কিছু ভাবেনি তো? এদের সরল উচ্ছ্বাসের ভাব আমার খারাপ লাগেনি তবে খেলনা হতে কার মন চায়? আমার মনের ভাব প্রকাশ করার কোনো উপায় ছিলনা, কারণ ভাষা। আবার অত লোকের সামনে বিরোধের মনোভাবও দেখাতে পারিনা, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। আমাদের অবস্থা দেখে দোভাষী লোকটি

মেয়েদের কিছু বলল এবং তার কথা শোনা মাত্রই মেয়েদের দঙ্গলটা আমাদের কাছ থেকে সসম্ভ্রমে পিছিয়ে গেলো। দোভাষী মনে হয় আমাদের কোনো ওঝা গুণিন বলে পরিচয় দিয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি বছর পাঁচেকের বাচ্চাকে আমাদের কাছে নিয়ে এল। তার মুখ পাণ্ডুর এবং শীর্ণ চেহারাই বলে দিচ্ছিল যে ছেলেটি গুরুতর অসুস্থ। কিন্তু আমাদের কাছে কোনো ঔষধ ছিল না। আর এই অরণ্যের মধ্যে কোনো ঔষধি গাছ আছে কিনা তা খুঁজে বের করাও সম্ভব ছিল না। তবু চেষ্টা করতে দোষ কি। আমি দলপতির কাছে ওষুধ খুঁজে আনার কথা বলে দেবদারু আর ভূর্জপত্রের অরণ্যের কাছের তৃণভূমিতে গেলাম। সেখানে এক ধরনের গাছ দেখে মনে হলো ঔষধি হলেও হতে পারে। তারই কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে এনে শান্তিলের হাতে দিলাম। শান্তিলের ওপরে আমার নিজের চেয়েও বেশি বিশ্বাস ছিল। শান্তিল সেই পাতা কটি ছেলেটির শরীরে আপাদমস্তক পাঁচবার বোলাল তারপর বলল, পাতা কটিকে নিংড়ে রস বের করে মায়ের দুধের সঙ্গে খাওয়াতে হবে। সমবেত মণ্ডলীর মধ্যে শান্তিলের প্রভাব বেশ ভালোভাবেই প্রতীয়মান হলো। মাতৃদুগ্ধের অভাব ছিলনা। যদিও ছেলেটি মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়েছে তবু তাকে সেই ঔষধ খাওয়ানো হলো। দুপুরের আহারের ঘন্টা দেড়েক বাদে আবার চলা শুরু হলো। আমাদের মনে একটাই চিন্তা ঔষধ প্রয়োগের ফল কি দাঁড়াল। চারদিন চলার পর আমরা এক পাহাড়ের ওপরে উঠলাম যেখান থেকে এক সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। বনচরেরা সেটাকে বলল মহাজল (বৈকাল হ্রদ)। মহাজলে হাত দিয়ে দেখলাম অত্যন্ত ঠাণ্ডা। কিন্তু মিষ্টি জলের মতো সুস্বাদু। এ অঞ্চলে অধিকাংশ হ্রদের জল ক্ষারপূর্ণ কিন্তু এই মহাজলের স্বাদ মিষ্টি। শান্তিল বলল, এটি মিষ্টি শীত সমুদ্র। সন্ধের পর বাতাসের বেগ বাড়ল আর তখন সেই জলাশয়ের বুকে বিশাল বিশাল ঢেউ উঠে প্রমাণ করতে চাইল যে এটি সমুদ্র না হলেও সমুদ্রের মতোই তার বিশালত্ব। চারদিকে তাকিয়ে মনে হলো আমরা যেন অন্য কোনো জগতে চলে এসেছি। মহাসমুদ্রের তীরে বোধ হয় বনচরদের কোনো উৎসব চলছিল। যার জন্য প্রায় সহস্রাধিক স্ত্রী-পুরুষ সেখানে জড় হয়েছিল এবং প্রতিটি পরিবারই সাধ্যানুসারে বল্গা হরিণ এনেছিল। বল্গা হরিণ আমাদের দেশের হরিণেরই একটি প্রজাতি। এদের শিং অনেক শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত এবং শরীর নরম মোলায়েম লোমে ঢাকা। এরা বনচরদের মাল পরিবহনের কাজ করে। বনচরেরা দুগ্ধ পান করতে জানলে এদের দুধও খেতে পারত। বল্গা হরিণের মাংস এদের প্রিয় খাদ্য এবং এদের চামড়া তাঁবু নির্মাণে কিংবা শয্যায় ব্যবহার করে। অত্যন্ত উষ্ণ ঋতুতেও সকালবেলা এখানকার জল জমে বরফ হয়ে থাকে। এক কথায় বলা যায় এই অঞ্চল হচ্ছে চির শীতের দেশ।

আমোদ প্রমোদ এই বনচরদের জীবনের এক অভিন্ন অঙ্গ। শিকার কিংবা মধু সংগ্রহ করার নিত্য কাজও এরা দারুণ উল্লাসের সঙ্গে করে। তুর্কদেরও দেখেছি নাচ-গান, পান-ভোজনে মত্ত থাকতে। তবে সে বিষয়ে বনচরেরা তুর্কদেরও ছাড়িয়ে যায়। পূর্ণিমা রাতের আট দিন আগে থেকে মহোৎসব শুরু হয়েছে, চলবে পক্ষকাল পর্যন্ত। এই সময় তারা নিয়মিত শিকারে যেতনা, পালিত বল্গা হরিণের মাংসের ওপরেই বেশি নির্ভরশীল ছিল। দিন বড়ো হওয়ার ফলে মহোৎসব একপ্রকার নিরবচ্ছিন্নভাবেই

চলছিল। মধু থেকে এরা মদ তৈরি করে। বনচরদের সর্দার এবং আমাদের দোভাষীর চেয়েও বনচরেরা যাকে বেশি মান্য করে তারা হলো এদের মধ্যেকার ওঝা গুণিন। এদের ভাষায় যাদের শামান বলা হয়। এদের শামানকে দেখলাম। বিশাল তাগড়াই চেহারা। দুচোখ রক্তবর্ণ। আমাদের পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে গুণিন বলে, সেদিক থেকে আমরা ওই লোকটির প্রতিদ্বন্দ্বী। একমাত্র এর কাছ থেকেই আমরা ভয়ের আশংকা করতে পারি। ভাষা জানা থাকলে লোকটিকে আশংকামুক্ত করার চেষ্টা করা যেত, কিন্তু দোভাষীর মাধ্যমে সে চেষ্টা করা সম্ভব নয়। অতএব লোকটির সঙ্গে যতদূর সম্ভব নম্র ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

মধ্য রাত্রিতে শামানের ওপর দেবতা ভর করেন। দেবতার আবাহনের জন্য শামানকে বিশেষ প্রস্তুতি নিতে হয়। সে বিচিত্র ভীতি উদ্রেককারী পোশাক পরে। তার পূজার উপাচারের মধ্যে থাকে মানুষের মাথার খুলি এবং হাড়। মাথার খুলির পেয়ালায় থাকে মধু থেকে তৈরি মদ। তার ঘন ঘন গা ঝাড়া দেওয়া, বিচিত্র সুরে স্তোত্র পাঠ করা, ইত্যাদি বিষয়গুলি দেখলে যে কোনো লোকই প্রভাবিত না হয়ে পারবেনা। শামানের ওপরে দেবতা ভর করে প্রথমেই তার আত্মপরিচয় দেয়। তারপর শামানের মুখ দিয়ে তার কথা বলতে থাকে– সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আমি তোমাদের রক্ষা করে আসছি এবং যারা অবিশ্বাসী তাদের শাস্তি দিয়েছি। রোগ, মহামারি আমারই শাস্তির একটা রূপ। তাছাড়া তুষার ঝড়, নদীর প্রবল স্রোত, অনাহার ইত্যাদির মাধ্যমেও আমি তোমাদের সাজা দিয়েছি। শামানের মুখ থেকে এসব কথা শুনে সমবেত জনতার মুখে ভয়ের ভাব নেমে আসে। তখন দেবতার রোষ সংবরণ করার আর্জি নিয়ে বনচরদের সর্দার অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গে মিলিতভাবে আকুতি জানাতে শুরু করল। তবে শুধু মৌখিক অনুরোধেই দেবতা তুষ্ট হননা অতএব বল্গা হরিণ মূল্যবান চামড়া ইত্যাদি নিবেদিত হলো। এই বার্ষিক মহোৎসবে দেখলাম শামানের আমাদানিই সবচেয়ে বেশি হলো।

বনচরেরা তাদের উৎসবে মেতে ছিল, কিন্তু আমরা দুজন সর্বক্ষণ ওঝা বা শামানের ভয়ে ভীত থাকতাম, যদি সে আমাদের তার প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে বসে। অন্যদিকে শামানও আমাদের নিয়ে চিন্তিত ছিল। কারণ দেবতার আবির্ভাব সম্বন্ধে বনচরেরা যাই ভাবুক না কেন, সে নিজে জানত বিষয়টি কি? এবং এই বিষয়ের ওপরেই তার জীবিকা এবং অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। সে জন্য অপরিচিত জগৎ থেকে আসা আমাদের সম্বন্ধে সে বিশেষ সন্দিহান ছিল, কিন্তু আমরা আমাদের বিনয় এবং শিষ্টতার সাহায্যে তার আশংকার অনেকটা কমাতে পেরেছিলাম। সে দো-ভাষীর সাহায্যে আমাদের দেবতার নাম জানতে চাইলে আমরা তাকে বুদ্ধ দেবতার কথা বললাম। শামান এরকম কোনো দেবতার নাম স্বাভাবিকভাবেই কস্মিনকালেও শোনেনি। আমরা তাড়াতাড়ি বললাম আমাদের দেবতার সঙ্গে পৃথিবীর কোনো দেবতারই শত্রুতা নেই এবং তিনি অন্য দেবতার এলাকাতে প্রভাব বিস্তারের কোনো চেষ্টা করেন না। উপরন্তু তিনি আমাদেরকে তোমাদের দেবতার প্রতিও ভক্তি রাখতে বলেছেন, নিজেদের জীবনের তাগিদেই আমরা বনচরদের মধ্যে তাদের শামানের কথা বেশ বাড়িয়ে চড়িয়েই প্রচার করলাম। বিপরীত দিক থেকে শামানও আমাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছিল।

মহোৎসব সমাপ্তির মুখে এসে গিয়েছিল। জন্মভূমি থেকে আমরা যে সত্যকে হৃদয়ে বহন করে এনেছি, ইতিমধ্যে তার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং আমরা পৃথিবীর উত্তর সীমায় পৌছে গিয়েছি। যদি আমাদের দেশের জ্যোতিষশাস্ত্র সত্য হয় আর আমাদের আর্যভট্টের (৪৫০ খ্রিঃ) মতানুসারে পৃথিবীর ব্যাস এক হাজার ছাপ্পান্ন যোজন এবং পরিধি আট হাজার যোজন হয়, তাতে পৃথিবী থেকে ধ্রুবতারা যত উঁচুতে দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় পৃথিবীর উত্তর সীমা (সুমেরু) তিরিশ অক্ষাংশের বেশি দূরে হবে না। আর্যভট্ট প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ সূর্যের পৃথিবী প্রদক্ষিণ করাকে অস্বীকার করে পৃথিবীর পরিক্রমা করার সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মানুষ যত পর্যটন করে ততই তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়। পৃথিবীর যে অঞ্চলে আমি আছি সেখানকার অনেক কিছুই আমার কাছে অবাক হওয়ার মতো। ইতিপূর্বে আমি দুচাকার শকট দেখেছি কিন্তু বরফের ওপর দিয়ে তীব্র বেগে ছুটে চলা চাকা বিহীন শকট এখানেই দেখলাম। সেই শকটও টানে বল্গা হরিণ অথবা কুকুর। আমাদের সেই উত্তরের হিম সমুদ্র স্বচক্ষে দেখার বাসনা ছিল। কিন্তু আমরা যাদের সঙ্গে ছিলাম সেই অরণ্যচারীরা সাধারণত সেই পথে সচরাচর যায়না। সেখানে অরণ্য নেই, শুধু নদীর মাছ আর শ্বেত ভল্লুক শিকার করেই উদরপূর্তি করতে হয়। সেই তৃণশূন্য অঞ্চলে হরিণদেরও নিয়ে যাওয়া যায়না।

মহোৎসবের পর বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের তাঁবু, বল্গা হরিণ এবং লোকজন নিয়ে নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যাবার অপেক্ষায় ছিল। চামড়ার তাঁবুতে চলমান বসতি। আমাদের দোভাষী সর্দার কেন যে আমাদের এত যত্নে রেখেছে তা জানিনা। তবে মনে হয় আমাদের বিচিত্র আকৃতি পোষাক ইত্যাদি তাকে কৌতূহলী করে তুলেছিল কিংবা সে আমাদেরও ওঝা গুণিন কিংবা শামানদের সমগোত্রের ভেবেছিল। মানুষ স্বভাবগতভাবে ক্রূর হয়না পারিপার্শ্বিক নানা কারণ তাকে ক্রূর করে তোলে। যেহেতু আমরা তুর্ক নই, সেজন্য আমাদের সঙ্গে তাদের কোনো শত্রুতা ছিলনা। একদিন আমাদের পনেরোটি তাঁবুর গ্রাম এই এলাকা ছেড়ে দক্ষিণ দিকে যাত্রা শুরু করল। সঙ্গে প্রায় হাজার খানেক বল্গা হরিণের এক বিশাল দঙ্গল। বনচরদের নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে দেখলাম দারুণ মিলমিশ, এবং রক্তসম্পর্ককে এরা অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দেয়। তবে অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে বিবাদের সময় এরা ভীষণ হিংস্র হয়ে ওঠে এবং প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষান্ত হয় না। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ হয়তো কয়েক পুরুষ ধরে চলতে থাকে। এ ধরনের গোষ্ঠীবিবাদের সময় শামানের কদর বেড়ে যায় খুব, কারণ সে ইচ্ছে করলে দেবতার দোহাই পেড়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে পারে, আবার ইচ্ছে করলে তাতে ইন্ধন জুগিয়ে আরও ভয়ানক করে তুলতে পারে।

প্রায় তিনমাসকাল হয়ে গেছে আমরা বনচরদের সঙ্গে আছি কিন্তু ভাষার ব্যবধান ঘোচাতে না পারার জন্য তাদের সঙ্গে গভীরভাবে মিশতে পারিনি। শামান নিজেও খুব চেষ্টা করত যাতে আমরা তাদের ভাষায় কথা বলতে পারি। আমরাও তাকে আমাদের ভাষার অক্ষরের সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করতাম। অনেক সময় আমরা ভাষার ব্যবধানের কারণে মাটিতে ছবি এঁকে কোনো জিনিস পরস্পরকে বোঝাতাম।

যে অঞ্চলে আমরা ছিলাম সেটা ছিল একটা সবুজ শ্যামল পাহাড়ি অঞ্চল। পাহাড় অর্থে বিশাল হিমালয় সদৃশ কিছু নয় নিতান্তই ক্ষুদ্র এবং যাতে পাথরের চেয়ে মাটির ভাগ বেশি, যার জন্য তার গায়ে প্রচুর বনস্পতির সমারোহ। প্রকৃতপক্ষে এক জায়গাতে আমরা বেশিদিন থাকতাম না, কোথাও হয়তো দশ দিন, কোথাও তার কম। যাত্রাপথের দিশাও নির্দিষ্ট ছিলনা, দক্ষিণে যাত্রা করে আবার হয়তো পূর্বদিকে চলা হতো। তবে এটা বোঝা যাচ্ছিল যে আমরা শীত সমুদ্র (বৈকাল হ্রদ) থেকে ক্রমশ দক্ষিণের দিকে যাচ্ছিলাম, যেখানে শীত অপেক্ষাকৃত কম। পথে একটি বড়ো নদী পড়ল যেটি শীত সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। আমার মনে হলো, গত বছর যবগুর সঙ্গে এসে এই নদীকেই বোধ হয় দেখেছি।

অবশেষে আমরা মহানদীর কিনারায় গিয়ে পৌঁছালাম, সেখানে তখনো এদিকে-ওদিকে ইতস্তত তুষার পড়েছিল। তিনদিকে পাহাড় আর একদিকে নদী এবং মাঝখানে এক বিশাল মরুভূমি। তুষারপাতের ফলে সেখানকার সবুজ ঘাস বরফে ঢাকা আমাদের সঙ্গীরা তাড়াতাড়ি বরফ সরিয়ে ঘাস কাটতে আরম্ভ করল। শীত আসছে পালিত পশুদের খাদ্য চাই। মানুষের আহার্যেরও নিশ্চিত ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল কারণ শীতে শিকার দুর্লভ হয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে বল্গা হরিণের পাল বেশ রুগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে থেকে বেছে একশোটিকে মেরে, চামড়া ছাড়িয়ে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হলো। যতক্ষণ পর্যন্ত শিকার পাওয়া যাবে ততক্ষণ ওই মাংস ব্যবহৃত হবে না।

আমার বিচিত্র পর্যটকের জীবনের এরকম ঠাণ্ডা আগে কোথাও পাইনি। শামানের মহিমা প্রচারে আমাদের ক্লান্তি ছিলনা, বিপরীতে সেও আমাদের সম্বন্ধে বিশেষ খেয়াল রাখত। সে আমাদের জন্য দুটো চামড়ার অঙ্গরাখা তৈরি করিয়ে দিয়েছিল। সর্বাঙ্গ লোমশ চামড়ার অঙ্গাবরণে ঢাকা আমাদের দেখলে ভালুক বলে ভ্রম হতে পারত। আমরা কিংবা বনচরেরা যে সমস্ত চামড়ার পোশাক পড়েছিলাম, তুর্ক অথবা চীনে তার দাম সোনা দিয়ে স্থির করা হয়। খাদ্যের মধ্যে মাংসই ছিল প্রধান, তবে মাঝে মধ্যে জমাট বাঁধা নদীর গর্ভ ফুটো করে মাছ ধরা হতো। তবে শেষোক্ত শিকারটা বড়ো বেশি ভাগ্য নির্ভর ছিল। শীত সমুদ্র থেকে আসার সময় এরা বেশ কিছু পরিমাণ মাছ শুকনো করে এনেছিল। যার অংশ শামানের অনুগ্রহে আমাদেরও জুটত। তাছাড়া আহার্য হিসাবে কচিৎ কখনো কোনো বুনো ফল কিংবা কন্দ জুটে যেত।

আমাদের ভাগ্য আমাদের হাতে ছিলনা, তাছাড়া রাস্তাঘাটও অচেনা অতএব বনচরদের ভাগ্যের সঙ্গেই নিজেদের ভাগ্যকে এক করে সময় কাটিয়ে যাচ্ছিলাম। ছ'মাস কেটে গেছে। ভাষা জ্ঞানও খানিক বেড়েছে। যে কোনো জাতির ভাষা জানা একটা বড়ো ব্যাপার। আমাদের বনচরেরা সোনা, রূপা তামা কিংবা লোহার ব্যবহার জানে এবং সেই সূত্রে বাইরের জগতের সঙ্গে তাদের পরিচয় কিছুটা রাখতেই হয়। আমাদের শামানও কিছু মূল্যবান মৃগচর্ম এবং অন্যান্য সামগ্রীর বিনিময়ে তার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস সংগ্রহে আগ্রহী ছিল। কিন্তু তুর্কদের প্রতিহিংসার ভয়ে সে নিজে কিংবা তার কোনো লোকজনকে লোকালয়ে পাঠাতে পারছিল না। এরকম সময়ে তার আমাদের কথা মনে পড়ল। যখন সে তার ইচ্ছার কথা আমাদের কাছে বলল, তখন

আমরা অতি কষ্টে আমাদের উচ্ছ্বাস সংবরণ করলাম। আমরা তুর্ক নই, অথচ তুর্ক ভাষা জানি, এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক বিষয় হয়েছিল। অতএব স্থির হয়ে গেলো যে শীত শেষ হলে আমরা দক্ষিণের দিকে জিনিসপত্র বিনিময় করতে যাব। ছ'মাস দুঃসহ শীতের শেষে বসন্তের পদধ্বনি শোনা গেলো। বেলা বাড়লে তুষার গলতে থাকে, যদিও নদীর বুকে সাদা বরফের চাদর বিছানো। এবার যে কোনো একদিন আমরা দক্ষিণের দিকে যাব। একদিন জনাদশেক লোক এবং পনেরোটি বল্গা হরিণের সঙ্গে আমরাও রওনা হলাম। শামান বিশেষ করে অনুরোধ করেছিল, আমরা যেন ফিরে আসি। রোজই একটু একটু বেলা বাড়ছে সেই সঙ্গে উষ্ণতা। অষ্টমদিনে আমরা অন্য একটি নদীর তীরে এসে পৌছালাম। সকালবেলা দেখলাম নদীর বুকে বরফ গলতে শুরু করেছে। ভাসমান ছোট বড়ো বরফখণ্ড দেখে মনে হচ্ছিল নদীর বুকে যেন কেউ সাদা মালা ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের সঙ্গীরা বেশ ভয়ে ভয়ে চলেছে, তারা শুধু ভাবছিল যে তুর্করা তাদের চিনতে পারলে কি অবস্থা হবে? যদিও শামান আমাদের বিশেষ করে শিখিয়ে দিয়েছিল যে জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লে আমরা যেন পূর্বদিকের একটি জাতির নাম করি। আরও সাতদিন পর আমরা গন্তব্যস্থলে পৌছালাম। যদিও আরও কম সময়ে এখানে আসা যেত কিন্তু আমাদের সঙ্গীরা ভয়ে ঘোরা পথ ধরেছিল। প্রায় পক্ষকাল চলে অবশেষে তুষারমুক্ত এক জায়গায় এলাম। এখানে বিচিত্র সাজে সজ্জিত এক তরুণীকে উটের পিঠে সওয়ার দেখলাম। শান্তিল তার সঙ্গে কথা বলে এসে বলল, মেয়েটি অবার, তুর্ক নয়। তবে সে যে অবার তা স্বীকার করছেনা। আসলে অবারেরা এখন বিজিত জাতি এবং তুর্কদের প্রতিহিংসার মুখে দিশাহারা। তাই অবারেরা পরিচয় লুকিয়ে চলে। অনেকদিন পর তরুণীটির সঙ্গে অনেকক্ষণ তুর্ক ভাষায় মন খুলে কথাবার্তা বললাম। এখানে দিনে গরম রাতে ঠাণ্ডা। আঙরাখার অন্তরালে থাকা চীবর দিনের বেলা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। তরুণী অনেকক্ষণ বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে দেখল তারপর বলল, তোমরা কি খখনী (ভিক্ষু)? আমাদের মিথ্যা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। অতএব তরুণীর কথা স্বীকার করে আমাদের মাথার টুপি সরিয়ে মুণ্ডিত মস্তক দেখালাম। তরুণী অত্যন্ত ভক্তিভরে আমাদের অভিবাদন জানাল, এবং একটি ছেলেকে ডেকে আমাদের তার আস্তানায় নিয়ে যেতে বলল। প্রান্তর পেরিয়ে ছোট একটা টিলার ওপারে সারি সারি নম্‌দার তাঁবু। তার মধ্যে একটি সাদা নম্‌দার তাঁবু দেখিয়ে মেয়েটি বলল, এটি আমাদের ডেরা। শান্তিল আমার পক্ষে প্রয়োজনীয়, এমন সব বিষয় নিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলছিল। মেয়েটি অনেক ভিক্ষু দেখেছে, তাদের পরিবারের সকলেই বুদ্ধ ভক্ত, সেজন্য এখন তার কথাবার্তার মধ্যে আগের মতো দ্বিধা ছিল না। তার কাছেই জানলাম যে এখান থেকে দুদিনের পথে একটি সংঘারাম আছে, আর তার কাছে একটি বাজার বসে যেখানে চীন থেকেও বণিকেরা আসে। কথা বলতে বলতে আমরা মেয়েটির তাঁবুর কাছে এসে পড়েছি। এখানে এসে আমাদের মনে যতটা উল্লাস, আমাদের বনচর সঙ্গীরা ততটাই বিমর্ষ। আমরা তাদের যথাসম্ভব আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলাম। এবং আমাদের আঙরাখা খুলে বল্গা হরিণের পিঠে চাপিয়ে দিয়েছিলাম। সেজন্য এখন আমাদের সম্পূর্ণ ভিক্ষু বেশ। তাঁবুর সামনে বেশ কিছু লোকজন

বসেছিল, আমাদের ভিক্ষুবেশে আসতে দেখে তারা যৎপরোনাস্তি বিস্মিত। তরুণীটি দৌড়ে গিয়ে বলল, এরা জম্বুদ্বীপের ভিক্ষু, শীত সমুদ্র আর উত্তরের বনচরদের অঞ্চল ঘুরে এসেছে। সকলে মাটিতে হাত রেখে ভক্তিভরে আমাদের অভিবাদন জানাল। আমাদের জন্য তাঁবুর বাইরে আসন বিছানো হলো। পানের জন্য এল চমরি গাইয়ের দুধ। আমরা আমাদের সঙ্গীদের সেই পরিচয়ই দিলাম যা শামান আমাদের শিখিয়েছিল। বিগত গ্রীষ্মে যবগুর সঙ্গে যে ঘটনা ঘটেছিল তার বিশদ সংবাদ এরা দেখলাম জানেনা। তবে এটুকু জেনে ভালো লাগল যে বনচরেরা কিছুকাল যবগুকে বন্দী করে রেখে অবশেষে মুক্তি দিয়েছিল, আর যবগু বনচরদের অপরাধ মার্জনা করে পুনরায় তাদের ওপরে কোনো হামলা চালায়নি। আমার সঙ্গীরা প্রথমে এই সংবাদ বিশ্বাস করতেই চায়নি, তারপর আর কোনো ভয় নেই জেনে তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। প্রান্তরের তুষার সরে যাওয়ায় সে জায়গায় সবুজ তৃণভূমির সৃষ্টি হয়েছে। ভূর্জ গাছে পাতা আসছে। তুর্ক গৃহপতি আমাদের কাছে পেয়ে খুব উল্লসিত, সহজে ছাড়া পাব বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের সঙ্গীদের ফেরার তাড়া আছে। তাই শেষ অবধি দুটো দিন তাদের আতিথ্যে থাকার কথায় স্বীকৃতি দিলাম। দুটো দিন কাটিয়ে বিদায় নেবার সময় তরুণীর স্বামী এবং এক কাকা আমাদের সঙ্গী হলো। দুদিন ধরে অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা দেখতে দেখতে পথ চললাম এবং তোলা নামের এক নদী-তীরে এসে পৌছালাম। নদীর তীরে বিশাল প্রান্তর, তাতে প্রায় পাঁচশতাধিক তাঁবু পড়েছে। আমাদের ধারণা ছিল যে উত্তর থেকে আগত লোকজনের মধ্যে আমরাই প্রথম। কিন্তু হরিণ নিয়ে চামড়ার তাঁবুতে বাস করছে এরকম কিছু লোকজনকেও দেখতে পেলাম। যাদের নাম ভাঁড়িয়ে আমার সঙ্গীরা এখানে এসেছে, এরা ছিল সেই সব গোষ্ঠীর। যদিও এখন আর পরিচয় গোপন করার প্রয়োজন ছিলনা তাই সঙ্গীদের তাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের কাছে রেখে, আমি আর শান্তিল সংঘারামে আশ্রয় নিলাম।

সংঘারামের দেয়াল মাটির, মধ্যে মধ্যে কাঠের ব্যবহারও রয়েছে। শীতের ঋতুতে ভিক্ষুরা এখানে এসে বাস করে। বাকি সময় ভিক্ষুরা যাযাবর উপাসকদের সঙ্গে থাকে। আমরা যখন সংঘারামে এলাম তখনো পনেরোজন ভিক্ষু ছিলেন। দরজার মুখোমুখি একটি ঘরে প্রতিমা আর আঙিনায় একটি ছোট স্তূপ। সব কিছুই আয়তনে ছোট কিন্তু সুন্দর। সংঘারামে প্রবেশ করতেই একজন প্রসন্নবদন ভিক্ষু আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন, কোন ভাষায় কথা বলবেন সে বিষয়ে বোধ হয় কিছুটা দ্বিধায় ছিলেন। তারপর তুর্ক ভাষায় বার্তালাপ শুরু হলো। উনি প্রথমেই আমার কাছে বর্ষ জানতে চাইলেন। আমি বললাম, উনিশ বর্ষ। শুনেই ভিক্ষু নতজানু হয়ে আমাকে পুনরায় অভিবাদন করে বললেন, আমি নিজে পনেরো বর্ষ। এরপর শান্তিল তাঁকে অভিবাদন করল। ভিক্ষুদের মধ্যে উপসম্পদা (ভিক্ষুব্রত) গ্রহণের পর থেকে বর্ষ গোনা হয় আর সেই ক্রমানুসারে গরিষ্ঠ লঘিষ্ঠ স্থির করে অভিবাদন করা হয়। নিজেকে চীনদেশের ভিক্ষু বলে পরিচয় দিয়ে তিনি আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি আমার পরিচয় দিয়ে শান্তিলের পরিচয় দিলাম, কুমারজীবের দেশ কুচার অধিবাসী বলে। চীন দেশে জম্বুদ্বীপের ভিক্ষু দুর্লভ নয় কিন্তু এরকম দুর্গম অঞ্চলে আমরাই বোধ হয় আমাদের দেশের প্রথম ভিক্ষু।

সংঘারামের স্থবির (মোহান্ত) আমার বয়কনিষ্ঠ। একেই আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, তদুপরি বুদ্ধের দেশের লোক বলে আমার অভ্যর্থনায় যথেষ্ট উষ্ণতা এবং হৃদয়ের স্পর্শ ছিল। সবচেয়ে ভালো ঘরে আমাদের স্থান হলো। সন্ধ্যার পর ভিক্ষুদের ভোজন নিষিদ্ধ সেজন্য মধুর রসের পানীয় দেওয়া হলো। যদি আমরা সরাসরি দেশ থেকে এখানে আসতাম তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসাই থাকত বেশি, কিন্তু যেহেতু আমরা শীত সমুদ্র এবং বনচরদের দেশ থেকে এসেছি সেজন্য সংঘারামের স্থবিরদের জিজ্ঞাসাই ছিল বেশি। এই ভিক্ষুরা জানে না যে প্রতিবছর কয়েক শত উত্তরের বনচর তাদের পণ্য দ্রব্য নিয়ে এখানে আসে।

মহাচীনের দিকে (৫৫৭ খ্রিঃ)

যারা বেশি ভ্রমণ করেনি কিংবা যারা অনেক ভ্রমণ করেছে তাদের কারও পক্ষেই সর্বত্রগামী হওয়া সম্ভব হয়না আর সেজন্য অজানা অচেনা পথে পা বাড়াতে প্রথমে একটু দ্বিধা থাকে। সংঘারামের চীনা ভিক্ষু বোধিসংঘের (বোসঙ) কাছ থেকে জানলাম চীনের পথ যথেষ্ট দুর্গম। দেড়শো যোজনের বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে মরুভূমি। তবে এই মরুভূমির মধ্যেও বাণিজ্যপথ রয়েছে। বোসঙ-এর কাছে আরও জানলাম যে বর্তমানে চীন দেশে তথাগতর শাসনের যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। অনেক ভারতীয় ভিক্ষু সেদেশে আছেন। চীন এক মহান দেশ এবং সেখানে বিদ্যা ও শিল্পকলার আসন অত্যন্ত উঁচুতে, এ তথ্যও আমার জানা ছিল। সংঘারামের আরেকজন ভিক্ষু জানাল যে একটি হ্রস্বপথ আছে। যে পথে চললে এক মাসের মধ্যে চীনে পৌছানো যাবে, তখন মনের মধ্যে আনন্দের এক শিহরণ বয়ে গেলো। কিছুকাল আগেও ভেবেছিলাম যে যদি কোনো উপায়ে বনচরদের ভূমি থেকে বের হতে পারি তাহলেও দেশে ফেরা বা চীনে যাওয়া হবেনা, তুর্ক-অবারদের দেশেই শেষ জীবনটা কাটাতে হবে। কিন্তু এখন নতুন পথে অগ্রসর হওয়াটাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল।

সংঘারামের স্থবির এবং অন্যান্য ভিক্ষুরা অত সহজে আমাদের বিদায় দিতে রাজি ছিলনা। আমরাও অযথা তাড়াহুড়োর পক্ষপাতী ছিলাম না। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বর্ষাবাস শুরু হয়ে যাবে এবং বর্ষাবাসের তিনমাস কাল পর সার্থদের পণ্য চলাচল শুরু হবে। অতএব তখন যাওয়াই বিধেয়। যে তিনমাস ওই সংঘারামে রইলাম সেই তিনমাস ভিক্ষুদের মধ্যে অধ্যাপনার কাজ করলাম।

আমাদের সংঘারামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদীটির নাম তোলা। তোলা সেলিংগা মহানদীর একটি শাখা যার এক প্রান্ত গিয়ে শীত সমুদ্রে পড়েছে। এখানে বর্ষার সমতলে এবং পাহাড়ের উপত্যকায় দীর্ঘাকৃতির ঘাস প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। পালিত পশুর দল এই ঘাস খেয়ে যথেষ্ট তরতাজা হয়ে ওঠে। ভার বহনের জন্য এখানে উট এবং চমরীর ব্যবহার হয়। এখানকার লোক জাতিতে অবার হলেও তুর্ক ভাষাতেই কথা বলে।

বর্ষা আরম্ভ হয়ে গেলো। বর্ষা এখানে আমাদের দেশের মতো অত ব্যাপক নয়, আবার কাংস্য দেশের মতো নাম মাত্রও নয়। প্রশ্ন হতে পারে এত অপ্রতুল বর্ষার মধ্যে

এখানকার চারদিক এত সবুজ শ্যামল হয় কি করে? এ অঞ্চলে প্রবাহিত নদী বর্ষায় তার নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে যায়, আর তার ফলেই উপত্যকায় সবুজের সমারোহ নেমে আসে।

যতদিন না পরবর্তী গন্তব্য স্থলের দিকে যাত্রা করছি ততদিন নিছক বসে না থেকে সকাল সন্ধ্যা ভিক্ষুদের নিয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম। অধিকাংশ সময় তারা আমার কাছে জম্বুদ্বীপের কথা শুনতে চাইত। আমার দেশের প্রতি তাদের আগ্রহের একটা কারণ ছিল, তুর্করা আসলে হুণদেরই পরবর্তী প্রজন্ম এবং এই হুণেরা এক সময় জম্বুদ্বীপের এক বিশাল অংশ শাসন করেছে। আমি আমার দেশের নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসাই শুধু করতাম না, আমাদের দেশের অসহ্য গরম, গ্রীষ্মে তপ্ত বায়ু প্রবাহের কথাও বলতাম। আমাদের দেশের বিষধর সাপের কথা শুনে যারা জম্বুদ্বীপ ভ্রমণে উৎসাহী হয়েছিল, তাদেরও উৎসাহে দেখলাম মন্দা দেখা দিয়েছে। যদি আজ আমার সঙ্গে বুদ্ধিল থাকত তাহলে সে আমাদের দেশের হিংস্র জন্তু জানোয়ারের ছবি এঁকে বোঝাতে পারত যাদের সম্বন্ধে এদের কোনো ধারণা নেই, দুর্ভাগ্য আমার, আমি ছবি আঁকতে জানিনা।

সংঘারামের স্থবিরের বয়স চল্লিশ অতিক্রান্ত এবং তিনি ছিলেন অবার বংশীয়। কিছুকাল কাংস্য দেশে বাস করার ফলে তিনি সামান্য কুচী এবং সংস্কৃত ভাষা জানতেন। তিনি সর্বদা চেষ্টা করতেন যাতে তাঁর সংঘারামে জম্বুদ্বীপের রীতি রেওয়াজ পালিত হয়। এ কাজে আমিও তাঁকে সাধ্যমতো সাহায্য করতাম। আমার তরুণ বয়সের স্বপ্ন মহাচীনে যাব, এবং সেই স্বপ্ন এখন সাকার হবার কাছাকাছি চলে এসেছে। সংঘারামের ভিক্ষুদের ইচ্ছে যে হয় আমি না হয় শান্তিল, যে কোনো একজন তাঁদের মধ্যে থেকে যাক। শান্তিলকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল না, কিন্তু সে পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই আমি তাকে বললাম–মহাচীন এখান থেকে মাত্র একমাসের পথ, বছরের কয়েকটি মাস বাদ দিয়ে সারা বছরই বণিক সার্থরা যাতায়াত করে। ইচ্ছে হলে আগামী বছরেও তুমি চীনে যেতে পারবে, কিন্তু এখন এই ভিক্ষুদের ইচ্ছের কাছে আমাদের নতি স্বীকার করতেই হবে। শান্তিল সম্মত হলো। আমাদের দুজনের সাক্ষাৎ ভ্রমণের মাধ্যমেই হয়েছিল এবং এতদিন আমরা ভ্রমণের মধ্যেই আছি, তবুও তারই মধ্যে সে আমার কাছ থেকে যতটা সম্ভব শিক্ষালাভ করেছে। সে বুদ্ধিমান এবং উদ্যমী ছিল, তার ফলে স্বল্পায়াসেই সে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিল। 'অভিধর্মকোষ', 'ন্যায়মুখ', 'প্রমাণ সমুচ্চয়', ইত্যাদি আকর গ্রন্থ সে ভালোমতো অধ্যয়ন করেছিল। আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ গ্রন্থ ছিলনা, কিন্তু বেশ কিছু গ্রন্থ আমার কণ্ঠস্থ ছিল, যেগুলোর কয়েকটিকে আমি শান্তিলের জন্যই ভূর্জপত্রে আবার লিখেছিলাম।

মহাপ্রবারণার (আশ্বিন পূর্ণিমা) সময় এল। হাজারের মতো উপাসক উপাসিকারা সেদিন সংঘারামের চারদিক ঘিরে বসেছিল। আমরা এই মহোৎসবকে অনেক দেশেই পালিত হতে দেখেছি। যাযাবরদেরও এই উৎসবের প্রতি ভক্তি এবং উৎসাহ কম ছিলনা। শুধু সাধারণ জনতাই নয়, বেশ কয়জন তুর্ক বেগ এবং রাজকুমারেরাও

এসেছিলেন। সমবেত সকলেই যদি তাদের পশুপাল নিয়ে আসত তাহলে এই ছোট এলাকাতে বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হতো। কিন্তু সকলেই এখানে এসেছে সাময়িকভাবে, খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ থাকবে, তাও সওয়ারী এবং ভার বহনের জন্য প্রয়োজনীয় পশু ছাড়া অন্য কিছু আনেনি। এদের মধ্যে এক কুচী দম্পতিকে দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। পিঙ্গল কেশ, নীল চোখ এবং অত্যন্ত গৌরবর্ণ তদুপরি কুচীর পোশাক পরনে ছিল। এতদিন পর এই সব দেখে শান্তিলও অত্যন্ত খুশি হয়েছিল। পুরুষটির পরনে শরীরের সঙ্গে আঁটোসাটো গলা খোলা কুঞ্চক যার ঝুল হাঁটু পর্যন্ত, যেটা তাদের জাতীয় পরিধেয়। তুর্ক বেগদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁর থুতনিতে সামান্য দাড়ি আর গোঁফে হাতে গোনা যায় এমন কয়েক গাছা গোঁফের চুল, কিন্তু সেগুলিও পরম যত্নে লালিত পালিত ছিল। চোখ তির্যকভাবে নিচের দিক থেকে ওপরে ওঠা, চুল লম্বা ঘাড় পর্যন্ত আর মাথায় বিচিত্র ধরনের টুপি। নিচের দিকটা মৃগচর্মে এবং ওপরের ভাগ লাল চিনাংশুক দিয়ে তৈরি চোগা পরনে। কোমরে একগাছা দড়ি বাঁধা কিন্তু সেটা চোগাকে শক্ত করে বাঁধার জন্য নয় তাঁর বিচিত্র খড়গটিকে বাঁধার জন্য। চোগার বাহু দুটি এত বড়ো যে তার মধ্যে হাতের পাঞ্জা লুকিয়ে রাখা চলে। ভিক্ষু সংঘের সামনে সম্মান প্রদর্শনের জন্য তিনি দুই বাহুকে বুকের ওপরে আড়াআড়িভাবে রেখে দাঁড়িয়েছিলেন। বার্ধক্যেও তাঁর পৌরুষ এত দীপ্ত ছিল যে তা থেকেই যৌবনে তাঁর পৌরুষ কিরকম ছিল তা অনুমান করা যায়।

মহোৎসব শেষ হলো। শুধু নবপরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকেই নয়, নিজের আত্মীয়বৎ শান্তিলের কাছ থেকেও বিদায় নিতে হবে। সত্যি সত্যি এরকম অবস্থায় পড়ব কখনও ভাবিনি। শান্তিল এবং আমার, দুজনের পক্ষেই চোখের জল আটকানো মুশকিল ছিল কিন্তু এই কাজটি আমরা দুজন একান্তে সেরে রেখেছিলাম।

তুর্ক সার্থও মহাচীন যাচ্ছিল। তাঁরা যথেষ্ট আনন্দের সঙ্গেই আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিতে রাজি ছিলেন, কিন্তু যে দেশে যাব, চলার পথে সেই দেশের লোককে সঙ্গী হিসেবে পেলে যাত্রাপথে অনেকে কিছু জেনে নেওয়া যায়। আমার নতুন বন্ধু বোসঙও সেই মতই প্রকাশ করল। সে এক চৈনিক বণিক দলের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। বনচরদের ভূমির মহার্ঘ মৃগচর্ম (সমুর) চীনের রাজপরিবার ও সামন্তদের কাছে খুব সমাদৃত। কিছু কিছু তো প্রায় সোনার মতোই মহার্ঘ। এই বণিক সার্থবাহ দলটি রাজধানী য়েহর অধিবাসী এবং সেখানে আগত চৈনিক বণিক দলের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো। এরা নিজেরাও বুদ্ধভক্ত ছিল। যার জন্য এদের সঙ্গে যাত্রা করার কিছু সুবিধা ছিল।

একদিন মধ্যাহ্ন, ভোজনের পর সংঘারাম ত্যাগ করলাম। কখনো কয়েকটি ঘাসে ছাওয়া পাহাড় অতিক্রম করলাম, কখনো কয়েকটি অরণ্য। দু-একদিনের মধ্যেই অরণ্য পার হয়ে গেলাম। এখন সামনে বিস্তৃত তৃণভূমি আর দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাহাড়। কিছুদূর যাওয়ার পর একটা অপেক্ষাকৃত উঁচু পাহাড় ডিঙোলাম যার নাম বোগ্দাউলা। এরপরই সামনে অনন্ত মরুভূমি (গোবি)। সংঘারাম থেকে আমরা দুশো ক্রোশ চলে এসেছিলাম, কিন্তু এখনো আরও চতুর্গুণ পথ বাকী এবং সেই পথও

মরুভূমির মধ্য দিয়ে। এই অঞ্চল সমতল নয়, ইতস্তত নগ্ন পাহাড় ডাইনে বাঁয়ে দেখা যাচ্ছিল। ওগুলোকে অবশ্য পাহাড় না বলে টিলা বলাই ভালো। কিছু কিছু নিম্ন ভূমিও দেখলাম, শুনলাম প্রচুর বর্ষা যদি কখনো হয় তাহলে এই নিম্ন ভূমি সরোবরে পরিণত হয়ে যায়, আবার সামান্য কয়েকদিনের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যায়। এই সময় সেই নিচু জমিতে কিছু বেশি ঘাস জন্মেছে দেখতে পেলাম। মরুভূমিতে জলের সমস্যাই সর্বপ্রধান। তবে এপথে যদি জল একান্তই না পাওয়া যেত তাহলে বণিকেরা এপথে চলতনা। এপথে জলের উৎস অনুসারেই বিশ্রামের স্থান ও সময় নির্ধারিত হয়। একটি কুয়ো থেকে চলা আরম্ভ করে পরবর্তী কুয়ো পর্যন্ত পথ চলা চলতে থাকে। শরৎকালে ঠাণ্ডা বা গরম কোনোটাই সহ্যাতীত নয়। তবে এ পথে যাতায়াতকারীরা শীতকেও পরোয়া করেনা। তুর্করা তাদের ভেড়া এবং ঘোড়া বিক্রি করার জন্য সংখ্যায় কম হলেও শীতকালেও যাতায়াত করে। শীতে বণিকদের সংখ্যা কম হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, ওই সময় পথে পশুখাদ্যের ঘাটতি দেখা দেয়। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের পর যাত্রা শুরু হতো। আমাদের আহারের ব্যবস্থা সঙ্গী সার্থরাই করত। মধ্যাহ্ন থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলা হতো। সার্থবাহরা আমাদের জন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু আমি বাধ্য হয়ে আপৎকালে ভিক্ষু নিয়ম ভেঙে ঘোড়ায় চড়তে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু এখন তেমন আপৎকাল ছিলনা। সেজন্য আমি বোসঙের সঙ্গে পদব্রজেই চলতাম। কখনো অগ্রবর্তী বিশ্রামস্থল বেশ কিছুটা দূরে হওয়ায় আমাদের মধ্যরাত্রি পার করেও পথ চলতে হতো। তবে সে রকম কমই হতো। পনেরো ক্রোশের (তিন যোজন-পনেরো মাইল) চেয়ে বেশি পথ একদিনে কমই হাঁটতে হয়েছে।

আমরা যতই সেই মহামরুভূমির ভিতরে ঢুকছিলাম, ততই সবুজের চিহ্ন কমে আসছিল। হলুদ রঙের বালি, আর সামান্য তৃণ এদিক ওদিকে দেখা যাচ্ছিল। আমাদের সার্থবাহর দলের পরিচারকদের অধিকাংশই ছিল যাযাবর বংশোদ্ভূত। তারা এরকম রাস্তায় দেবতাকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সুযোগ হারাত না। কাঠ এখানে দুর্লভ বস্তু। তা সত্ত্বেও অনেক কষ্টে কাঠ সংগ্রহ করে মাটিতে দেবতার উদ্দেশ্যে পুঁতে দিত। হাজার বছর ধরে মানুষ এপথে যাত্রা করে আসছে, এখানে দেবতার স্থানে যদি কয়েকশো ভূর্জগাছের ডাল জমা হয়ে যায় তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। পাথর, মৃত জন্তুর হাড়-গোড়, মাথার খুলি, শিং ইত্যাদির সঙ্গে এই লাঠিগুলিও একত্রিত হয়ে দেবস্থানের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

এই মরুভূমি একেবারে নির্জন ছিল না। কোনো কোনো পাহাড়ের কাছে নমদের তৈরি সাদা তাঁবু এবং তার চারপাশে পশুদের চরতে দেখা যেত। সমতল বালুভূমির মধ্যে কোথাও কোথাও শুকনো নদীখাত অথবা নালার আঁকাবাঁকা রেখা দেখা যেত। কখনো নিশ্চয়ই এই পথে জলস্রোত প্রবাহিত হয়েছে। মরুভূমিতে বর্ষা নাম মাত্র হয়। কিংবা এরকমও বলা যায় প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাবেই মাটি মরুভূমিতে পরিণত হয়। হয়তো সুদূর কোনো অতীতে এখানে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হতো, তখন এখানে নদী, অরণ্য সব কিছুই ছিল তারপর একসময় আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

যখন আমাদের সার্থ বিশ্রামস্থলে পৌছায় তখন ভারবাহী উটের পালকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়। তাদের পিঠের মাল নামিয়ে এমনভাবে সাজানো হয়, যেন একটি দেয়াল খাড়া করা হয়েছে। এরপর উটেদের কাছে-পিঠে চরবার জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়। পরদিন যাত্রার আগে আর তাদের প্রয়োজন নেই। কখনো কখনো আমাদের শিবির এমন জায়গায় পড়ত যেখানে ফরাস গাছ হয়তো ততটা থাকত না কিন্তু অদূরেই জঙ্গলের চিহ্ন দেখা যেত। উটের মতো এই গাছও মরুভূমির প্রিয়। উট ভারতের মতো উষ্ণদেশে মরুভূমিতে বাস করে। কিন্তু এখানে এই হুণদেশের শীতল মরুভূমিতে (গোবি) তাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কে জানে, উটেদের প্রয়োজনে ফরাস গাছ এখানে জন্মেছে নাকি ফরাস গাছ দেখে উটের দল এখানে এসেছে? স্থাবর জঙ্গমের পার্থক্য থাকলেও উভয়ের প্রকৃতিই এক। আমাদের শিবির যেখানে পড়ত তার আশেপাশে যাযাবরদের বসতি থাকলে তারা দুধ, মাংস, জ্বালানি ইত্যাদি বিক্রয় করতে আসত। আগুন মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। উত্তরের বনচরদের আমি বিনা নুনে কাঁচা মাংস খেতে দেখেছি। তারা আগুন, নুন ছাড়াই তাদের আহার্য উপভোগ করতে পারে। কিন্তু তুর্ক যাযাবরেরা তা করতে পারেনা। জ্বালানী হিসেবে কাঠ এই অঞ্চলে দুর্লভ। তবে পালিত এবং বন্য প্রাণীদের শুকনো বিষ্ঠা এদিক ওদিকে পড়ে থাকে। আমি আমার দীর্ঘ যাত্রাপথে কয়েকবার দেখেছি যে মেয়ে এবং বাচ্চা মিলিয়ে পাঁচ-ছ'জনের এক একটি দল ওগুলো সংগ্রহ করছে। চামড়ার দড়ি দিয়ে বোনা ঝুড়ি পিঠে বাঁধা থাকে আর মাটি থেকে কুড়িয়ে কাঁধের পিছনে ফেলে দিলে ঠিক গিয়ে সেখানে জমা হয়। এদিককার মেয়েরা তাদের চুলকে শিঙের আকারে সাজায়। দূর থেকে এদের কেশসজ্জা দেখলে ভারতের মোষ বলে ভুল হতে পারে। আমি আর বোসঙ দুজনেই অবাক হয়ে ভাবতাম, এরকম পশুর শিঙের নকলে কেশসজ্জা করার কি অর্থ? এর ফলে সৌন্দর্য তেমন কিছু বৃদ্ধি পায়না। শরীরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা অন্য ব্যাপার, তার ফলে সৌন্দর্যও বাড়ে। অন্যান্য সাজ-সজ্জাও সব বিচিত্র রূপের, অনেকটা শিশুদের মতো। বোধহয় মানুষের শৈশব বার্ধক্য পর্যন্ত তাকে তাড়া করে ফেরে।

আমরা মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলছিলাম। অনেক বছর পরে আমি এমন একটা সমাজে এসে পড়েছি যে তাকেই এখন বেশি আপন বলে মনে হচ্ছে। সংঘারামে পৌঁছে দুর্লভ আহার্য হিসেবে ভাত এবং রুটি খেয়েছি। যাযাবরদের দেশে চাষাবাদ হয়না অতএব চাল গম আনতে হয় বহুদূর থেকে, সেজন্য তার মূল্যও বেশি হয়। বোধহয় সেই জন্যই সাধারণ যাযাবরেরা এই আহার বিশেষ পছন্দ করেনা। চীনা সার্থবাহ দলের সঙ্গে থাকার ফলে জানতে পারলাম যে চীনের ভিক্ষুরা মাংসাহার করেন না। তাঁরা মহাযান পন্থী এবং মহাযানে মাংস ভক্ষণ বর্জিত হয়েছে। সার্থবাহ বণিকেরা প্রথম দিনই অত্যন্ত মিহি সুগন্ধী চালের ভাত, শুকনো সজী এবং রুটির সুস্বাদু ভোজন আমাদের দিয়েছিল। বোসঙের কাছে সব কিছু শোনার পর আমিও প্রতিজ্ঞা করলাম যে আর মাংসাহার করব না। আমিও মহাযান পন্থারই অনুগামী ছিলাম। বোধিসত্ত্বের পথ সুগম নয়। বিনা হিংসায় মাংস পাওয়া যায়না, অতএব তাকে আহার্যরূপে গ্রহণ কখনও সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হতে পারেনা।

চীনে যে উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলাম তার জন্য সে দেশের ভাষার ওপরে দখল থাকার প্রয়োজন ছিল। বোসঙ এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই আমাকে অনেক সাহায্য করে চলেছিল। ব্যাকরণ, ভাষাকে কঠিন করে তোলে আর চীনা ভাষার ব্যাকরণের কলেবর সংস্কৃত ব্যাকরণের কুড়ি ভাগের একভাগও নয়। সেখানে ক্রিয়া পদে উত্তম, মধ্যম এবং প্রথম পুরুষের কোনো ভেদ নেই, একবচন, দ্বি-বচন, বহুবচনের বাহুল্য এবং কালের কলহ ইত্যাদি কিছুই ওই ভাষাতে নেই। সংস্কৃতে একটি ধাতুর অনেক রূপ হতে পারে কিন্তু চীনা ভাষায় সেটা 'ম' ধাতুতেই চলে যায়। এরকমভাবে নামের মধ্যে অনেক বিভক্তি এবং বচনের প্রয়োজনীয়তা নেই। কিছুদিন পরই বুঝতে পারলাম ভাষা শেখা আমার পক্ষে খুব কঠিন হবেনা। বোসঙ যখন লিপি শেখানো আরম্ভ করল, তখন দেখলাম সেখানে উচ্চারণের কোনো প্রয়োজন নেই, না স্বরবর্ণের না ব্যঞ্জনবর্ণের। আমাদের গণিতের মতো চীনা লিপি কেবল অর্থের সঙ্কেত বহন করে। এর অর্থ, যত বস্তু বা শব্দ আছে ততগুলি অক্ষর শিখতে হবে। আমি ধৈর্য হারায়নি তবে বিষয়টি খুব সহজ নয়। তা সত্ত্বেও আমি ভাষা শেখার পিছনেই বেশি জোর দিয়েছিলাম। আমাদের সার্থবাহর সঙ্গে মামুলি কথাবার্তা চীনা ভাষাতেই চালাতাম। বোসঙ আমাকে লিপি শেখার বিষয়ে মাঝেমধ্যে উদাসীন দেখে বলেছিল– মহাচীন এক বিশাল দেশ, এখানে বিভিন্ন প্রদেশের ভাষার মধ্যে এত প্রভেদ যে এক জায়গার লোক আরেক জায়গার সঙ্গে কথা বিনিময় করতে পারে না। একমাত্র লিপিই পারে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে, কারণ সর্বত্র প্রায় একই লিপি অনুসরণ করা হয়। এ থেকে এটুকু বোঝা গেলো যে ভাষা শিখতে হলে লিপিকে উপেক্ষা করলে চলবে না।

মধ্য রাত্রিতে যখন আমরা শিবিরে পৌছাতাম তখন স্বাভাবিকভাবেই খুব ক্লান্ত থাকতাম। তখন আমাদের খাদ্যেরও প্রয়োজন থাকত না। উপাসক সার্থবাহ মধু রস অথবা দ্রাক্ষারস পান করার জন্য পীড়াপীড়ি করত, কিন্তু আমরা তা কখনোই পান করিনি। সে সময়তো নিদ্রাই ছিল একমাত্র কাঙ্ক্ষিত বস্তু। বিছানায় পড়া মাত্রই ঘুমিয়ে পড়তাম এবং সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তাম। হাতমুখ ধুয়ে, খানিক পূজার্চনা সমাপ্ত করে ফেলতে যতক্ষণ সময় লাগত, তার মধ্যে আমাদের জন্য বেশ ভালো পরিমাণ প্রাতরাশ এসে যেত। উপাসক সার্থবাহ অনেক বেলা পর্যন্ত শয্যায় কাটাত কিন্তু মধ্যাহ্ন ভোজনের আগে সেও প্রস্তুত হয়ে যেত। তার নিজের কোনো কাজ করার দরকার ছিল না, দাস এবং ভৃত্যরাই সমস্ত কাজকর্ম দেখত একমাত্র আহার এবং চলার সময় তার নড়াচড়ার প্রয়োজন দেখা দিত। কখনো কখনো সে এই সময়ে আমার কাছে ধর্মালোচনার জন্য আসত যেখানে বোসঙ দোভাষীর ভূমিকা পালন করত।

মোযু খানের শাসন ওই অঞ্চলেও লাগু ছিল। এখান থেকে আরও বহুদূর পূর্বের যাযাবরেরাও তাঁকে খান বলে স্বীকার করত। অবারদের শেষ পর্যায়ে মুমূর্ষু রাজবংশের মতো এখানেও রাজব্যবস্থা ভেঙেচুড়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় এই মহাবণিক পথ বিপদ সঙ্কুল ছিল। বণিক সার্থবাহদের নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিজেদেরই করতে হতো। এবং অনেক সার্থ একত্রে পথ চলত। এত সাবধানতা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যেই যাযাবর লুঠেরারা লুটপাত করত। সার্থ লুণ্ঠন করা যাযাবরদের কাছে কোনো অধর্ম নয়। এরকম অনেক লুটেরাদের মধ্যে কখনো কখনো কোনো সর্দার

এমনকি খানও জড়িত থাকত। মোযু খান এই অঞ্চলের শাসক হলেও আমার সন্দেহ ছিল যে সে জীবনে কখনও এই অঞ্চলে পদার্পণ করেছে কিনা?

প্রতিদিন আমরা দুজনে পদব্রজে পথ চলতাম। মরুভূমিতে পথ ভুল হওয়ার আশংকা প্রতি পদে পদে থাকে। মানুষ, জন্তু জানোয়ারের পদচিহ্নই ধীরে ধীরে পথ গড়ে তোলে কিন্তু এখানে সেই চিহ্ন সামান্যক্ষণ মাত্র থাকে। সামান্য বায়ু প্রবাহেই তা ঢাকা পড়ে যায়। আমাদের সহযাত্রী যাযাবরদের বিশ্বাস ছিল যে মরুভূমিতে ওরকম বালির ঠিলা ভূতেরা তৈরি করে এবং ওগুলো দেখে পথিকেরা পথ ভুল করে এবং ভূতের খাদ্যে পরিণত হয়। ইচ্ছে থাকলেও আমরা দুজন একা পথ চলতে পারতাম না। সেজন্য আমরা সার্থবাহ দলের সর্বাপেক্ষা অগ্রণী পরিচারক দলের সঙ্গী হতাম। সাময়িক বিশ্রামের জন্য তারা যেখানে দাঁড়াত আমরাও সেখানে দাঁড়াতাম। বাকি সময় আমাদের পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তাতেই কেটে যেত। নিজের ভাষার ভাণ্ডার শ্রীবৃদ্ধি করার এর চেয়ে আর ভালো সুযোগ কোথায় পাওয়া যাবে? আমাদের আলাপচারিতার মধ্যে বহুবার বুদ্ধিলের নাম উচ্চারিত হতো, বুদ্ধিলের মুখ যেন সব সময় আমার চোখের সামনে ভাসে। আমরা দুজনে এক সময় মহাচীনে যাওয়ার সংকল্প করেছিলাম। সে যেতে পারল না, কিন্তু আমার সেই বন্ধুর সংকল্প অন্তত আমার দ্বারা পূরণ হচ্ছে এটাই ছিল আমার সান্ত্বনা। আজ যদি আমরা দুজনে এক সঙ্গে থাকতাম তাহলে কতইনা ভালো হতো। অনেক ভারতীয় ভিক্ষু বিভিন্নকালে চীন দেশে এসেছেন যাঁদের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিল তার তরুণ বয়সেই ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে বিবেচিত হয়েছিল। এরকম একজন পণ্ডিত চীনদেশে এলে কত বেশি কাজ করা যেত। এ সময় মহাচীনে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের ব্যাপক কাজ চলছে, আমরাও সেই কর্মযজ্ঞে সামিল হতে পারতাম।

প্রথমে ভেবেছিলাম, চীনা লিপির ওপরে ভালো মতোই দখল হয়ে যাবে। পরে আমি কুমারজীবের অনুবাদ নিজে দেখেছি, এবং চীনা পণ্ডিতদের কাছেও তাঁর প্রশংসা শুনেছি। কুমারজীব চীনা ভাষায় ততটাই দক্ষ ছিলেন যতটা তাঁর মাতৃভাষা কুচী এবং ধর্মভাষা সংস্কৃত ভাষাতে। যদি বুদ্ধিল এখানে আসত তাহলে লোকে তাকে দ্বিতীয় কুমারজীব বলত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যে বিশাল কর্মকাণ্ড পড়ে আছে সেখানে আমার যোগ্যতা সম্পর্কে আমার নিজেরই সন্দেহ ছিল, তবে বুদ্ধিল যদি থাকত তাহলে এ ধরনের সন্দেহ কখনোই দেখা দিতনা। সংঘিলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অনেকদিন বুদ্ধিলের কথা মনে পড়েনি। তাকে একেবারে ভুলে যাওয়া সম্ভব ছিল না তবে এখন সে আবার প্রতি মুহূর্তে স্মরণে আসছিল।

মরুভূমিতে বিশ্রামের জন্য আমরা বেশিক্ষণ থামতাম না। কোনো দুর্ঘটনাও ঘটেনি। কোনো পালিত পশু অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জন্য সার্থর অগ্রগতি থামতে পারে না। অতিরিক্ত পশুকে অসুস্থ পশুর জায়গায় লাগিয়ে দিয়ে রুগ্ন পশুটিকে সেখানেই ছেড়ে দেওয়া হয়। সার্থবাহ প্রাণী হত্যা দেখতে পারত না, এবং মাংসের জন্য তাকে হত্যা করা তার অপছন্দ ছিল। কেউ যদি কাজের জন্য না রাখে তাহলে ছেড়ে দেওয়া পশুকে কেউ না কেউ মেরে খাবেই। অনুচরদের মধ্যেও কেউ অসুস্থ হলে সার্থ

থামেনা। স্বয়ং সার্থবাহ যদি অসুস্থ হয় তাহলেও হয়তো একদিনের বেশি সার্থ থামবে না। হয় তাকে দোলায় বসিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় অথবা কয়েকজন অনুচরদের সঙ্গে বিশ্রাম স্থলে থেকে যায়। সার্থ এগিয়ে চলে। আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো একজনের ওরকম অবস্থা হলে, আমরা অবশ্যই কেউ কাউকে ছেড়ে যেতাম না, আর কোনো বিশ্রামস্থলে অসুস্থাবস্থায় থাকলে আমাদের দশা কি হতো তা বলতে পারি না। তবে সার্থবাহ নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা করত। মরুভূমিতে যাত্রা করলে এরকম অবস্থার সম্মুখীন কখনো কখনো হতেই হয়। তবে আমরা নিরাপদেই চীন সীমান্তের দিকে এগিয়ে চলেছিলাম। মরুভূমি অতিক্রম করার সময় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন কিছু লক্ষ্য করিনি তবে সীমান্তের কাছাকাছি যাযাবরদের ডেরা এবং তাদের পশুপাল বেশি বেশি করে চোখে পড়ছিল। এদিকটাতে ঘাস, জল ইত্যাদিও বেশি পাওয়া যাচ্ছিল। শেষদিকে রাস্তার ডানদিকে খানিক হটে গিয়ে একটা সরোবর (কোষ্টীনোর) পড়ল। চারদিক থেকে বদ্ধথাকায় এদিকে জল সাধারণত লবণাক্ত হয়। এই সরোবরের জলও আমাদের পানযোগ্য ছিলনা, তবে দেখতে খুবই ভালো লেগেছিল। আর দু-এক দিনের পথ শেষেই আসবে সীমান্ত। শেষদিনে আমরা সকালেই রওনা হয়েছিলাম। দুপুর বেলা দক্ষিণ দিকে খানিকটা দূরে ধোঁয়াটে একটা কিছু দেখতে পেলাম। বোসঙ বলল, ওটাই চীনের মহাপ্রাচীর। কুচী থেকে রওনা হওয়ার সময় আমরা মহাপ্রাচীরকে লক্ষ্য রেখেই চলেছিলাম, কিন্তু মাঝখানে দিক পরিবর্তিত হয়ে যায়। কে আশা করেছিল যে আমরা পশ্চিম দিক থেকে আসতে না পারলেও উত্তরের পথে এই মহাপ্রাচীরের কাছে আসতে সমর্থ হব। সেদিন পথচলা কিছু বেশি হলো কারণ মহাপ্রাচীর দেখতে পাওয়ায় আমরা পথশ্রমকে একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম।

চীনের মহাপ্রাচীর পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বস্তু। আমাদের দেশে এবং অন্যত্রও চীনকে সাধারণভাবে লোকে মহাচীন বলে থাকে। এই নাম আজ থেকে আট শতাব্দী আগে চালু হয়েছে, যখন থেকে সেকানে চীনবংশ (২৫৫-২০৬ খ্রিঃ পূঃ) শাসন ক্ষমতায় ছিল। এই রাজবংশই প্রথম সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করে, এবং সেটা অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল। এই বংশের তৃতীয় সম্রাট শীহ-হুয়াঙ-তী (২৪৬-২১০ খ্রিঃ পূঃ) এই মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেন। তাঁর আমলেই চীন ঐক্যবদ্ধ রূপ গ্রহণ করে। প্রাচীনকালে চীনাদের জীবিকা প্রধানত কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য। মহামরুভূমি থেকে আরম্ভ করে শীত সমুদ্র (বৈকাল হ্রদ) পর্যন্ত ছিল তখন যাযাবরদের বিচরণভূমি, যা আজও রয়েছে। এই যাযাবরদের তখনকার দিনে হুণ বলা হতো। হুণ শব্দের অর্থ তাদের ভাষায় মানুষ কিন্তু চীনারা এর অর্থ করেছে দানব। এরা চিরকাল সমৃদ্ধশালী চীনের ওপরে হামলা লুটপাট করত, ভাবত, চীন আমাদের দুধেল গোরু। চীনরাজবংশের আগে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু শীহ-হুয়াং-তীর মতো সম্পদ এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা তাঁদের কারও ছিলনা, সেজন্যই তাঁরা এই তিনশো যোজন (১৬০২ মাইল) দীর্ঘ এই বিশাল প্রাচীর নির্মাণের কল্পনাও করতে পারেননি। চীনা সম্রাট তাঁর সমস্ত প্রজাশক্তিকে চাবুকের জোরে এই কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। এবং পূর্বের মহাসমুদ্র থেকে পীত নদীর পশ্চিম অর্থাৎ যাযাবরদের ভূমি পর্যন্ত এই প্রাচীর তৈরি হয়। রাস্তায় খাদ, পাহাড়,

সমতল, বন্ধুর ভূমি এসেছে কিন্তু প্রাচীর অবিচ্ছিন্ন রূপে নির্মিত হয়েছে। প্রাচীর তৈরির পর তিন লক্ষ সৈনিককে পুরস্কৃত করা হয়। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ বন্দী এবং বেগার মজুরদেরও এই কাজে লাগানো হয়েছিল। সরকারি কর্মচারীদের তাদের অপরাধের জন্য দণ্ডিত করে এখানে পাঠানো হতো; এভাবে রাজরোষে পতিত পণ্ডিতদেরও ঝুড়ি কোদাল হাতে এখানে দেখা যেত। লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছে এই প্রাচীর নির্মাণ করতে গিয়ে। অনেক বছর ধরে চলেছিল এই কাজ। আট থেকে দশ হাত চওড়া আর সহস্র ক্রোশ লম্বা এই দেয়াল কোনো সাধারণ প্রাচীর নয়। তবে শুধুমাত্র প্রাচীর দিয়ে উত্তরের যাযাবর হানাদারদের আটকানো সম্ভব নয় বলে, প্রাচীরের মাঝে মাঝে ছোট বড় দুর্গ এবং যাযাবরদের হামলার ওপর নজরদারির জন্য চৌকি ইত্যাদিও নির্মিত হয়েছিল। নদীর মধ্য দিয়ে ওই প্রাচীর নির্মাণ সম্ভব না হওয়ায় সেখানে দুই তীরে বিশেষ মজবুত কেল্লা বানানো হয়েছিল। এই প্রাচীর সাধারণভাবে সেই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে যেখান থেকে উত্তরের যাযাবরদের নির্জন ভূমি অথবা মরুভূমি কাছে পড়ে। যাদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এই প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল, সেই যাযাবর জাতির বংশধরেরা আজও বর্তমান এবং তাদের জীবন-যাত্রায় সেদিনের তুলনায় কোনো বিশেষ পরিবর্তন আসেনি এবং লড়াইয়ের ক্ষমতাও হ্রাস পায়নি। চীনবংশের আমলের মতো চীন আজ আর ঐক্যবদ্ধ নেই। চীন এখন অনেক ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, আমাদেরও প্রাচীরের মহাদ্বার দিয়ে ভেতরে যাওয়ার তাড়া ছিল। তা সত্ত্বেও কিছুক্ষণের জন্য এই বিশাল প্রাচীরকে অবলোকন করা থেকে নিজেকে আটকাতে পারিনি। মানুষের সৃষ্ট বিশাল বিশাল কৃতিকে আরও অনেক দেশে দেখেছি। পাহাড় কেটে বড়ো বড়ো প্রাসাদ এবং বিশাল মূর্তি তৈরি করা হয়েছে দেখেছি কিন্তু এই মহাপ্রাচীর এমনই এক সৃষ্টি যাকে শুধু একপলক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখা চলেনা। এর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হলে একমাস লেগে যাবে। আটটি শতাব্দী কেটে গেছে কিন্তু এখনো এই প্রাচীর এত মজবুত যে সময়ের প্রভাব এর ওপরে কিছুমাত্র পড়েনি। শীহ-হুয়াঙ-তীর কৃতি আরও সহস্র বর্ষ এভাবেই দাঁড়িয়ে থাকবে। তবে চীনের মানুষ একে দানব কিংবা অসুরদের কৃতি বলে বর্ণনা করেনা, কিন্তু আমাদের দেশে হলে চট করে ওরকম ভীতিপ্রদ কারও তৈরি বলে দেওয়া হতো। এর উপমা এক বিশাল নাগের (ড্রাগন) সঙ্গে দেওয়া চলে এবং বোধ হয় এজন্যই চীনা শিল্পকলাতে নাগের ছবি আঁকার রেওয়াজ যথেষ্ট। প্রধান নগর কলগন প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। কলগনের সামনে এক বিশাল ময়দান এবং বেশ কয়েকটি সাধারণ গোছের ঘরবাড়ি ছিল। সার্থরা তাদের পণ্য এবং পশুপাল নিয়ে ওখানে বিশ্রাম করে এবং সময়ে সময়ে ওখানে বিশাল হাট বসে যায়। বাইরে থেকে আসা পণ্য সামগ্রীর ওপরে সরকারি কর্মচারীরা শুল্ক আদায় করে আর গুপ্তচরের দল এদিক ওদিক নজর রাখে বণিকের ছদ্মবেশে কোনো শত্রুর চর এল কিনা? সেই কারণেই বিদেশীদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। আমরা দুজনও বিদেশী ছিলাম কিন্তু আমাদের মুখাকৃতি বলে দিচ্ছিল যে আমরা হুণ সন্তান নই অতএব আমাদের থেকে কোনো বিপদের আশংকাও নেই।

আমাদের সার্থবাহ কোনো সাধারণ বণিক ছিলনা, সে ছিল রাজ সম্মানিত নগর শ্রেষ্ঠী। রাজদরবারে তার প্রভাব প্রশ্নাতীত ছিল এবং দুর্গপালও তাকে জানত। সেজন্য সে আসায় সৈনিকেরা যথেষ্ট শিষ্টাচারের সঙ্গে তাকে ভিতরে আসতে অনুরোধ করে, ফলে আমাদেরও যেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। পণ্যের দেখাশোনার ভার সার্থ তার কর্মচারীদের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিল। কেনাবেচার কাজ সাধারণত তার কর্মচারীরাই করত। বহুমূল্য পণ্য সামগ্রী সঙ্গে ছিল কিন্তু বিপদের এলাকা পার হয়ে এসেছি। নগরে শ্রেষ্ঠীর নিজস্ব একটি প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদে যাওয়ার আগে সে দুর্গপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে পাঁচখানা মহার্ঘ মৃগচর্ম উপহার দিলো। তার সঙ্গে আমরাও ছিলাম। দুর্গপাল আমাদের যথেষ্ট সম্মান দেখালেন। তাঁর রাজা বেন-শ্বাস-তি (৫৫-৫৯ খ্রিঃ) বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন যার প্রভাব তাঁর মন্ত্রী, আর অমাত্যদের ওপরেও যথেষ্ট পড়েছিল। বোধ হয় সেই কারণেই দুর্গপাল ভারতীয় ভিক্ষু দেখে আমাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্মান দেখিয়েছিলেন।

এতদূর ভ্রমণের পর এখানে এসে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন অন্ধকার থেকে আলোয় এসেছি। শুধু যে এখানে এসে ভদ্র নাগরিক জীবন এবং তার পরিশীলিত ব্যবহার অনেক দিন পর অনুভব করছিলাম তাই নয়, বিস্মিত দৃষ্টিতে আরও দেখেছিলাম যে বুদ্ধশাসন এখানেও কত সমাদৃত। এই সীমান্ত শহরের প্রতি রাস্তায় অথবা গলিতে স্তূপ কিংবা মন্দির আছে। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের আবাসস্থল হিসেবে এক ডজনেরও বেশি বিহার যদি এই ছোট শহরেই থাকে তাহলে রাজধানীতে তার পরিমাণ কত হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বোসঙ বলল, এর সমস্ত কৃতিত্বই বেই (তোবা) বংশ (৩৮৬-৫২৯ খ্রিঃ) দাবি করতে পারে। এই বংশ সমগ্র উত্তর চীনে শাসনাধিকার বিস্তৃত করেছিলেন এবং সেই বংশের অনেক সম্রাট সিংহাসনে বসেও ভিক্ষু-জীবন কাটিয়েছেন। তাঁদের রাজধানী তাতুঙ-এর কাছে পাহাড়ে, সেই পাহাড় কেটে নির্মাণ করা সংঘারাম আজও বর্তমান। জন্মভূমি থেকে এতদূরে চীনের মতো সভ্য উন্নত দেশে বুদ্ধশাসনের এত মর্যাদা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু সেই সঙ্গে ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের এত সংখ্যাধিক্য দেখে খানিকটা ক্ষুণ্ণও হয়েছিলাম। তথাগত কখনোই চাননি যে দেশের অর্ধেক লোক ঘর সংসার ছেড়ে ভিক্ষু কিংবা ভিক্ষুণী হয়ে যাক। শ্রমণের ব্রত পালন করা সকলের পক্ষে সহজ নয়।

সার্থবাহর ঘরে (য়েহ) ফেরার তাড়া ছিল, আর আমাদেরও এখানে থাকার আর আগ্রহ ছিলনা। সে ভক্ত লোক ছিল, কিন্তু তার এই খেয়ালও ছিল যে আমার মতো একজন পণ্ডিত ভারতীয় ভিক্ষুকে রাজার কাছে নিয়ে গেলে, রাজা খুব খুশি হবেন। আমরা কলগনে মাত্র একদিন থেকেছিলাম। অন্যান্য দেশের মতো এখানেও নগর আর গ্রামের মধ্যে পার্থক্য আছে। ধনী-দরিদ্র শহর এবং গ্রাম উভয় জায়গাতেই বাস করে, এবং তাদের ঘরবাড়িও তদনুরূপ। তবে বাড়ির নির্মাণ রীতির মধ্যে তফাত আছে। আমি এর আগে ভারতের বাইরে এসে কাগজ দেখেছিলাম, কিন্তু এখানে তার ব্যবহার অনেক বেশি। গাছের ছাল এবং বাঁশের মণ্ড থেকে কাগজ তৈরি হয়। এগুলো অত্যন্ত হালকা এবং খুশি মতো এদিকে ওদিকে ভাঁজ করা যায়। যদিও তালপাতা কাগজের

চেয়ে অনেক বেশি মজবুত ও টেঁকসই কিন্তু সাধারণ ব্যবহারের পক্ষে তালপাতার চেয়ে কাগজ বেশি উপযোগী। যে গাছ থেকে কাগজ তৈরি হয় সে ধরনের গাছ আমাদের দেশেও আছে তবে আমাদের দেশে কাগজ তৈরি হয়না কেন কে জানে?

শীতের প্রথম মাস অতিক্রান্ত হয়েছে, আমরা প্রাচীরের দক্ষিণে চলেছি। সার্থবাহর সঙ্গে পাঁচ-ছ'জন অনুচর ছিল। তাদের কয়েকজন আমাদের সঙ্গে হেঁটেই চলছিল। আমরা এমন অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম যা প্রতি মুহূর্তে আমাকে ভারতের মধ্যদেশের কথা মনে পড়াচ্ছিল। সেইরকমই অনেকগুলো বাড়ি একত্রিত হয়ে গ্রামের রূপ ধারণ করেছে যার চারদিকে সেরকমভাবেই চাষের ক্ষেত দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়ানো। এরা শুধু ভালো জমি চাষ করতেই জানেনা, এরা বেশি ফসল ফলানোর জন্য জমিকে উর্বর করতেও জানে। গোবর ছাড়া মনুষ্য বিষ্ঠাও সার হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। মধ্যদেশে বিষ্ঠা স্পর্শ নিন্দনীয় এবং যারা সেগুলি পরিষ্কার করার কাজ করে সমাজে তাদের স্থান অতি নিম্নে, এখানে কিন্তু সেই অবস্থা নয়। প্রকৃতপক্ষে আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম যে এখানে এমন কোনো জাতি নেই যার স্পর্শ আপত্তিকর। ধনীদ-দরিদ্র, কুলীন-অকুলীন সবই আছে কিন্তু এমন বৈষম্য নেই যা সচরাচর আমাদের দেশে চোখে পড়ে। তথাগত সমস্ত মানব জাতিকে সমান এবং ভাই ভাই বলেছিলেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি সংঘজীবনে এ ধরনের সাম্যের ওপরে বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তথাগতর বংশের অনিরুদ্ধ, আনন্দ প্রভৃতি শাক্য কুমারগণ যখন তথাগতর কাছে ভিক্ষু হওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, তখন তাঁদের দেখে ক্ষৌরকার উপালির মনেও ভিক্ষু হওয়ার বাসনা হয়েছিল। তথাগত প্রথমে উপালিকে দীক্ষা দেন, যাতে উপসম্পদা লাভ করে জ্যেষ্ঠ শিষ্য হওয়ার জন্য বাকি প্রবজ্যা লাভ করা শাক্য ভিক্ষুরা তাকে অভিবাদন করে। তথাগতর শাসন আরম্ভ হওয়ার পর সহস্র বছর কেটে গেছে কিন্তু মানুষে মানুষে যে বৈষম্য তখন ছিল তা আজও বর্তমান রয়েছে। সমতা এখন একমাত্র ভিক্ষু সংঘেই দেখা যায়। কিন্তু চীনে সেরকম কোনো কঠোর বৈষম্য দেখতে পাইনি। আমি এই ধারণা নিয়ে এদেশে এসেছিলাম যে এই দেশের মানুষকে তথাগত প্রদর্শিত পথে চলতে উৎসাহিত করব, কিন্তু দেখে অবাক হলাম যে অনেক বিষয়েই তারা আগে থেকেই তথাগতর পথ অনুসরণ করে চলেছে। যদিও ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের সংখ্যা দেখে আমি অসন্তুষ্ট ছিলাম, কিন্তু ধর্মপ্রচারক হিসেবে আমার জন্য কোনো কাজই আর পড়েছিল না।

সার্থবাহ ছিন্ সম্রাটের প্রশংসা করতে কখনও ক্লান্ত হতো না। সে বারংবার বলত সম্রাট আপনাকে অত্যন্ত সমাদর করবেন। সমাদরের বিন্দুমাত্র প্রত্যাশী ছিলাম না এমন কথা জোর গলায় বলতে পারি না। তবে শুধুমাত্র তার জন্য এত কষ্ট করে বিপদসংকুল অবস্থার মধ্য দিয়ে এদেশে আসিনি। রাজসম্মান পাওয়ার অর্থ সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটানো, যা আমাকে কখনোই আকর্ষিত করেনি। এখন আমার সামনে একটাই কাজ জীবনের স্বপ্নকে সাকার করা। মহাযান চর্যার ওপরে আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এখানকার লোকের আকর্ষণও সে দিকে তার একটা প্রমাণ, এখানে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা মাংসাহার করে না এবং এই ঘটনার প্রভাব চীনে প্রবেশ করার আগেই ভালোভাবে আমার ওপরে পড়েছিল।

যে পথ দিয়ে আমরা চলেছিলাম তা ছিল রাজপথ। শতাব্দ নয় সহস্রাব্দ ধরে বোধ হয় এই পথে সার্থরা যাতায়াত করেছে, সেই সময় থেকে উত্তরের যাযাবর আর তারও উত্তরের বনচরদের জিনিসের চাহিদা এই দেশে বাড়তে থাকে। প্রতি যোজন দূরত্বে বিশ্রামের স্থান, পান্থশালা ইত্যাদি ছিল। শুধু মানুষ নয়, পশুপালেরও বিশ্রামের ভালো ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি পান্থশালারই লাগোয়া বড়ো ধরনের গ্রাম ছিল, যেখানে দোকান ছিল। আহার্য সামগ্রী তৈরি পাওয়া যেত। সার্থবাহর ইচ্ছা ছিলনা যে আমরা তার ছাড়া অন্য কারও আতিথ্য গ্রহণ করি। না হলে পান্থশালার নিকটস্থ গ্রামে কিংবা অন্যান্য গ্রামেও ভিক্ষুদের ছোট বড়ো বিহার ছিল এবং যাদের দরজা চতুর্দিক থেকে আসা ভিক্ষুদের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকত, আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করে বের হতাম এবং মধ্যাহ্নের আগেই কোথাও বিশ্রাম নিতাম। আহার এবং সামান্য বিশ্রামের পর আবার চলা শুরু হতো যাতে সূর্যাস্তের আগেই কোনো ঠিকানায় পৌছানো যায়। এ সময় কাছাকাছি গ্রামে কিংবা সংঘারামে যেতাম। যেমন দেশ তেমন বেশ। অতএব দেশ অনুসারে বেশ পরিবর্তন করতেই হয়েছে, যদিও এখানকার ভিক্ষুরা চাইতেন যে আমি মধ্যদেশের ভিক্ষুবেশেই থাকি। আমি সেই চীবর আর সংঘাটি পরেছিলাম যা দেখে লোকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে আমার প্রতি আকৃষ্ট হতো। কখনো কখনো আমার মনে হতো এই পোশাক অনাবশ্যকভাবে আমাকে লোকের কাছে অতিরিক্ত সম্মানীয় করে তুলছে। আমি জীব মাত্রেরই সেবক হতে চাই, সেব্য হতে নয়। বিনয় নিয়মের মধ্যে ব্যতিক্রম আছে, চীবর ত্যাগ করে আপৎকালে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত ভিক্ষু থাকা যায়। স্থানীয় ভিক্ষুদের সঙ্গে মেলামেশা করে দেখতাম যে আমি আমার বিচারধারা তাদের বোঝাবার মতো কিছু কিছু ভাষা বলতে পারি, এবং দোভাষী ছাড়াই এদিক ওদিক ঘুরতে পারি। ঘোরার জন্যই যার জন্ম তার তো প্রথমেই এই খেয়াল আসবে।

নিজের জন্মভূমি সর্বদাই সকলের কাছে প্রিয়। আমিও আমার উষ্ট্রপিঠসদৃশ এবড়ো খেবড়ো বন্ধুর ভূমি উদ্যানদেশকে ভালোবাসি, বিশেষত সেখানকার দেবদারু গাছে ঢাকা পাহাড় এবং শীতে দেখা যেত এমন সব হিমাচ্ছাদিত শৈলশিখবরগুলোকে, তারপরেই আমার প্রিয় জায়গা তথাগতর জন্মভূমি মধ্যদেশ, যার সঙ্গে এদেশের অনেক মিল। তবে এখানে শীতে কোথাও কোথাও তুষারপাত হয় যার ফলে গ্রীষ্মে মধ্যদেশের মতো দুঃসহ গরম এখানে পড়ে না। এখানকার ঋতু সেখানকার চেয়ে মানুষের পক্ষে বেশি অনুকূল। তবে চীন দেশের সর্বত্র এক রকমের নয়। সেখানেও বড়ো বড়ো পর্বত এবং বিশালায়তনের নদী আছে। এদেশের পীত নদী (হোয়াংহো) মধ্যদেশের গঙ্গার চেয়েও বড়ো। প্রথমে যখন শুনেছিলাম তখন বিশ্বাস করিনি, পরে নিজে য়েহ শহরের দক্ষিণে সেই বিশাল নদীকে প্রত্যক্ষ করেছি।

যদিও বোসঙ আমার সঙ্গেই ছিল, তবে এখন আমার যাত্রার সময় শুধু তার সঙ্গে কথাবার্তাতেই কাটত না। আমার অন্তর্মুখ প্রবৃত্তি আমাকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখত এবং আমি আমার কল্পনার মধ্যে ডুবে থাকতাম। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক হিতকর চিন্তা করতাম যেগুলোর কোনোটাই বাস্তবায়িত হতো না। তখনই চিন্তার সংকটে পড়তাম এবং বুদ্ধিলের কথা মনে পড়ত। আমরা দুজন একত্রে থাকলে যে কোনো কর্মপন্থা

নির্ণয় করতে কোনো অসুবিধাই হতো না। আমার এখানে এসে নিজেকে একা মনে হতে লাগল। একপক্ষে ভালো ছিল যে সার্থবাহ আমাদের সঙ্গে চলছিল না, না হলে সে আমার মুখ গম্ভীর কিংবা উদাসভাব দেখে নানা প্রশ্ন করত। বোসঙ ছিল সোজা সরল প্রকৃতির ভিক্ষু। সে আমার অনুরক্ত ছিল কিন্তু আমার মানস সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিলনা। সে অবশ্যই লক্ষ্য করেছিল যে মরুভূমির যাত্রাপথে আমার মনোভাব যেমন ছিল এখন তেমন নেই। কিন্তু এদিকে সে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কারণ খুঁজে পায়নি বলেই মনে হয়। এটা আমার পক্ষে ভালোই হয়েছিল। যদি সে না হয়ে সংঘিল অথবা শান্তিলের মতো প্রতিভাবানরা হতো তাহলে অবশ্যই এই অবস্থা তাদের চোখ এড়াত না এবং তারা অবশ্যই প্রশ্ন করত। হয়তো প্রশ্ন উঠলে ভবিষ্যৎ জীবন এবং কর্মপন্থা নির্ণয়ে কিছু সুবিধা হতো, জানিনা তারা সে রকম যোগ্য ছিল কিনা। তবে একথা ঠিক তারা থাকলে আমরা এই অবস্থাতেও অধ্যাপনার কাজ চালিয়ে যেতেই হতো। এবং তাতে খানিকটা সময় ভালোভাবে কেটেও যেত। বোসঙ কেবল অনুচর ভিক্ষু হওয়ারই যোগ্য ছিল আমার বৌদ্ধিক সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে ছিল না। সে আমার স্নেহের পাত্র ছিল কিন্তু তার সঙ্গে মিত্রতা সম্ভব ছিল না, কারণ আমাদের দুজনের চিন্তার স্তরে অনেক ব্যবধান ছিল।

এক সপ্তাহ পরে ছি বংশের (৫৫০-৫৫৭ খ্রিঃ) রাজধানী য়েহতে পৌঁছালাম। আমার মনে হয় সীমান্ত শহর থেকে রাজধানীতে আসতে যে সময় লাগল, মরুভূমি পার হতে তার চেয়ে কম সময় লেগেছিল। আমার সামনে তখন এক বিশাল নগরী যেখানে অসংখ্য অট্টালিকা, হাট, বাজার ইত্যাদি সহ অনেক চিত্তাকর্ষক বস্তুর সমারোহ। কিন্তু এই বিশাল নগরী আমাকে মুগ্ধ করতে পারেনি, তার চেয়ে বরং সেই মহামরুভূমি আমাকে বেশি আকৃষ্ট করেছিল। আমি শারীরকভাবে সেই নগরীতে থাকলেও আমার মন ছিল অন্যত্র। ভাবছিলাম, এত কষ্ট করে আমি কেন এলাম? তারপর নিজের মনেই প্রশ্নের উত্তর পাই, বুদ্ধিলের সঙ্গে তুমি এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছিলে যে এদেশে এসে কাজ করবে। আবার ভাবতাম, যেখানে অনেক বেশি দুঃখ কষ্ট আছে সেখানেই আমার প্রয়োজন যথার্থ হবে। আমার সমগ্র জীবন এবং শক্তি ব্যয় করে যদি দুটি প্রাণীরও দুঃখের ভার কিছুটা লাঘব করতে পারি সেটাই বরং হতো আমার জীবনের সার্থকতা। অবশ্য একথা সত্য যে এখানে দুঃখ কষ্ট যত, শীত সমুদ্রের বনচরদের মধ্যে কিংবা যাযাবরদের আস্তানাতে তত দুঃখ কষ্ট ছিল না, তারা সেই মাত্রার দুঃখ কষ্ট বরদাস্ত করতে পারেনা, যতটা নাগরিক কিংবা গ্রামীণ জীবনের লোক পারে। অতএব আমার কাজের অভাব কি?

সার্থবাহর সঙ্গে নগরে প্রবেশ করার পর আমার মনে হলো আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। এত হতাশাগ্রস্ত ইতিপূর্বে কখনও হইনি। নগরীতে দ্বাররক্ষীরা সহজেই রেহাই দিয়েছিল কারণ আমার সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং নগরশ্রেষ্ঠী। কোথায় যাব, কোথায় থাকব, ইত্যাদি প্রশ্ন আগেও করিনি তখনও করলাম না। সার্থবাহ নিজেই বলল– চলুন আমার গৃহকেই পবিত্র করবেন। আমার বলা উচিত ছিল যে, না আমার জন্য কোনো সংঘারামে ব্যবস্থা করলেই হবে, কিন্তু তখন যেন কেউ আমাকে একটা

অদৃশ্য দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি কোনো কথা না বলে তাকে অনুসরণ করলাম। অনেক পথ ঘুরে আমরা বেশ দূরে চলে গেলাম। নগরীর একপ্রান্তে রাজপ্রাসাদ। আমরা উত্তরের নগর দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেছিলাম, আর এ জায়গাটি ছিল তার বিপরীত দিকে। য়েহকে চীনের সর্ববৃহৎ নগরীর মধ্যে গণ্য করা হয়না, সেই সম্মানের দাবিদার ছঙ-আন এবং লো-আঙ-এর মতো শহর। প্রথমে এটি এক সামন্ত রাজার রাজধানী ছিল কিন্তু বিগত সাত বছর ধরে য়েহ ছিঙ বংশের রাজধানী। সেই কারণেই এখানো তেমন প্রসার লাভ করেনি। রাস্তাঘাট অপ্রশস্ত এবং বাঁকাটেরা। পথের পাশে তিনতলা, চারতলা বাড়ি। এসমস্ত বাড়ির নিচের তলায় শুধু বিপণি। এত বিপণি দেখে আমার মনে হলো নগরীর সবাই যদি দোকানদার হয়ে থাকে তাহলে এত জিনিসপত্র কারা কেনে? তবে ভাবনাটা নিরর্থক ছিল। হতে পারে বিপণির সংখ্যা ভারতের যে কোনো নগরীর চেয়ে বেশি কিন্তু রাজধানী হওয়ার কারণে এখানে প্রচুর শিল্পকারের বাস, তাছাড়া বাইরে থেকে প্রচুর লোক নিত্যদিন যাওয়া আসা করে। শহরের কাছাকাছি গ্রামের লোকও এখানেই কেনাকাটা করে।

অবশেষে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত এক সড়কের ধারে এক ফটকের ভিতরে আমরা প্রবেশ করলাম। সার্থবাহ সেই প্রাসাদেই বাস করে। ফটকের পরই বিশাল আঙিনা যার দুপাশে ঘোড়া এবং অন্যান্য পশুদের থাকার জায়গা। সামনে বিশাল রাজপ্রাসাদের মতো পাঁচতলা বাড়ি। বাড়ির লোকেরা আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিল সেজন্য সকলেই তার অভ্যর্থনার জন্য তৈরি ছিল। সার্থবাহর স্ত্রী পুলকিত চিত্তে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হলো। তার দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ এবং অন্যান্য পরিজনেরাও তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। এই স্বাগত অনুষ্ঠানের মধ্যেও সার্থবাহ আমার কথা ভোলেনি অতএব অভ্যর্থনার খানিকটা ভাগ আমিও পেলাম। তিনতলার একটি সুন্দর ঘর আমার জন্য বরাদ্দ হলো। কামরার কাছেই শৌচালয়, যা ছিল অতীব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার মনে হলো চীনা জীবন-যাপনের পূর্ণতা এখানেই। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করার পর মুহূর্তেই আমার মনে হলো, আমার কোনো সংঘারামে ঠাঁই নেওয়া উচিত ছিল। ভিক্ষুর পক্ষে নগরবাস, কিংবা কোনো গৃহপতির আতিথ্য গ্রহণ করা যতদূর সম্ভব পরিহার করা চলা উচিত।

ব্যস্ত জীবন (৫৫৮-৫৭৭ খ্রিঃ)

জানিনা কেন য়েহতে আসার প্রথম দিনে আমার মন অত উদাস হয়েছিল। ভবঘুরে অভ্যাসের বিপরীত হলো কোথাও কোনো নতুন দেশে গিয়ে মানসিকভাবে উদাস হওয়া অথবা ক্ষুব্ধ হওয়া। ভবঘুরের প্রকৃতি হবে যেখানে যাবে সেখানকার মানুষের সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যেই একাত্ম হয়ে উঠবে। অবশ্য কয়েকটা দিনই ওরকম মনোভাব ছিল। সার্থবাহর সঙ্গে রাজ দরবারেও গেলাম। সম্রাট বেন্-স্বেণ্ (৫৫৫-৫৫৯ খ্রিঃ) আমাকে অত্যন্ত সাদরে স্বাগত জানালেন। আমার সম্বন্ধে সার্থবাহর কাছে তিনি সমস্ত কিছুই জেনেছিলেন। আমার অসাধারণ ভ্রমণ কাহিনি শুনে আমার সাহসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। সার্থবাহর প্রাসাদে আমি কয়েকদিন মাত্র ছিলাম। সম্রাট স্বয়ং আমাকে

সেখানে সবচেয়ে বড়ো এবং মর্যাদাপূর্ণ থিয়েন্-পিঙ বিহারে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার সমস্ত ব্যবস্থা স্বয়ং সম্রাটের তত্ত্বাবধানে হয়েছিল এবং মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ ছিল যেন ারা যে কোনো প্রয়োজনে আমাকে সাহায্য করে।

মহাচীন তখন ঐক্যবদ্ধ একটি দেশ ছিলনা, সে তখন উত্তর এবং দক্ষিণ দুটি রাজ্যে বিভক্ত। তবে বিশাল এই মহাদেশ দুভাগে ভাগ হলেও বিশালায়তনেরই ছিল। পীত নদীর উপত্যকা ছিল উত্তরে আর ইয়াং-সীর উপত্যকা ছিল দক্ষিণে। মহাপ্রাচীর উত্তরের যাযাবরদের হামলা থেকে রক্ষার জন্য করা হয়েছিল, কিন্তু শত্রুকে সামরিক শক্তি দিয়েই আটকানো যায়, স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম বাধা তাদের গতি ব্যাহত করতে পারে না। হুণদের বংশজেরা শত্রু অথবা মিত্রভাবে পীত নদীর উপত্যকাতে চিরকালই আসত। তোপা বংশ দেড়শো বছর (৩৮৬-৫২৯ খ্রিঃ) ধরে সমগ্র উত্তর চীনের একচ্ছত্র শাসক ছিল। চীনের প্রাচীর যে কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিল সে কাজ সম্পন্ন করেছিল চীনের জনতা এবং তার পরম্পরা। সমুদ্রে যেমন নদী তার পূর্বনাম, রূপ সহ বিলীন হয়ে যায় ঠিক সেইভাবে শত্রু অথবা মিত্র যে ভাবনা নিয়েই বাইরে থেকে এসেছে, কিছুদিনের মধ্যেই তারাও চীনা হয়ে গেছে। হুণ বংশের পতনের পর (২২০ খ্রিঃ) উত্তরে বেই, দক্ষিণে বু আর পশ্চিমে ও নামের তিন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। বেই-র এক মন্ত্রী ক্ষমতা দখল করে ৫১ বছর পর্যন্ত (২৩৫-৩১৬ খ্রিঃ) সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করে চীন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর প্রায় সত্তর বছর অরাজকতা, মাৎস্যন্যায় অবস্থা চলতে থাকে, যতদিন না ৩৮৬ খ্রিঃ তোপা (শিয়ন-পী) বংশ রাজশক্তি নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। এরা কিছুকালের মধ্যেই পে-বেই (উত্তরী বেই) নামে প্রকৃতপক্ষে চীনের অধিবাসী হয়ে যায়। য়ুন-কঙ বর্তমানের তাতুঙ-এর কাছে মেঘগিরি নামে তাঁর প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই পাহাড়কে খোদাই করে যে অপূর্ব সংঘারাম তৈরি করা হয়েছিল তা আজও মানুষকে চমকিত করে। এই বংশেরই আরেকজন সম্রাট শ্যাউ-বেন্ (৪৭১-৫০০ খ্রিঃ) তাঁর প্রথম রাজধানী পরিত্যাগ করে লোয়াংগ্রতে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। সীমান্তের কাছে বসবাসের জন্য হুণ বংশের যেটুকু প্রভাব ছিল, তাকে কাটিয়ে তোপা বংশ প্রকৃতপক্ষে সর্বতোভাবে চীনা হয়ে গিয়েছিল। মানুষের মতো রাজবংশের মধ্যেও তারুণ্য এবং জরা উভয়ই দেখা যায়। এইভাবেই পেতেই বংশও একদা পূর্ব বেই (তুঙ-বেই) এবং পশ্চিমী বেই এই দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। দুটোই ছিল তোপা বংশের শাখা, যা কিছু দিন রাজত্ব করার পরই রাজদরবারে চীনা মন্ত্রীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত পেই-চী (উত্তরচি ৫৫০-৫৫৭ খ্রিঃ) আর পেই-চাউ (উত্তর চাউ ৫৫৬-৫৮১ খ্রিঃ) বংশের কাছে রাজ্য ভার ছাড়তে বাধ্য হয়। পেই-চী বংশ সর্বসাকুল্যে সাতাশ বছর রাজত্ব করে তার মধ্যে আমাকে যিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন সেই সম্রাট বেন-শুবেন-তীর (৫৫০-৫৬৪ খ্রিঃ) রাজত্বকালও পড়ে। তাঁর প্রথম উত্তরাধিকারী ফেই-তী একবছরও সিংহাসনে আসীন থাকতে পারেননি, তৃতীয় শ্যাউ-চাউ (৫৬০-৫৬১ খ্রিঃ) এবং বু-চাঙ-তী (৫৬১-৫৬৪ খ্রিঃ) সামান্য সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। একমাত্র পঞ্চম সম্রাট হাউ-চূ বারো বছর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(৫৬৫-৫৭৭ খ্রিঃ) এর পরও আরও দুজন শাসক খুবই অল্প সময়ের জন্য ক্ষমতায় এসেছিলেন তবে তাঁদের শাসন কালের সঙ্গে অনেকটা আগুন লাগা বাড়ির তুলনা করা চলে, যা কিনা যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। এরপর এই বংশকে বিনাশ করে পে-চাউ (উত্তর-চাউ) বংশ এই রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয় এবং য়েহ আর রাজধানী থাকেনি, ছাঙ আন্ থেকে একজন সামন্ত শাসককে এখানে পাঠানো হতো।

য়েহর রাজবংশ সর্বসাকুল্যে সাতাশ বছর শাসন করেছিল, এবং বংশ প্রতিষ্ঠার অষ্টম বর্ষে (৫৫৮ খ্রিঃ) আমার চল্লিশ বছর বয়সে আমি ওখানে পৌছাই এবং পরবর্তী উনিশ বছর অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে সেখানে কাটাই। আমার উনষাট বছর বয়সে আমি য়েহ ছাড়তে একরকম বাধ্য হই। চীনে একদিকে যেমন তথাগতর শাসনের অনুগামী রাজা বা সামন্ত ছিল, তেমনই তাদের প্রচণ্ড বিরোধী এমন গোষ্ঠীরও মাঝে মধ্যেই উদ্ভব হতো। তারা মন্দির ভাঙত, ধাতুর লোভে মূর্তিগুলোকে গলিয়ে ফেলত, ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের কাষায় বস্ত্র ত্যাগ করে গার্হস্থ জীবনে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করত। কখনো এমনও হয়েছে যে তাদের আদেশ অমান্য করায় ভিক্ষুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হয়েছে। পে-বেই বংশের সম্রাট তাই-বূ (মহাবীর ৪২৪-৪৫১ খ্রিঃ) এরকম আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে আমাদের হাজার হাজার গ্রন্থকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। তাঁর সাতাশ বছরের শাসনের শেষে মনে হতো যে তথাগতর শাসন বোধ হয় এদেশ থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেলো। কিন্তু কোনো আদর্শকে এত সহজে নষ্ট করা সম্ভব নয়। বিশেষত সেই আদর্শ যদি জনহিতের পক্ষে এবং সত্য হয়ে থাকে। তাই-বূ-র মৃত্যুর পরেই হেমন্তকালের রিক্ত বনস্পতি যেমন বসন্ত সমাগমে নবরূপে সেজে ওঠে ঠিক তেমনভাবেই রাজধানী লোরঙ সহ সমস্ত দেশই আবার ভিক্ষু ভিক্ষুণীতে ভরে উঠেছিল। রাজধানীর চারদিকে সূত্রপাঠের ধ্বনি শোনা যেত। অর্ধশতাব্দীর মধ্যে (৫০০ খ্রিঃ পর্যন্ত) এই বৃদ্ধি চরমে ওঠে। রাজধানীর এক তৃতীয়াংশ বাড়ি মন্দিরে পরিণত হয়। শহরে এমন একটিও পথ ছিলনা যার ধারে অন্তত একটি বুদ্ধমন্দির ছিল না। বিখ্যাত প্রাচীর থেকে আরম্ভ করে বাজার সর্বত্র তথাগতর উপস্থিতি চোখে পড়ত। এমন কি মদ্যপানের শৌণ্ডিকালয় থেকে আরম্ভ করে মাংসের দোকানের পাশেও সংস্কৃত উচ্চারণে সূত্র পাঠ শোনা যেত। উত্তর বেইয়ের শেষ জীবনে সেখানে ২০ লক্ষের মতো ভিক্ষু ভিক্ষুণী এবং ৩০ হাজার বুদ্ধমন্দির ছিল। এগুলি সবই শ্রদ্ধার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি সে কথা আমিও স্বীকার করি। ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা নিজেদের জন্য খাদ্যবস্তু উৎপাদন করেনা, তারা অন্যের উৎপাদনে জীবন নির্বাহ করে। শ্রদ্ধা ভক্তি যখন বেড়ে যায় তখন তাদের ভাগ্যে দান দক্ষিণাও বেশি জোটে এবং সাংসারিক দৃষ্টিতে দেখলে তাদের জীবন তখন বেশ সুখেই কাটে। এরকম অনায়াসলব্ধ সুখী জীবনের লোভে অনেক অনধিকারীও কাষায় বস্ত্র পরে নেয় এবং তাদের কদাচার ও দুরাচারের দায় বুদ্ধ শাসনের ওপরে পড়ে। এজন্যই ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের সংখ্যা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমিত রাখার জন্য ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীদের দীক্ষা দেওয়ার সময় খুব ভালো করে পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত। তাদের সেই দুরাচারের কারণেও অনেক সময় রাজা বা সামন্তরা বুদ্ধ শাসনের বিরোধী হয়ে ওঠে।

আমি থিয়ন-পিঙ বিহারে থাকতাম। বোসঙও আমার সঙ্গেই ছিল। সেখানেই পরিচয় হওয়া ভিক্ষু ফা-চে আমার কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সহায়ক হয়েছিলেন। চীনে কন্-ফু-জু (কনফুশিয়াস ৫৫১-৪৭৮ খ্রিঃ পূঃ) এবং লাঙ-জূ (লাও-ৎসে) নামে দুজন দার্শনিক এদেশে সেই সময়েই জন্মেছিলেন যখন শাক্যমুনি মধ্যমণ্ডলে তাঁর মহান উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। কন-ফুশির শিক্ষা হলো সম্পূর্ণ ইহলৌকিক। তিনি মানুষকে শান্ত থাকতে, পিতা-মাতার কথা শুনে চলতে বিশেষ করে রাজার আদেশ বিনা প্রতিবাদে নতমস্তকে পালন করার শিক্ষা দিয়েছিলেন। লাও-জু একজন ধর্মাচার্য ছিলেন। তাঁর মতেও ভিক্ষু ভিক্ষুণী ছিল। দেশজ হওয়ার কারণে এই মতবাদের ওপরে এদেশের লোক বেশি আকৃষ্ট হবে এটাই স্বাভাবিক। এই দুই আচার্য বৌদ্ধধর্মের বৃদ্ধিকে কোনো ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেননি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে যখন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের মধ্যে অধঃপতন দেখা দিলো তখন ওই দুই মতের অনুগামীরাও বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি সাধনে ব্রতী হলো। বুদ্ধের ধর্ম অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করা শেখায় না। বৌদ্ধধর্মের এই ভাবও তাদের কাছে ভয়ের ছিল, তারা বলত তোমরা আমাদের গিলে ফেলার জন্য এরকম উপায় বের করেছ।

শত্রু, রাজা এবং সামন্তরা যত বেশি বৌদ্ধ বিহার, মন্দির এবং মূর্তি ধ্বংস না করত তার চেয়ে অনেক বেশি ধ্বংস করত বইপত্র। আবার সুযোগ পাওয়া মাত্রই বুদ্ধ ভক্তরা এগুলিকে সংগ্রহের কাজে লেগে যেত। গ্রন্থরক্ষার কাজটিও তারা অতি যত্নে এবং তৎপর হয়ে করত।

এখানকার সম্রাট যেহেতু বৌদ্ধ শাসনে আস্থাশীল ছিলেন, অতএব তাঁর সাত-আট বছরের শাসন কালের মধ্যেই প্রচুর গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। বিহারে অবস্থানের প্রথম পর্বেই সম্রাট তাঁর সংগ্রহ থেকে তাল ও ভূর্জ পাতায় লেখা অনেক সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। য়েহতে এই বংশের রাজত্বকালে আমিই ছিলাম একমাত্র ভারতীয় ভিক্ষু যে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিল। তবে আমার এখানে আসার ষোলো-সতেরো বছর আগে কয়েকজন ভারতীয় ভিক্ষু পূর্বী বেই (তুঙ-বেই) রাজত্বকালে (৫৩৪-৫৫০ খ্রিঃ) বেশ কিছু গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। বারানসী গৌতম প্রজ্ঞারুচি প্রায় সতেরো আঠারোটি গ্রন্থের অনুবাদ করে আমাকে পথ দেখিয়েছেন। আমাদের উদ্যানেরই অধিবাসী উপশূন্যও কিছু গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। প্রজ্ঞারুচির সহকর্মী আমাদের উদ্যানেরই আরেকজন ভিক্ষু বিমোক্ষপক্ষও কতিপয় গ্রন্থের ভাষান্তর করেছিলেন। বিমোক্ষপক্ষকে এখানকার লোক তথাগতর বংশীয় অর্থাৎ শাক্য কুলোদ্ভব মনে করত। শক এবং শাক্য এই দুই বংশের মধ্যে গুলিয়ে ফেলার ব্যাপারটা অনেককাল ধরেই চলে আসছে। ধর্মবোধি আরেকজন ভারতীয় ভিক্ষু যিনি 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র' সংস্কৃততে অনুবাদ করেছিলেন। আজ থেকে কয়েকদিন আগে আমি য়েহতে এসে এই অনুবাদ গ্রন্থটিকে মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা শুরু করি। চীনা ভাষায় আমার তেমন দখল ছিল না, যদিও কাজ চালাবার মতো কথাবার্তার ভাষা খানিকটা শিখেছিলাম। যদিও আমার ভাষাজ্ঞান বাড়াবার চেষ্টা সবসময়েই ছিল, তা সত্ত্বেও কোনো চীনা পণ্ডিতের সাহায্য ছাড়া

অনুবাদের কাজ করা সম্ভব ছিল না। ফা-চে এই কাজের পক্ষে অত্যন্ত যোগ্য ছিলেন, এবং অন্য অনেকেও আমার সহায়তায় রাজি ছিলেন। য়েহতে থেকে কৃত অনুবাদগুলি দেখতে আমার কয়েক মাস সময় লাগল। সাহায্যকারীর সঙ্গে আমিও অনুবাদের কাজ এখন করতে পারি, এরকম আত্মবিশ্বাস আমার মধ্যে এসে গিয়েছিল।

যদিও য়েহতে আমি একা ভারতীয় ভিক্ষু ছিলাম, কিন্তু উত্তর এবং দক্ষিণ চীনে অনেক ভারতীয় তখন এই কাজে লেগেছিল। তথাগতর উপদেশ যতদিন সংস্কৃত ভাষায় ছিল ততদিন সেই উপদেশ তাদের কাছে একটি বন্ধ বইয়ের আকারে ছিল। অতএব সমস্ত জায়গাতেই ভারতীয় এবং দেশীয় ভিক্ষুরা এই ভাষান্তরের পূণ্যকাজে নিজেদের সর্বতোভাবে নিয়োজিত করেছিল। উত্তর চাউ বংশের রাজধানী ছঙ-আনে গুণভদ্র, মগধের জ্ঞানযশ যশোগুপ্ত এবং জ্ঞানগুপ্ত এই কাজেই ব্রতী ছিলেন। প্রথম বছরে (৫৫৮ খ্রিঃ) আমি 'চন্দ্রদ্বীপ সমাধিসূত্র', 'মহাকরুণাপুণ্ডরীক সূত্র', 'সুমেরুগর্ভসূত্র' এবং 'প্রদীপদানীয়সূত্র' অনুবাদ করি। এরপর আমার ওপরে আরও কাজের ভার পড়ে যার ফলে আর দ্রুত গতিতে ভাষান্তরের কাজ করা সম্ভব হয়নি, শুধুমাত্র তিনটি গ্রন্থেরই অনুবাদ করতে সমর্থ হই সেগুলো হলো 'অভিধর্ম-হৃদয়শাস্ত্র' (৫৬৩ খ্রিঃ) 'চন্দ্রগর্ভসূত্র' (৫৬৬ খ্রিঃ) 'পিতাপুত্র সমাপমসূত্র' (৫৬৮ খ্রিঃ)।

এখানে আসার পর মাত্র বছর খানেক কেটেছে, আমি পূর্বোক্ত চারখানা গ্রন্থের অনুবাদের কাজ সমাধা করেছি এমন সময় সম্রাট বেন-শ্বেন আমাকে তাঁর রাজ্যের সমস্ত ভিক্ষুদের সংঘনায়ক পদে অধিষ্ঠিত করলেন। আমি এ ধরনের পদপ্রাপ্তির আশা রাখতাম না, এবং এর আগে এই পদ গ্রহণে অস্বীকৃতিও জানিয়েছিলাম, কিন্তু সম্রাট বললেন আপনার মতো বৌদ্ধশাসনের প্রসারকামী ব্যক্তি যদি সংঘের নিয়ন্ত্রণের ভার নিতে অস্বীকার করে, তাহলে কে সেই কাজের দায়িত্ব নেবে? নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আট-ন'-বছর কেটে গেলো। নতুন রাজবংশের মনোমতো নতুন ভিক্ষু সংঘ হওয়া উচিত ছিল। তাহলে রাজবংশের গরিমা বাড়ে। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশ চাউদের রাজধানী ছাঙ-আনে নিজস্ব সংঘরাজ্য ছিল যার নিয়ন্ত্রণে সহস্রাধিক সংঘারাম এবং সেই পরিমাণ ভিক্ষু ছিল। আমি জানতাম সম্রাট ছী আমাকেই সংঘনায়ক বানাতে চান। আমি যতই নিজেকে ওই পদের অযোগ্য মনে করিনা কেন কিন্তু সম্রাট এবং অনেক ভিক্ষু আমাকে ওই পদের উপযুক্ত বিবেচনা করতেন এবং চাইতেন যে আমি সেটি গ্রহণ করি। দূর থেকে কোনো বিষয়ের পক্ষে অথবা বিপক্ষে রায় দেওয়া এক জিনিস আর বিষয়ের মধ্যে ঢুকে তার দোষগুণ সম্বন্ধে মতামত দেওয়া আরেক জিনিস। আমি অনেক শংকিত চিত্তে এই পদভার স্বীকার করলাম। নিয়ন্ত্রণকারীকে সর্বদা কোমল হৃদয় হলে চলে না কখনো কখনো তাকে কঠিন হৃদয়ও হতে হয়। এরকম অবস্থায় সকলকে কিভাবে বন্ধুরূপে রাখা যায়?

আমার পথ নিষ্কন্টক এবং সরল ছিল না, পৃথিবীর মাটিতে যদি আমি উঁচু নিচু বন্ধুর পথে সহস্রাধিক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে আসতে পারি তাহলে এখানে কর্মক্ষেত্রে কাপুরুষতা দেখানোর কোনো অর্থ হয় না। প্রথমেই বলেছি যে আমার য়েহতে উনিশ বছরের জীবনে প্রথম বছরেই কিছু অনুবাদের কাজ করেছিলাম, বাকি জীবনে সাধারণ

তিনটি গ্রন্থের ভাষান্তর করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে, অথচ তা করতে মাত্র কয়েকমাস লাগা উচিত ছিল। ছী রাজবংশের সন্তুষ্টি ছিল যে তাঁরাও অনেক গ্রন্থের অনুবাদে প্রোৎসাহন দিয়েছেন। হয়তো আমার হৃদয়ের কোনো কোণে এক ধরনের অমরত্বের সন্তুষ্টি ছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার অমরত্বে নয়, অনিত্যতাতেই অটল বিশ্বাস ছিল। অনন্তকালের প্রতি আমার ততটা মোহ ছিলনা যতটা ছিল তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটিয়ে শান্তি পাওয়ার মধ্যে। আমার বন্ধু বুদ্ধিলের হাতে লেখা পুঁথি 'প্রমাণ সমুচ্চয়' এখনো আমার হাতে ছিল। যাকে আমি মৃত্যুর সময়ও আমার কাছ থেকে পৃথক করতে পারব না। আমি মহাযানের গ্রন্থগুলিরই অনুবাদ করেছিলাম কারণ বোধিসত্ত্বের জীবন আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করত। যদি কোনো প্রাণীর ক্ষণিকের সুখের জন্যও আমার জীবন কাজে লাগে, তাতেও আমার অত্যন্ত আনন্দ ছিল। আমি রোজ অবদানের (জাতক) পারায়ণ করতাম। আর্যশূরের 'জাতকমালা' গ্রন্থটি কিছু চেষ্টার ফলে পেয়েছিলাম, যেটি আমি রোজ পড়তাম। তথাগত তাঁর বোধিসত্ত্ব জীবনে বিভিন্ন জন্মে কিভাবে তাঁর শরীর উৎসর্গ করেছিলেন, কখনো ক্ষুধার্ত বাঘিনীর মুখে নিজেকে সমর্পণ করে, কখনো বা ক্ষুধার্ত পথিকের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে। আমি বোধিসত্ত্বব্রত পালনে ব্রতী হয়েছিলাম।

যত আমি আমার ব্রতে এগিয়ে চলেছিলাম, তত আমার হৃদয় করুণায় ভরে উঠছিল। নিজের চোখে কারও দুঃখ কষ্ট দেখতে আমার কষ্ট হতো। য়েহ নগরীতে কিংবা তার উপকণ্ঠে, কোনো গ্রামে হয়তো গেলাম, সেখানে কোনো অনাথ বালককে হয়তো দেখলাম, তখন তাকে ছেড়ে এক পাও অগ্রসর হতে মনে চাইত না। কোনো স্ত্রী লোককে অসুস্থ দেখলে তাকে সুস্থ করার জন্য কোনো উপায় বের করা আমার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াত। এখানে থেকে আমি যে বিদ্যাটির বিশেষ চর্চা করেছিলাম তা হলো আয়ুর্বেদ (চিকিৎসাশাস্ত্র)। চীনের ভিক্ষুরাও জনহিতকর ব্রতের মধ্যে চিকিৎসাকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিত। ভিক্ষু হতে আগ্রহী তরুণ তরুণীদের চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু জ্ঞান থাকাটা সেখানে আবশ্যিক ছিল। কনফু-জূ এবং লাউজূর অনুগামীরা এর মধ্যেও বৌদ্ধদের কূটনীতি দেখতে পেত। কিন্তু কেউ এই কাজে সন্দেহ প্রকাশ করলেই আমরা একে ত্যাগ করতে পারিনা। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা যতদূর সম্ভব দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি কাজেই এখন যত বাধাই আসুক না কেন, এমন কি প্রয়োজনে প্রাণ বলিদান দিতে হলেও পিছু হটা সম্ভব নয়। এই সেবা ব্রতের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? আমি অবশ্য নিজেকে খুব একটা কুশল বৈদ্য মনে করতাম না। বোধ হয় কোনো বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্য মানুষের মধ্যে কিছু প্রকৃতি দত্ত ক্ষমতা থাকে, আমার মধ্যে যার অভাব ছিল। তবে এর জন্য আমি অখুশি নই, কারণ যদি আমি খুব ভালো বৈদ্য বা চিকিৎসক হতাম, তাহলে এই কাজেই এত ব্যস্ত থাকতে হতো যে অন্য কোনো কাজে মন দিতেই পারতাম না এবং সমগ্র ছী রাজ্যের চিকিৎসার দায়িত্বই হয়তো আমার কাঁধে এসে পড়ত, যার উপযুক্ত আমি একেবারেই ছিলাম না। তবে এটুকু বলতে পারি যে আমার প্রচেষ্টার ফলে চিকিৎসার যতটা সুব্যবস্থা ছী রাজ্যে ছিল অতটা চীনের অন্য কোনো রাজ্যে ছিলনা। ভিক্ষুদের সংঘারামে আগেও চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল তবে এখন

তাকে আরও বহুমুখি এবং ব্যাপক করা হয়েছিল। সর্বত্র রোগীকে রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। ছী রাজবংশের সম্রাট আমাকে সুখ-সম্পদে রাখতে চাইতেন। কিন্তু সেরকম জীবন-যাপনে আমার কোনো কালেই আকর্ষণ বা আনন্দ ছিল না। ভিক্ষুদের বিনয়শাস্ত্রে সোনা রূপা সঞ্চয় বর্জনীয়, বোধ হয় একথা ভেবে যে ওই সম্পদের মধ্যে আকিঞ্চন আছে। আর্থিক বিচারে যারা সবচেয়ে নিচে, ভিক্ষুদের কাজ সেখানেই। সেজন্য প্রয়োজন হলে নতুন বস্ত্রে চীবর না বানিয়ে পথে ফেলে দেওয়া ছেঁড়া ন্যাকড়া কুড়িয়ে সেলাই করে শরীর আচ্ছাদিত করে। সোনা, রূপা বা অর্থকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম এই অর্থে নয় যে আমি তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করবনা। হ্যাঁ, তা থেকে একটি কপর্দকও নিজের জন্য ব্যয় করতে আমার প্রচণ্ড কুণ্ঠা ছিল, তবে অপরের হিতে এর প্রয়োজন তো আছেই। আমি য়েহতে এসে সংঘনায়ক হওয়ার পর প্রতিজ্ঞা করি শুধু ভিক্ষান্নেই জীবন যাপন করব, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে চীবর বানিয়ে পড়ব। এর প্রধান কারণ ছিল আমি রাষ্ট্রের দান যথাসম্ভব কম গ্রহণ করব এবং কারও ওপরে নিজের বোঝা চাপাব না যাতে ভোগ তৃষ্ণা মনের মধ্যে কখনো উদয় না হয়।

পুরো পাঁচ বছর লেগেছিল আমার এই স্বপ্ন সার্থক হতে, যাকে আমি বোধিসত্ত্বের পথ অনুসরণ করে সার্থক করার চেষ্টা করেছি। আমি গুণমিত্র নামে এক সফল বৈদ্যকে আমার সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলাম। সে ছিল কুস্তনের ভিক্ষু এবং আমারই মতো সেও পরিব্রাজনা করতে করতে য়েহতে এসেছিল। সে কোনো গ্রন্থ অনুবাদ করেনি, যদিও সেই গুণ তার ছিল। হতে পারে অনুবাদকদের মধ্যে তার নাম না থাকার ফলে হয়তো আগামী দিনে তার নাম লোকে বিস্মৃত হবে। পরবর্তীকালে লক্ষ লক্ষ বছর স্মরণে থাকার জন্য জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার চেয়ে মানুষের ক্ষণিক দুঃখকে দূর করার চেষ্টা অমরত্বের চেয়েও অনেক বড়ো। সংঘনায়ক হওয়ার আগের বছরেই আমি শ্যান-পিঙ সংঘারামের কাছে এক বিশাল স্বাস্থ্যকেন্দ্র বানিয়েছিলাম। সেখানে ছোট আকারের ভৈষজ্য গুরুর প্রতিমাও প্রতিষ্ঠা করি। মূর্তিটি ধাতু নির্মিত ছিলনা, কারণ সেটিকে গলিয়ে তাকে বিক্রি করার মতো পাপাচার ঘটার সম্ভাবনা ছিল। পাথরের মূর্তিও নয় শুধুমাত্র মাটির প্রতিমা নির্মাণ করিয়েছিলাম। এরকম একটি মূর্তি ততদিন টিকে থাকতে পারে যতদিন তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য মানুষের অভাব হবে না। মূর্তিটি নির্মাণ করেছিল আমাদের সংঘারামেরই কিছু কুশলী শিল্পী। আমরা বেশির ভাগ শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করেছিলাম সেই কুঠুরিগুলি নির্মাণ করতে যেখানে রোগীদের রাখা হবে। আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম, কোথাও মজুরেরা মাটি খুঁড়ে ইট পাতছে অথবা দেয়াল গাঁথছে। আমি তাদের কাজ দূর থেকে দেখে সন্তুষ্ট থাকতাম না, নিজেও তাদের সঙ্গে কাজে লেগে যেতাম, মাথায় মাটির ঝুড়ি বইতাম। এই সিদ্ধান্ত খুব আকস্মিকভাবে নিতে হয়েছিল এবং অনেক মানসিক বাধা এ কাজের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। ছী সাম্রাজ্যের সংঘনায়ক এই হীন কাজ করবে এমন মিথ্যাভিমান ত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু মনে হতো কেউ কেউ বলবে, এই হীনতা দেখানোটাও এক ধরনের কৌশল। কেউ কেউ বলে এও এক ধরনের দম্ভ। আমি আমার হৃদয় বিশ্লেষণ করে দেখলাম, না সেখানে দম্ভের কোনো স্থান নেই। দম্ভ থাকলে সেবাব্রতে এক পাও অগ্রসর হতে

পারতাম না। আমার ছেঁড়া কাপড়ে তৈরি চীবরে কতটা মাটি লাগল সেটা কোনো ব্যাপারই নয়, কারণ আমি সুখী কোমল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিলাম না, এবং লোকে সেটা প্রত্যক্ষও করত। সংঘনায়কের ঝুড়ি ওঠানোর কেচ্ছা সারা ছী রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে, অবশেষে সম্রাটের কানেও উঠেছিল। এর ফলে অন্যান্য ভিক্ষুরাও তাদের অভিমান ত্যাগ করে এরকম কাজে আত্মনিয়োগ করল। গুণমিত্র রাজধানীতে থাকত বাইরে যাওয়ার অবসর সে কমই পেত। ফিয়েন-পিঙ মহাচিকিৎসালয়ে সে ছিল প্রধান বৈদ্য। পরবর্তীকালে নগর প্রাচীরের ভিতরেও সম্রাট একটি বিশাল রোগী শুশ্রুষাকেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন, গুণমিত্র সেখানেও কিছু সময় রোগীদের চিকিৎসা করত। তাছাড়া সে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল, তা হলো নতুন নতুন বৈদ্য তৈরি করার। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে সে সময় য়েহতে বা ছী সাম্রাজ্যে চিকিৎসা বিষয়ক যে অভূতপূর্ব প্রগতি হয়েছিল তার কৃতিত্বের সিংহভাগ গুণমিত্রের। সংঘনায়ক হওয়ার ফলে সমস্ত রাজ্যে যে সমস্ত তরুণ তরুণীরা ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হতে চাইত তাদের প্রবজ্যা দেওয়া হতো থিয়েন-পিঙ সংঘারাম থেকে। এ বিষয়ে আমাদের কঠোর দৃষ্টি থাকত যেন কোনো অযোগ্য তরুণ তরুণী সংঘে প্রবেশ করতে না পারে। প্রবজ্যা দেওয়ার আগে তাদের প্রত্যেকের বিদ্যা, শীল, বুদ্ধি, ইত্যাদির কঠোর পরীক্ষা হতো। ছ'মাস পর্যন্ত বেশভূষা পরিবর্তন না করে থাকতে হতো। যখন বোঝা যেত, এই প্রবজ্যা গ্রহণেচ্ছুরা সংসার থেকে পালাবার জন্য সংঘে আসতে চাইছেনা বরং সংসারের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য কিছু করতে আগ্রহী তখনই কেবল তাকে উপসম্পদা দিয়ে শ্রমণের বা শ্রমণেরী করা হতো। বিনয় পিটকে বর্ণিত ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের করণীয় কর্তব্য আমি বারবার পাঠ করেছি এবং এই নিয়মগুলি তৈরি করার মধ্যে আমি তথাগতর সর্বজ্ঞতা লক্ষ্য করেছি। নবদীক্ষিত শ্রমণের শ্রমণেরীদের যোগ্য আচার্য বা উপাধ্যায়ের কাছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করা, সেই নিয়মেরই অন্তর্ভুক্ত। সংঘে প্রবিষ্ট হওয়া তরুণ তরুণীদের শিক্ষার প্রতি আমরা বিশেষ দৃষ্টি দিতাম। নগর প্রাচীরের ভিতরে ভিক্ষুণীদের একটি সংঘারাম আগে থেকেই ছিল। কিন্তু আমাদের কাজকর্মের পক্ষে সেটি যথেষ্ট ছিল না। আমরা অত্যন্ত উচ্চ গুণমানের ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী পেয়েছিলাম। সম্রাটের এক ভগ্নীও ভিক্ষুণী জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর যথাসর্বস্ব ব্যয় করে ভিক্ষুণীদের সংঘারামের কাছে একটি মেয়েদের চিকিৎসালয় স্থাপনা করেন। তাছাড়া তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অধ্যায় এবং প্রয়োগের মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করেন। আমার সমগ্র জীবনের সেই মুহূর্তগুলিই আমার কাছে মধুর মনে হয় যখন আমি কোনো রোগীর চিকিৎসা করেছি। আমি যখনই কোথাও যেতাম সেখানে কোনো চিকিৎসালয় থাকলে অবশ্যই যেতাম। সেখানে রোগীদের মুখে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনে আমার খুব সন্তোষ হতো। আমার সংঘনায়ক হওয়ার আগেও ছী রাজ্যে সংঘারাম কিংবা ভিক্ষু ভিক্ষুণী কম ছিলনা। কিন্তু আমার দশ বছরের কাজে এটুকু হয়েছিল যে এমন কোনো বড় গ্রাম ছিল না যেখানে সংঘরামের পাশে চিকিৎসালয় নেই। য়েহতে সংঘারামের বাগানটিকেও আরও প্রসারিত করে আমরা সেখানে অনেক রকম ঔষধি গাছ লাগিয়েছিলাম। অন্যান্য জায়গাতেও ঔষধি উদ্যান

তৈরি হয়েছিল। সঠিক গুণমানের ঔষধ লোকে যাতে সহজে পেতে পারে সেজন্য থিয়েন-পিঙে একটি ঔষধ প্রস্তুতকরণের ব্যবস্থা করেছিলাম। চিকিৎসার বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা দেশভেদ মানা অনুচিত এ বিষয়ে আমি এবং আমার সহকর্মীরা সহমত ছিলাম। আমরা শুধু ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকেই অনুসরণ করতাম একথা ভাবা ভুল হবে, আমরা চীনের উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতিকেও গ্রহণ করেছিলাম। গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াবার সময় হঠাৎ কোনো ঔষধ বা ওই জাতীয় কিছুর খবর পেলে তখনই সেটি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতাম। যখন ছাত্র সংখ্যা কয়েকশো হয়ে গেলো তখন থিয়েন-পিঙে চিকিৎসা বিদ্যার জন্য একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয় খুলতে হলো। আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে শিল্পকলার ছাপ যুক্ত থাকে এটা আমি সর্বত্রই সংঘারামের মধ্যে দেখেছিলাম। যদি ভিক্ষুরা শুধুমাত্র কলা নৈপুণ্যকেই ধরে রাখত তা হলেও তাদের প্রতিষ্ঠা সর্বত্র বিরাজ করত। দেবালয় বা প্রতিমাগৃহ, স্তূপ উপসোথাগার সাধারণ ভিক্ষু নিবাস, সর্বত্রই সুন্দর চিত্রকলা, ফুলপাতায় সাজানোর রীতি প্রচলিত আছে। আমার নিজেরও এগুলো খুব পছন্দের। যখন চিকিৎসা বিদ্যালয়টির নির্মাণ সমাপ্ত হলো তখন আমরা ভাবতে লাগলাম কিভাবে এটিকে অলংকৃত করা যায়। তখন আমার মনে হলো জেতবনে অসুস্থ এক ভিক্ষুকে স্বয়ং তথাগত সুশ্রূষা করেছিলেন, সেই চিত্র এঁকে তাঁর সেই অমৃতবাণী উৎকীর্ণ করে দিই।–'রোগীর সুশ্রূষা করা আমার কাছে পূজা করার সমতুল্য।' গুণমিত্র এবং অন্যান্য বন্ধুরাও আমার এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করল এবং আমাদের ভিক্ষুদের মধ্যেই একজন কুশল চিত্রকর বুদ্ধমিত্র সেই চিত্র সার্থকভাবে অঙ্কিত করে। সেই সমস্ত প্রাচীর চিত্রের মধ্যে একটি ছিল একজন অস্থিপঞ্জরসার ভিক্ষু গুরুতর অসুস্থ হয়ে মলমূত্রের মধ্যে পড়ে আছে, তথাগত এবং আয়ুষ্মান আনন্দ তাঁকে করুণাঘন দৃষ্টিতে দেখছেন। আরেকটি চিত্রে জন্তাঘরে (স্নানাগার) ভিক্ষু চৌকিতে শয়ান, কাছে চুল্লিতে জলগরম হচ্ছে, তথাগত স্বহস্তে রোগীর পা ধুয়ে দিচ্ছেন, আনন্দ তাঁকে সাহায্য করছেন। তৃতীয় চিত্রে ভিক্ষুকে একটি পরিচ্ছন্ন বিছানাতে চৌকির ওপরে শোয়ানো হয়েছে আর তথাগত প্রসন্নবদনে সেদিকে চেয়ে আছেন। এই চিত্রকলার অনুকরণে পরবর্তীকালে অন্যান্য চিকিৎসালয়েও এই ধরনের চিত্র অংকিত হয়।

আমাকে রাজধানীর বাইরে প্রায়শই যেতে হতো কারণ সংঘের ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসালয় দেখাশোনা করা আমার দায়িত্বের মধ্যে ছিল। এই ভ্রমণকালে আমি কারও ওপরে নির্ভরশীল হতাম না। আমার সঙ্গে কখনোই পাঁচ জনের বেশি ভিক্ষু থাকতনা। এবং আমরা সবাই ছিলাম পিণ্ডপাতিক অর্থাৎ ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতাম। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের সমগ্র রাজ্য জুড়েই বিশেষ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো কারণ তাঁরা কেবল তোতাপাখির মতো কণ্ঠস্থ করা সূত্র আওড়াত না, তারা লোকের দুঃখকষ্টের অংশীদার হতো। সম্রাট আমাকে যা কিছু দিতেন আমি তার যথার্থ উপযোগ করতাম লোকের মধ্যে বিলিয়ে। ভ্রমণকালে পথে কোনো আতুর রোগাক্রান্তের দেখা পেলে তাঁকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শরণালয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম। আমি দেখেছিলাম, কোথাও কোথাও লোকে জলাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। অনেক দূর থেকে জল বয়ে আনতে হয়, বাধ্য হয়ে অপরিচ্ছন্ন জল পান করে। আমার নতুন এক কাজ জুটে গেলো। কুয়ো খোঁড়ার

ব্যবস্থায় লেগে পড়লাম। এবং কুয়ো খোঁড়ার সময় নিজেও ঝুড়িতে করে মাটি বহন করতাম। সংবাদ পেয়ে আশপাশের শত শত লোক এসে উপস্থিত এবং সকলের সমবেত চেষ্টায় কয়েকদিনের মধ্যেই পাকা বাঁধানো কুয়ো তৈরি হয়ে গেলো। যখন সেই নতুন কুয়ো থেকে লোকজনকে পরিষ্কার জল পান করতে দেখলাম তখন আমার হৃদয় এক অপার আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। আমি স্থির করলাম যে রাজ্যে এমন কোনো জায়গা থাকা উচিত নয়, যেখানকার লোক জলকষ্টে পীড়িত হয়। ছী রাজ্য মরুভূমি নয়, এখানে ভূপৃষ্টের অল্প নিচেই পবিত্র স্বচ্ছ জলের ভাণ্ডার মজুত আছে, তবে লোকে কেন জলকষ্টে ভুগবে? পথের ধারেও এমন জায়গা ছিল যেখানে কাছাকাছি লোকবসতি না থাকার ফলে কুয়োর অভাব ছিল এবং পথিককে জলের জন্য কষ্ট পেতে হতো। আমি এরকম একটি জায়গাতে একটি কুয়ো নির্মাণ করালাম এবং গ্রীষ্মের দিনে অনেকদিন নিজের হাতে পথিকদের জল পান করিয়েছি। দুটো একটা বিষয়ে মনে হতে পারে যে আমার কাজকর্মের মধ্যে কিছু লোক দেখানোর ব্যাপার ছিল কিন্তু মানুষ যদি তার জীবনের সমস্ত জাগ্রতক্ষণেই পরোপকারের কাজ ˙ রে চলে তাহলে তার ওপরে লোক দেখানো বা দম্ভ ইত্যাদি আরোপ করা যায়না। যদি কেউ নিজের স্বভাব অনুযায়ী কিছু নিন্দামন্দ করেও তার জন্য কি আমরা এই পথ ছেড়ে দেবো?

আমার ঝোড়ো জীবনের অবসান ঘটেছিল। এখন পর্যটনের ইচ্ছার পূর্তি করতাম ছী রাজ্যের মধ্যেই ভ্রমণ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন আমার চীনা ভাষায় বেশ বুৎপত্তি জন্মাল, এবং চীনের অধিবাসীদের সঙ্গে ভালোমতো পরিচয় ঘটল, তখন মাঝে মধ্যে মনে হতো যে পুরো দেশটাকে ঘুরে দেখে আসি। কিন্তু তার সুযোগ পেতাম না। সংঘনায়কের দায়িত্বভার আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল। আমি অবশ্য ওই দায়িত্বভার স্বেচ্ছায় স্বীকার করেছিলাম। অন্য কাজে খুব কম সময়ই দিতে পারতাম। অনুবাদের কাজতো প্রথম বছরের পরই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, অধ্যাপনার দায়িত্বও আমি আমার ওপরে রাখিনি। আমি একান্ত মনে ভেষজ গুরুর প্রদর্শিত পথে চলছিলাম।

মানুষের দুঃখকষ্টকে খুব কাছ থেকে দেখলে তার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে এর শিকড় অনেক গভীরে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না এই শিকড়কে উপড়ে ফেলা যাবে ততক্ষণ গাছের সমস্ত পাতা ছিঁড়ে ফেললেও কোনো লাভ নেই, রোগ যেমন থাকার তেমনই থাকবে। আমার নিজে কথা বলতে পারি চিকিৎসালয় শরণার্থী-আশ্রয়স্থল বানিয়ে, কুয়ো পুকুর ইত্যাদি কাটিয়ে কিংবা মাথায় ঝুড়ি বহন করে অথবা তৃষ্ণার্ত পথিককে জলপান করিয়ে যথেষ্ট তৃপ্তি পেয়েছি। আমার চেহারা সেখানকার মানুষের চেয়ে ভিন্ন ছিল এবং আমার বেশবাস ছিল দরিদ্রতম ভিক্ষুর মতো। আমাকে দেখে ওখানকার লোক মনে ভাবত আমি পশ্চিমের বর্বর দেশের মানুষ। আমার চেহারার সঙ্গে কুচী অথবা কুস্তনের লোকের যথেষ্ট মিল ছিল। কখনো কখনো আমি কাউকে না জানিয়ে শুধুমাত্র বোসঙকে সঙ্গে নিয়ে রাজধানী থেকে দূরে কোথাও চলে যেতাম আর সেখানে গিয়ে কোনো সেবা কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতাম। পূর্বদিকে সমুদ্রতীরে আমি প্রায়শই যেতাম। অন্তহীন সমুদ্র দেখতে আমার খুব ভালো লাগত। পৃথিবীর স্থলভাগের অনেকাংশই আমি দেখেছি আর সিংহলে যাওয়া এবং ফেরার কালে কিছুদিন

সমুদ্র যাত্রা করেছি। এখানে দেশদেশান্তর থেকে আসা জাহাজ এবং ভিন্ন ভিন্ন মানুষদের দেখে আমার মনও তরঙ্গায়িত হয়ে উঠত। তখনই উপলব্ধি করলাম যে ছী-ভূমি আমাকে এক খোঁটায় বেঁধে ফেলেছে।

য়েহ এবং মহাপ্রাচীরের নিকটস্থ নগর কলগনে থাকার সময় আমি অনেকবার যাযাবর তুর্কদের আস্তানাতে গিয়েছি। যাযাবরেরা চীনে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা অন্য কোনো কাজে এলেও সঙ্গে করে সেই নম্‌দার তাঁবু নিয়েই আসত এবং নগরের বাইরে উপযুক্ত জায়গা খুঁজে সেখানে তাদের পশুপাল নিয়ে শিবির গড়ত। আমি তাদের ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম এবং ব্যক্তিগতভাবেও তাদের যবগুসহ অনেক বেগের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তারা আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করত এবং যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে আমার কথা শুনত। আমি জানতাম যে এদের সম্পূর্ণ আহার প্রণালীই মাংস নির্ভর এবং যা হিংসা ব্যতিরেকে পাওয়া সম্ভব নয়। 'লংকারতার সূত্র' পড়ে আমার মনে হয়নি যে মাংসাহার অন্যায় আবার ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ নাম দিয়ে মাংসকে শুদ্ধ আহার বলে চালানোটাও প্রবঞ্চনা মাত্র। আমি যাযাবরদের শিবিরে যেতাম, তাদের বোঝাতাম যে তারা যেন যথাসম্ভব মাংসাহার পরিত্যাগ করে। যদি তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীরভাবে পরিচয় না থাকত তাহলে বোঝা সম্ভবই হতোনা যে মাংসাহার একদম বর্জন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। সেজন্য আমি তাদের বলতাম, বছরে কিংবা মাসে চার বা ছ'দিন অন্তত তারা মাংস খাওয়া বন্ধ করুক, স্বহস্তে জীবহত্যা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকুক। মানুষ যাযাবর হোক বা নাগরিক, স্বভাবগতভাবে তারা ক্রূর রক্তপিপাসু হয়না। যখন যাযাবরেরা কেউ কেউ ত্রিশরণ নিয়ে কেউবা পঞ্চশীল ব্রতে আস্থাশীল হয়ে প্রতিমাসে দুই অষ্টমী তিথি এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে মাংসাহার না করার প্রতিজ্ঞা করত, তখন আমার খুব আনন্দ হতো। আমি হাজার দুহাজার নয় কয়েক লক্ষ লোককে জীবনে এই ব্রত গ্রহণ করিয়েছি। হয়তো এর ফলে কয়েক লক্ষ প্রাণীরও জীবন রক্ষা পেয়েছে।

বস্তুতপক্ষে রোগী ও অনাথদের সেবা, অহিংসা ব্রতের প্রচার আমার জীবনের অভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে আমি আমার কাজে পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিলাম। তবে আমার কাজ নিয়ে নিজেই যখন গভীরভাবে চিন্তা করতাম, তখন আমার হতাশা জাগত। মানুষ দীন-দুঃখী থাকুক আর আমি তাদের সেবা করি এটা কি এমন মহৎ কাজ? এ ধরনের চিন্তাধারা মনের মধ্যে আসার আগে আমি কুচী এবং অন্যান্য কয়েকটি নগরীতে পারসিক সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম। য়েহতে তাদের একটি আশ্রম ছিল। আর ছঙ-আনে বেশ বড়ো একটি আশ্রম ছিল। সেখানে তাঁদের বেশকিছু জ্ঞানী পণ্ডিতের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। পারসিক ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এক নতুন মতের আবির্ভাব ঘটেছিল, যেমন আমাদের দেশে হীনযানের সঙ্গে মহাযান। এই মতের প্রবক্তা মানী ছিলেন এক পরোপকারী, বিচারক এবং শিল্পী মানুষ। তিনি তাঁদের প্রাচীন ধর্মগুরুদের মতোই বুদ্ধকে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর অনুগামীদেরও সেরকম শিক্ষা দিতেন। যার ফলে পারসিক সন্ন্যাসীরা আমাদের মন্দির এবং বিহারে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাব নিয়ে আসত। কিন্তু আমার

দেখে দুঃখ হতো যে, আমাদের ভিক্ষুরা তাদের অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত। তবে এই প্রবণতা দূর করতে আমি অবশেষে সফল হয়েছিলাম। তাদের আমি সর্বদাই সম্মান ও স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতাম। মাঝে মাঝে তাদের কাছে ধর্ম ও ধর্মগুরুদের কথা শুনতাম। য়েহতে তখন আমার বয়সী একজন মানীবাদী সাধু থাকতেন, তাঁর জীবনের করুণ কাহিনি শুনে দুঃখতো হয়েছিলই কিন্তু তার চেয়ে বেশি হয়েছিল আমার কাজের প্রতি অসন্তোষ। তখন আমার এদেশে আসার দশ বছর হয়ে গেছে এবং আমার বয়স তখন পঞ্চাশ। আমার বন্ধু সাধু মিত্রদারের বয়সও ছিল অনুরূপ। কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের বন্ধুত্ব এত প্রগাঢ় হয়ে ওঠে যে বেশ কয়েকটি পর্যটনে সে আমার সঙ্গী পর্যন্ত হয়। তার কাছেই শুনেছিলাম যে তার বয়স যখন দশ বছর তখনই সেই রোমাঞ্চকারী ঘটনা ঘটেছিল। মানীর উত্তরাধিকারী তাদের গুরু মজদক সারাজীবন মানুষ কিভাবে সুখী হতে পারে তার পথ কার্যকরীভাবে দেখিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা ছিল দরিদ্র এবং অসুস্থ লোকের সেবা করা উচিত কিন্তু তাতে ওই দুটো জিনিসই চিরতরে দূর হয় না। চিরস্থায়ী দূরীকরণের একটাই পথ মানুষে মানুষে কোনো আর্থিক বৈষম্য না থাকা, অর্থাৎ কেউ যেন অভুক্ত না থাকে আবার কেউ যেন প্রাচুর্যে ডুবে না থাকে। মজদক পারসিকদের দেশে খুব সাফল্য পেয়েছিলেন। গ্রামের পর গ্রাম, নগরীর পর নগরী অসংখ্য মানুষ তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে আরম্ভ করে। সাম্যের এক অভূতপূর্ব নজির চারদিকে গড়ে উঠতে থাকে। তাঁর প্রভাবে সেখানকার শাহন্‌শাহ কবাদও তাঁর অনুগামী হয়। কিন্তু দেশের ধনিক গোষ্ঠী যাদের মুখে লেগে আছে দরিদ্রদের রক্ত, তারা কিভাবে তাদের সম্পদ বন্টিত হওয়া দেখতে পারে? তাদের চেষ্টা ছিল যাতে গুরু মজদক তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌছাতে না পারেন। মিত্রদাতের বয়স যখন দশ বছর তখন বৃদ্ধ কবাদের তরুণ পুত্র অনবশকরবাঁ (নৌসেরবাঁ, খুসরো) তাদের হাতিয়ারে পরিণত হলো এবং সে সারা দেশজুড়ে এত বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করল, যা মনে পড়লে আজো মিত্রদাতের চোখে অশ্রুর পরিবর্তে প্রকটিত হয় প্রচণ্ড ঘৃণা, যদিও সে জানে যে এটা গুরুর উপদেশের বিরোধী কাজ। গুরু মজদক বলতেন, স্বর্গকে এই পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে হবে। মেওয়ার বাগিচা মধু ও দুধের নদী এই ধরণীর বুকেই প্রবাহিত করতে হবে। যদি মানুষের রক্ত শোষণ করার কেউ না থাকে তাহলে স্বর্গ এখানেই নেমে আসবে। মিত্রদাত আজও সেদিনের সেই ভয়ংকর ঘটনার কথা ভোলেনি। উপদেশের ফলে নয়, তাঁর প্রদর্শিত কর্মের ফলে দেশে দারিদ্র্য দূর হয়েছিল। মিত্রদাতদের গ্রামে রকমারী মেওয়া ফলের বাগান গড়ে উঠেছিল। অতিথিদের প্রাণ ঢেলে সেবা করা হতো। গুরু বলতেন, শুধু সম্পত্তির বেলাতে তোমার আমার ভাব দূর করলে হবেনা, বিবাহ প্রথাও এই আমার তোমার মনোভাবের জন্ম দেয় এবং আপন সন্তানের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে। সমগ্র দেশের মানুষ একে অপরের প্রকৃত আত্মীয় হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ প্রথা বলবৎ থাকবে। তাঁর বলার পর লোকে বিবাহ প্রথা ত্যাগ করল। আমি আমার মাকে জানতাম কিন্তু আমার বাবা কে ছিলেন তা জানতাম না। খুসরো রাজধানী তস্পোনে তার প্রাসাদের সামনে সেদিন মানব শরীরের উদ্যান তৈরি করেছিল। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে মাথা মাটিতে পুঁতে হাত পা ওপরে রাখা হয়েছিল।

মজদক শিষ্যদের সেই জল্লাদ বলেছিল, 'এই দেখ্ তোদের মাটিতে স্বর্গ নেমেছে।' সেই রাক্ষস, শিশু বালকদের সেখানে দাঁড় করিয়ে সেই হত্যালীলা দেখতে বাধ্য করেছিল যাতে তাদের হৃদয়ে মজদকের শিক্ষার কোনো প্রভাব না থাকে। যাদের সে মজদক অনুগামী মনে করেছিল তাদের কাউকেই সে জীবিত রাখেনি। তবে সবচেয়ে বেশি বিড়ম্বনার বিষয় হলো যে সেই রাক্ষস খুসরোকে এখন এক অদ্বিতীয় ন্যায়াবতার বলে প্রচার করা হচ্ছে।

মিত্রদাতের করুণ ইতিহাস আমার মনে অস্থায়ী ছাপ ফেলেছিল। পারসিক দেশের সেই হত্যালীলা আমাকে যতটা দুঃখ দিয়েছিল তার চেয়ে বেশি ভাবিয়েছিল। তথাগতও দুঃখ দূর করার পথের উপদেশ দিয়েছেন। মহাযানতো আমাদের সামনে একমাত্রার এক কর্তব্য উপস্থাপিত করেছে যে, যতক্ষণ সংসারে একটি প্রাণীও দুঃখী থাকবে, ততক্ষণ নিজের জন্য নির্বাণ কামনা করা অনুচিত। বুদ্ধের অনুগামী মানী এবং তাঁর উত্তরাধিকারী মজদক সেই মহান কাজই তাঁদের দেশে করছিলেন। তাঁদের পথ ছিল অনেক বেশি বিপদসঙ্কুল আবার হয়তো সেটাই ছিল সঠিক পথ। আমি তো নিজেই দেখতে পাচ্ছিলাম যে অনাথালয় আর চিকিৎসালয় থাকা সত্ত্বেও অভাবের কারণে সৃষ্ট দুঃখের শিকড় আমি কাটিনি। আমার মনের মধ্যে এক নতুন ভাবনা জন্ম নিল। মানুষের সবচেয়ে বড়ো দুঃখের কারণ হলো আর্থিক বৈষম্য। সম্রাট কিংবা সামন্তদের এত বৈভবে ডুবে থাকার কি অধিকার আছে? এই বৈভব কিংবা সম্পদ তাদের প্রাসাদে আকাশ থেকে ঝরে পড়েনি। কঠোর পরিশ্রমে মানুষের মেরুদণ্ড বক্র হয়ে যায়, আর তারই ফলস্বরূপ সম্রাট ও সামন্তরা লাভ করে বহুমূল্য ধাতু কিংবা রত্নালঙ্কার, নানা ধরনের সুস্বাদু ভোজন তাদের সামনে হাজির হয়। মহার্ঘ মৃগচর্ম এবং চীনাংশুকের বস্ত্র পরিধান করে। যে হাত এত সমস্ত সৃষ্টি করে, তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে দরিদ্র। যারা প্রতিজ্ঞা নিয়েছে যে নিজের হাতে একটি কুটোও নড়াবে না, তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্পদশালী ও আরামে আছে। এর জন্য অবশ্য বলা হয় সবই মানুষের পূর্ব জন্মের কৃত ফল, বস্তুত এই তত্ত্ব সমস্ত দুঃখ কষ্টের শিকড়, মানুষে মানুষে যে বৈষম্য তাকে বজায় রাখার জন্যই প্রচার করা হয়। এক কণা খাদ্যের জন্য মানুষ পশুরও অধম জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়।

পারসিক দেশে খুসরোর আদেশে অনাথ শিশু ও বালকদের বিভিন্ন লোকের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয়েছিল। মিত্রদাতও এক ছোটখাটো সামন্ত পরিবারে আশ্রয় পেয়েছিল। সে তার মাকে খুব ভালোবাসত, যাকে সেদিন মাটিতে প্রোথিত মাথা, পা ওপরে, হাত দুটো মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে এরকম মানববৃক্ষের রূপ দেওয়া হয়েছিল। মাটিতে প্রোথিত করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর প্রাণবায়ু নিঃসৃত হয়েছিল। মিত্রদাত স্বচক্ষে দেখেছিল তার মা যার স্তনদুগ্ধ পান করে সে এত বড়ো হয়েছে, সেই মায়ের মৃতদেহ, নগ্ন, বীভৎস। খুসরো তার সাফল্যে গর্বিত হয়েছিল কিন্তু যে শিশুরা তাদের পিতামাতার ওরকম নৃশংস পরিণতি দেখেছিল, তারা কি করে সেই ঘটনাকে ভুলতে পারে? খুসরো আতঙ্কিত হয়ে মজদকপন্থীদের হত্যা করে, তার অনুগামীদের খুঁজে খুঁজে বের করে মেরে ফেলে, আর তাদের সন্তানদের অন্য পরিবারে বিলিয়ে দেয় যাতে মজদকের

শিক্ষা লোকে চিরতরে বিস্মৃত হয়। মিত্রদাত ছ' বছর তার নতুন পিতার কাছে ছিল, কিন্তু মায়ের সেই অবস্থা সর্বদা চোখের সামনে ভাসত। স্বপ্নে সে তার মাকে দেখত এবং কতবার মাটি থেকে মুখ বের করে তার মা তাকে হাসিমুখে তাঁকে বলত–ভয় পেওনা। মানুষের কল্যাণের এটাই সঠিক পথ তা সে আজ হোক বা হাজার বছর পরে সফল হবেই। মিত্রদাত স্বপ্নে দেখা মায়ের কথাগুলো মনে করে রেখেছে। মজদক এবং মানীর শিক্ষা বস্তুতপক্ষে কি ছিল তা জানার উপায় তখন পারসিক দেশে ছিলনা। অনেক লোক ভয় পেয়ে বদলে গিয়েছিল, আর অনেকে মজদকের শিক্ষা ত্যাগ করার পরিবর্তে দেশত্যাগ করে যেথাদের (হেফতান-শ্বেতহুণ) রাজ্যে চলে যায়। ষোলো বছর বয়সে মিত্রদাত তাদের খোঁজে বের হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়া ধর্মভাইদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য সে দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করে। অবশেষে সে মহাচীনে এসে পৌছায়। আমি ভাবতাম একমাত্র ধনী দরিদ্রের মধ্যেকার বৈষম্যের অবসান ঘটাতে পারলেই, মনুষ্যজাতিকে দুঃখসাগর থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এরকম করার চেষ্টা করলেই কি প্রতি দেশে একটি করে খুসরো অনবশকরবাঁ জন্ম নেবেনা? তবে হ্যাঁ জন্ম নিতে পারে, কিন্তু তারা কতদিন পর্যন্ত পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসাকে আটকে রাখতে পারে? যাইহোক, অনবশকরবাঁরা সংখ্যায় সামান্য এবং যাদের হিতের জন্য চেষ্টা করতে হবে তারা সংখ্যায় অসংখ্য। যতদিন এই বিশাল জনসমুদয় অজ্ঞানতা আর ভ্রান্তির অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত মুষ্টিমেয় খুনীর দল তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে যাবে। খুসরো নিজের হাতে হয়তো দু-চার জনকে হত্যা করেছিল, তার সামন্তরা হয়তো দশ-বিশ জনকে, কিন্তু বাকিদের হত্যা করার খড়গতো তারা তুলেছিল যাদের কল্যাণের জন্য মজদক এবং তার শিষ্যরা হাসিমুখে প্রাণ বলিদান দিয়েছিল। না, খুসরো অনবশকরবাঁরা চিরতরে তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সফল হবে না। তথাগত আমাদের বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়, চারিকা করার উপদেশ দিয়েছেন, সেই পথ থেকে ভ্রষ্ট হতে পারিনা। একথা ঠিক দু-একজন মানুষের পক্ষে সেই মহান পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়, যাদের হিতের জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে, আনার কাজটাও সেই বহুজনদেরই করতে হবে। যখন তারা সকলে এই কাজে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন তাদের কেউ রুখতে পারবে না।

তথাগত আমাদের মৈত্রী, করুণা, মুদিতা এবং উপেক্ষা করার উপদেশ দিয়েছেন। শত্রুতা দিয়ে শত্রুতার নাশ হয়না এই সত্য আমিও জানি, কিন্তু সত্য কথা বলতে কি যখন থেকে মিত্রদাতের ভয়ঙ্কর কাহিনি শুনেছি তখন থেকে মনের মধ্যে খুসরোর মতো যারা, তাদের প্রতি এক অপার ঘৃণার জন্ম হয়েছে। আর সেই সময়েই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। আমি তখন রাজধানীর বাইরে ছিলাম। আমার বন্ধুরা আমাকে য়েহতে নিয়ে এসেছিল। পেটে অসহ্য শূলবেদনা, দাঁতে দাঁত চেপে সেই অসহণীয় যন্ত্রণা সহ্য করতাম। সেই দুঃসহ অসুস্থতার মধ্যেও হৃদয়ে জন্ম নেওয়া ঘৃণাকে ভুলতে পারতাম না। আমার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে সম্রাট হাউ-চূ তাঁর সম্রাজ্ঞীকে নিয়ে আমাকে দেখতে সংঘারামে এলেন। আমার পক্ষে এটা ছিল বিরল এক সম্মান, কারণ চীনে সম্রাটকে দেবপুত্র মনে করা হয় আর তাঁর দর্শন লাভকে পূণ্যকর্ম বলে ভাবা হয়। সেই

দেবপুত্র স্বয়ং আমাকে দেখতে এসেছিলেন। আমার চারপাইয়ের কাছে তাঁর জন্য আসন রাখা হয়েছিল। অনেক সময় ধরে তিনি আমার স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিলেন। তাঁর মুখের ভাব এবং কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পাচ্ছিল যে তিনি সত্যি আমার জন্য উদ্বিগ্ন এবং দুঃখিত। তিনি ছিলেন ছী বংশের সবচেয়ে বড়ো সম্রাট এবং এই বংশের মধ্যে সবচেয়ে বেশিদিন, বারো বছর (৫৬৫-৫৭৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। তাঁর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ছী রাজবংশের রাজলক্ষ্মীও বিদায় নেয়। তাঁর দুই উত্তরাধিকারী দুজন নাম মাত্র সময়ের জন্য শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সম্রাটের ব্যবহারে স্নেহ এবং সম্মান উভয়ই ছিল। মিত্রদাতও আমার সুশ্রূষাতে ব্যস্ত ছিল, তার চোখে আমি খুসরোকে দেখতে পাচ্ছিলাম, তারপর সম্রাটের দিকে দৃষ্টি যেতেই তাঁর চেহারাতেও আমি খুসরোকেই দেখতে পেলাম। এরকম কেন হলো। এরাইতো মানুষে মানুষে বৈষম্যকে জিইয়ে রাখে। আমার সার্থবাহর কাছে বিশাল সম্পত্তি। রাজভবনের বৈভব দেখে লোকের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যদি এরা জানতে পারে যে আমি এই বৈষম্য দূর করার কথা ভাবছি তাহলে কি এরা চুপ করে বসে থাকবে? তখন কি সম্রাট আমাকে এরকম সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবেন নাকি আমার অসুস্থতায় শয্যাপার্শ্বে আমাকে দেখতে আসবেন? না তা কখনোই হবে না। এই সমস্ত সম্মান ইত্যাদি ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ আমি শিং বিহীন গোরু, আমাকে ভয় করার কিছু নেই। সে মুহূর্তে আমার নিজের মধ্যে যথেষ্ট সংযম আনতে হয়েছিল। এমন না হয়ে যায় যে আমি শিষ্টাচার-বিরোধী কোনো কথা বলে ফেলি। তবে আমার প্রাণের প্রতি আমার সেটুকু টান ছিল যাতে তাকে আমি সাধারণভাবে না খুইয়ে জনহিতকর কাজে লাগাতে পারি।

রোগ কঠিন ছিল কিন্তু গুণমিত্র এবং অন্যান্য বন্ধুদের ইচ্ছা ছিল না যে আমি এত তাড়াতাড়ি তাদের কাছ থেকে বিদায় নিই। আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। চারপাইয়ে শুয়ে একান্তে ভেবে ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌছালাম যে বহুদিন ধরে চলে আসা এই বৈষম্যের জন্য শুধু একজনকে দোষী মনে করা ঠিক নয়। এ বিষয়ে একটি শ্রেণীর স্বার্থ জড়িয়ে আছে। একজন সম্রাট মারা গেলে কি বৈষম্য দূর হবে? একজন সম্রাট যাবে আরেকজন তার জায়গাতে আসবে। একজন সামন্ত বা সার্থবাহ শেষ হয়ে গেলে তার জায়গা ফাঁকা পড়ে থাকবে না। যতদিন না এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যায় যে যাতে এরকম ব্যবস্থা জন্মই হবে না ততদিন কোনো ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা পরবশ হয়ে কিংবা হিংসার আশ্রয় নিয়ে কোনো লাভ নেই। এরজন্য বহুজনকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তবে পরিবর্তন খুব তাড়াতাড়ি আসবে এমন আশা করা বোধহয় ঠিক হবে না।

দুঃখ-নিরোধের জন্য এক অন্য পথের সন্ধান আমি পেলাম। কিন্তু আমি আমার জীবন সায়াহ্নে এসেই বা কি করলাম? সেই কাজই করলাম, যা করে আসছিলাম সেই রোগী ক্ষুধার্ত অনাথ আতুরের সেবা। স্বাস্থোদ্ধারের পর আবার সেই আগের মতো ঘুরতাম কিংবা রাজধানীতে থেকে আমার করণীয় কাজ করতাম। সেই সময়ে (৫৬৩ খ্রিঃ) আমি 'অভিধর্মহৃদয়শাস্ত্র' গ্রন্থটির ভাষান্তর করি। ভাষান্তরের পরিবর্তে আমার ইচ্ছা ছিল যে মজদকের উপদেশের বিষয়ে 'মজদক পরিপৃচ্ছা' নামে একটি গ্রন্থ লিখব। আমি আমার এই ইচ্ছাকে কার্যকরী রূপও দিয়েছিলাম, তবে আমি এমন আশা করি না

যে গ্রন্থটি আমার মৃত্যুর পরও টিকে থাকবে। রাজা এবং সামন্তদের অত্যাচার নিয়ে কত লোকগীতি রচিত হয়েছে, গাওয়া হয়েছে। যার মধ্যে কাব্যের সেই রস সুষমা উপলব্ধি করা যায় যা আমরা কালিদাস কি অশ্বঘোষের কৃতির মধ্যে পাইনা। কিন্তু সেগুলি কি চিরস্থায়ী হয়েছে? চিরস্থায়ী হতে গেলে তাকে কাগজে কিংবা তালপত্রে লিখতে হয় আর একবার লিখলেই হয় না আমাদের ধর্মপুস্তকগুলির মতো বারবার লেখা উচিত। তবেই তা কালজয়ী হয়ে টিকে থাকতে পারে। আমারতো মনে হয় না যে 'মজদক পরিপৃচ্ছা' চিরস্থায়ী হতে পারে। আমায় তো এখন ওটিকে রীতিমতো গোপন করে রাখতে হচ্ছে। যদি কোনো রকমে এটির সন্ধান প্রভুরা পান তাহলে তাঁরা শুধু ওটিকে নষ্ট করেই ক্ষান্ত হবেন না। ওটির রচয়িতাকেই যথোচিত শাস্তি বিধান করবেন। অনেকের মনে হতে পারে এটা আমার ভীরুতা এবং তা হতেও পারে তবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে যেটুকু সেবাকাজ করতে পারছিলাম, তা থেকে নিজেকে এই মুহূর্তেই বঞ্চিত করতে চাইনি। বর্তমান হয়তো আমার নৈরাশ্যের, কিন্তু বহুজনদের নিয়ে আমার কোনো হতাশা নেই, বিশেষত মহাচীনের বহুজন সম্বন্ধে, যারা অত্যাচারীর তরবারির সামনে ভয় পেয়ে চিরকালের জন্য ন্যায়ের পথ ত্যাগ করেনি, এদেশে তথাগতর শাসনের ওপর সংঘটিত অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে একথা অবশ্যই বলা চলে। হাজার হাজার বৌদ্ধভিক্ষু ভিক্ষুণী, উপাসক উপাসিকা হাসিমুখে জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, উদ্যত খড়্গের নিচে মাথা পেতে দিয়েছে। তথাগতর দুঃখ নিরোধক পথ নির্দেশই তাদের সেই ভূমিকা পালনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সেজন্যই আমার দৃঢ় বিশ্বাস চীনের বহুজন দুঃখ নিরোধক পথ কখনোই ত্যাগ করবে না, অন্যদিকে খুসরোর মতো দানবেরা অত্যাচার করতে করতে একদিন শেষ হয়ে যাবে এবং এই পৃথিবীর বুকে একদিন স্বর্গ নেমে আসবে।

ঝড়ের মধ্যে (৫৭৭-৫৮১ খ্রিঃ)

য়েততে শান্তির জীবন শেষ হয়ে এল। ইতিমধ্যে আমি 'চন্দ্রগর্ভ সূত্র' (৫৬৬ খ্রিঃ) এবং 'পিতাপুত্র-সমাগমসূত্র' (৫৬৮ খ্রিঃ) গ্রন্থ দুটির অনুবাদ কাজ সমাপ্ত করেছি। আমাদের সম্রাট হাউ-চূ ইদানীং আমার কাজকর্মে আরও বেশি বেশি সাহায্য করছিলেন। কাজ সেই একই, যার কথা ইতিপূর্বে বলেছি, যদিও সেই ঔষধকে আমি প্রকৃত ঔষধ মনে করতাম না। ছী বংশের দুর্বলতা এখন প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছিল। সামন্ত এবং অন্যান্য রাজপুরুষদের জনগণের প্রতি অত্যাচার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছিল, তবে সম্রাট হাউ-চূর জীবদ্দশায় তেমন কিছু ঘোরতর অশান্তি হয়নি। তাঁর উত্তরাধিকার অন্-তেহ-য়াঙ (৫৭৭ খ্রিঃ) এবং য়ূ-চূ (৫৭৭ খ্রিঃ) দুর্বল, অযোগ্য এবং বিলাসী ছিল। ছঙ-আনের চাউ বংশ বহুকাল ধরেই য়েহর দিকে লোভের দৃষ্টি রেখেছিল। ছঙ-আন প্রাচীন রাজধানী। অনেক বড় বড় রাজবংশ সেখানে থেকে মহাচীনকে বিভিন্ন সময়ে শাসন করেছেন। পে-বেই বংশের হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার সময় তাঁদের অমাত্যের আশা ছিল যে সে সমগ্র চীনের অধীশ্বর হবে, কিন্তু তার আমলেই পে-ছী বংশ দেশের পূর্ব ভাগ ছিনিয়ে নেয়। বংশের সংস্থাপক শিবোঙ-মিন-তী যে কাজে সফল

হতে পারেননি, সেই কাজ তাঁর দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী বূ-তী (৫৬১-৫৭৮ খ্রিঃ) পূরণ করেন। ছী বংশ শেষ হলে পেও-ছাউ বংশ উভয় রাজ্যেরই কর্ণধার হয়ে বসলেন। অবশ্য অল্প কিছুদিনই সেই বিজয়ের স্বাদ উপভোগ করতে পেরেছিলেন। তাঁর পরে য়ূ-শেন-তী ক্ষমতাসীন হন (৫৭৮-৫৮০ খ্রিঃ)। রাষ্ট্রক্ষমতা পরিবর্তিত হওয়ার পর য়েহ আর রাজধানী থাকেনি, তা সত্ত্বেও উত্তরের যাযাবরদের পথের কাছাকাছি সবচেয়ে বড় নগর হওয়ার সুবাদে তার অবস্থা খুব দীনহীন হলো না। বূ-তী প্রাচীন রাজবংশের কাছ থেকে ক্ষতি হতে পারে আশংকা করে তাকে সমূলে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা নেন। ছী বংশের প্রভাববৃদ্ধিতে আমাদের কিছু ভূমিকা অবশ্যই ছিল। আমরা বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে যে সেবাকাজ করতাম তা প্রধানত সেই রাজবংশের বদান্যতায় হতো এবং জনতাও তাঁদের ভালো চোখে দেখত। বূ-তী আমাদের কাজকর্মের ওপরে আঘাত হানতে শুরু করলেন, যার জন্য আমি, মিত্রদাত ও বো-সঙকে রাজধানী ছাড়তে হলো। তাঁর উত্তরাধিকারী শেন-তী তার দুবছরের রাজত্বকালে আঘাতের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেন। রাজধানী ছঙ-আনে তিনি ততটা অত্যাচার করেননি এবং সেখানে তখনও ভিক্ষুদের সামান্য কিছু মর্যাদা ছিল কিন্তু ছী রাজ্যে তারা সামান্যতম শৈথিল্য প্রদর্শনে রাজি ছিলেন না। তিনি হুকুম জারি করলেন– 'শাক্য শ্রমণদের সমস্ত কাজকর্ম যেন অবিলম্বে বন্ধ করা হয়, অন্যথায় বলপ্রয়োগ করা হবে। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের চীবর পরিত্যাগ করে গৃহস্থ হতে বাধ্য করা হোক, যে এই আদেশ অমান্য করবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক।' আমি আমার পথ ত্যাগ করতে পারি না, আর ধরা পড়লে বৃথা প্রাণ খোয়ানো ছাড়া আর কোনো লাভ নেই। আমার বন্ধুরাও চাননি আমার জীবনের অন্ত এভাবে হোক। প্রাণ থাকলে আবার সুযোগ আসলে আমি আমার কাজ করতে পারব। তার চেয়েও বেশি ভয় ছিল আমি নিহত হলে আমার অনেক বন্ধু আমার পথ অনুসরণ করতে চাইবেন এবং যে সেবা কাজ আমরা আরম্ভ করেছিলাম তা চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। চীবর ত্যাগ করিনি। আমি স্থির করেছিলাম যে প্রাণ এবং চীবর দুটোই একসঙ্গে প্রয়োজন হলে ত্যাগ করব। তবে চীবরের ওপরে একটা গার্হস্থ পোশাক চাপিয়ে নিয়ে আপাতত রাজপুরুষদের চোখকে ফাঁকি দিলাম। আমাদের চোখের সামনে চিকিৎসালয় জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হলো। প্রথমে অবশ্য তারা চেষ্টা করেছিল অন্য বৈদ্য দিয়ে ওটাকে চালাতে কিন্তু তাদের যথেষ্ট যোগ্যতাও ছিলনা আর তাদের মধ্যে আমাদের মতো সেবার ভাবও ছিলনা। দুঃখ নিবারণের জন্য আমরা যে আশ্রম আঠারো বছর ধরে অনেক পরিশ্রমে গড়ে তুলেছিলাম, দেখতে দেখতে তা সমস্ত ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। আমরা অন্যান্য জায়গার আশ্রমগুলিকে খানিকটা সামলাবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বেশিদিন এক জায়গায় আমরা থাকতে পারতাম না। অবশেষে এমন একটা সময় এল যে আমাদের উত্তর চীন ছেড়ে দক্ষিণে চলে যেতে হলো। মহাচীন ঘুরে দেখার বাসনা আমার এভাবেই তৃপ্ত হলো, কিন্তু এর জন্য আমাকে নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হলো।

চাউ বংশ এখানে আমাদের জন্য কিছু করার মতো অবস্থায় ছিল না, কিন্তু আমরাও এই নতুন জায়গাতে এসে নতুন করে আমাদের কাজকর্ম শুরু করতে সফল

হইনি। এর কারণ আমার বয়স। উনষাট বছর বয়সে আমাকে পালাতে হয়। ষাট বছর বয়সের সময় আমার মানসিক অবসাদ এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌছায় যে, সমস্ত উদ্দেশ্য এবং সংকল্প শিথিল হয়ে যেতে লাগল। ষাট বছর বয়সের সীমা জীবনের বড় একটা সীমা। তার আগে পর্যন্ত মানুষের অন্তর থেকে বিশ্বাস হয়না যে সে জীবনের আরেক প্রান্তে এসে পৌছে গেছে। আমারও মনে হলো এখন বেলাশেষের সময় এসে গেছে। যদি কোনো কিষান জানতে পারে যে, সে ক্ষেতে যে বীজ বপন করতে যাচ্ছে, তাতে যে ফসল ফলবে তা দেখার জন্য সে আর পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে না, তাহলে সে হয়তো আর সেই উৎসাহ নিয়ে ক্ষেতে কাজ করবে না। আমার অবস্থা হয়েছিল অনেকটা সেই রকম। আবার নতুন করে কর্ম বিস্তার করতে সময় দরকার। সঙ্গী সাথীর সংখ্যাও কম। ভিত গড়তে গড়তে হয়তো কারিগরই আর থাকল না। সত্যি সত্যি ষাট বছর বয়সে যখন আমি পীত নদীর দক্ষিণ তটভূমিতে নামলাম, তখন আমি একজন পরিবর্তিত মানুষ। শারীরিকভাবে হয়তো আমি জীবিতই ছিলাম কিন্তু আমার আশা আকাঙ্ক্ষার বিষয়ে আমি একরকম মৃত ছিলাম বলা চলে। আমার পা এখন কোথাও আর অস্থিরভাবে থাকতে পারে না। অথচ চিরকাল আমি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরতাম, কিন্তু এখন আর সে প্রশ্ন ওঠেই না। বয়স কম থাকলে এরকম অবস্থায় সমুদ্রযাত্রা করতাম। যবদ্বীপ সম্বন্ধে শোনা ছিল, সিংহলে থাকাকালীন যবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করতে একটি অর্ণবপোতকে দেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, তাতে চড়ে বসি, কিন্তু তখনতো মাথায় শুধু মহাচীনে যাওয়ার চিন্তাই প্রধান হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, এখন যদি কোথাও যেতেই হয় তবে তা হবে নিতান্ত বাধ্যতামূলক, কলুর বলদের মতো।

ভারতবর্ষে যেমন উত্তর দক্ষিণে পার্থক্য আছে, মহাচীনেও তেমন পার্থক্য দেখা যায়। তথাগতর শাসন যদিও উভয় খণ্ডে একই ধরনের, কিন্তু তাদের রীতি রেওয়াজের ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম এসে গেছে। উত্তর চীন, উত্তর আর পশ্চিমে যাযাবরদের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত এবং সেখান থেকে লুটপাট করতে কিংবা কখনো আশ্রয় নিতে অনাদিকাল থেকে যাযাবরেরা আসছে এবং তাদের বিশাল এক ভাগ আত্মপরিচয় খুইয়ে চীনের জনতার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। চীনের ভিত খুব মজবুত। যদিও সংখ্যায় হয়তো যাযাবরদের মতো নয়, তাহলেও প্রচুর ভারতীয় এদেশে এসেছে, যার মধ্যে দ্বিতীয় তৃতীয় প্রজন্ম পর্যন্ত তাদের পূর্বজদের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান রাখত। অনেকের পিতা পিতামহ আজ পর্যন্ত জীবিত, কিন্তু তাদের মুখে আমার দেশের তেমন বিশেষ কোনো ছাপ নেই। এত তাড়াতাড়ি চিরকালের জন্য মুখের আদলের পরিবর্তন ঘটে যাওয়া অন্য কোনো জাতির ক্ষেত্রে তেমনভাবে হয়নি। তা সত্ত্বেও আগন্তুকদের আত্মসাৎ করতে গিয়ে চীনকেও তাদের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয়েছে। এর ফলে উঁচু বংশের গরিমাও কোথাও কোথাও হারাতে হয়েছে, সেই কারণে দক্ষিণ চীনের লোক উত্তর চীনের লোককে খুব উঁচু নজরে দেখে না। ভারতেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। খস্, যবন, শক, যেথা ইত্যাদি কত জাতি বাইরে থেকে এসে উত্তর ভারতের জনসমুদ্রে মিশে গেছে। শুধু উত্তর ভারত কেন, দক্ষিণের পল্লব বংশও মূলত বিদেশী ছিল। ওখানে

দক্ষিণের লোককে হীন মনে করা হয় যদিও সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে উত্তরের তুলনায় অনেক কম মিশ্রণ হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে রক্ত-মিশ্রণকে গুণ ভাবা হয়েছে আর চীনে তাকে দোষ মনে করা হয়েছে। তবে এখানে একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে বলা উচিত যে চীনে ছোঁয়াছুয়ির বাছবিচারের কথা কেউ মানে না এবং কোনো বিশেষ জাতিকে ভারতের মতো হীন চোখে দেখা হয় না।

দক্ষিণের মহানদী (ইয়াং-সী-কিয়াঙ) পীত নদীর (হোয়াং-হো) মতোই বিশাল। দক্ষিণের সীমান্ত এই মহানদী পর্যন্ত। চীনের সাধারণ মানুষ সমগ্র চীনকেই এক দেশ বলে মনে করে এবং কয়েক শতাব্দী ধরে তা একটি রাষ্ট্রই ছিল। সামন্তকুলের স্বার্থান্ধতা এবং স্বেচ্ছাচারিতার ফলে দেশ খণ্ড বিখণ্ড হয় আবার সেই সীমানা ভেঙে তাকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়। চিন-বংশ (২৫৫-২০৬ খ্রিঃ পূঃ) এরকমই করেছিল। সেই বংশের নাম থেকেই এদেশের নাম হয়েছে চীন। তাদের উত্তরাধিকারী হান বংশ (২০৮ খ্রিঃ পূঃ-২২০ খ্রিঃ) সোয়া চারশ বছর ধরে চীনকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছিল। এই সময়ে (২০৮ খ্রিঃ পূঃ-২৫ খ্রিঃ) সোয়া দুশো বছরের বেশি সময় ধরে ছঙ-আন চীনের রাজধানী ছিল। তারপর আড়াইশো বছর (২৫ খ্রিঃ-২২০ খ্রিঃ) ধরে সেই সৌভাগ্য পেয়েছিল লোয়াঙ। ছাঙ-আন এবং লোয়াঙের নাম এখানকার লোক যথেষ্ট সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারণ করে। এখানে একাধিক শিল্পকলা কেন্দ্র এবং শিক্ষানিকেতন গড়ে ওঠে। প্রত্যেক সম্রাটই তাঁর রাজধানীকে সাজাতে কোনো কসুর করেননি। কিন্তু কোনো রাজবংশইতো চিরস্থায়ী নয়। বংশ পরিবর্তনতো শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হয়না বরং তরবারি আর আগুনের মাধ্যমেই হয় এবং তখন রাজধানী রাজার প্রধান ঘাঁটি হওয়ার দরুন সবচেয়ে বেশি বিধ্বস্ত হয়। হান বংশের পর আবার দ্বিতীয় চিন বংশ (২৬৫-৪২০ খ্রিঃ) ছাঙ-আন লোয়াঙ (২৬৫-৩১৬ খ্রিঃ) এবং নানকিঙ (৩১৭-৪২০ খ্রিঃ) সমগ্র চীন শাসন করে। এরপর দক্ষিণ উত্তর বিভাজন হয়। দক্ষিণের অনেক রাজবংশ নানকিঙ (৪২০-৮৫৯ খ্রিঃ) এবং চিয়ঙ-লিঙ (৫২০-৫৮৯ খ্রিঃ) থেকে শাসন করেছেন।

নানকিঙ (দক্ষিণের রাজধানী) অরুণ সুবর্ণ পর্বতে ঘেরা এবং মহানদীর কিনারায় অবস্থিত এক সুন্দর নগরী। গঙ্গা এবং সিন্ধুর মতো মহানদীও পশ্চিমের বরফ ঢাকা কোনো পর্বত থেকে প্রবাহিত হয়েছে। নানকিঙ শুধু চীনের রাজধানী হওয়ার জন্যই নয় বিদ্যা এবং শিল্পকলার জন্যও অনেকদিন থেকেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল। তবে আমি এখানে থাকতে ইচ্ছুক ছিলাম না। ভয় ছিল যদি ছী রাজ্যের সংঘনায়ককে এখানকার লোক চিনে ফেলে। স্থবির পরমার্থর প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেকদিন ধরে এখানে থেকে (৫৪৮-৫৫৭ খ্রিঃ) অনেক গ্রন্থের অনুবাদের কাজ সম্পন্ন করেছেন। প্রথম লিয়াঙ বংশের আমল হতে (৫০২-৫৫৭ খ্রিঃ) আরম্ভ করে এবং ছেন বংশের রাজত্বকালের (৫৫৭-৫৮৩ খ্রিঃ) মধ্যে বারো বছর পর্যন্ত (৫৫৭-৫৬৯ খ্রিঃ) অনেক বিশাল এবং গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন যার মধ্যে 'বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধ' 'তর্কশাস্ত্র', 'অধর্মকোষ' ইত্যাদির মতো গ্রন্থও ছিল। আমি যদি আর ন'বছর আগে এখানে আসতাম, তাহলেই উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ করা এই মহাবিদ্বান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হতো।

আমরা অনেক কষ্টে নানকিঙের ছোট সংঘারামে চারদিন রইলাম। উত্তর থেকে পলাতক সামন্ত, রাজপুরুষ, কবি, শিল্পীরা এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, যার ফলে সবদিক থেকে এই নগরী দ্রুত উন্নতি করেছিল। হাটু পর্যন্ত ঝুল এবং অনেক লম্বা চওড়া আস্তিনওয়ালা জামা পরা এখানকার সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং মহিলাদের রাজপথে তাদের অনুচরসহ চলতে দেখলাম। মৃদুমন্দ বাতাসে তাদের মহার্ঘ পোশাকের কিয়দংশ উড়তে দেখে কোনো কবির মনে কাব্য জাগতে পারে কিন্তু আমি তার মধ্যে দুঃখের প্রকৃত কারণ দেখতে পেতাম; কারণ সেই একটাই, বৈষম্য। সমুদ্র দক্ষিণের দিকে এবং বেশিদূরে না হওয়ার ফলে এখানেও আমাদের দেশের কোনো কোনো জায়গার মতোই গরম পড়ে এবং ঘামও হয়। বর্ষাও এখানে প্রচুর হয়। নদীতে ছোট বড় নৌকা এবং রাজপথে চাকা লাগানো গাড়ি সর্বদাই বিচরণরত, আর রাজপথের দুপাশে ধনীদের গগনচুম্বী অট্টালিকার সমারোহ।

আমার পরমার্থদায়ক সম্রাট বু-তীর (৫০২-৫৪৯ খ্রিঃ) কথা মনে পড়ল। এই সম্রাট বুদ্ধের শিক্ষাকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতেন। তিনিই ছিলেন লিয়াঙ বংশের সংস্থাপক। ছী বংশের রাজা হোতী (৫০১-৫০২ খ্রিঃ) নিজে স্বতপ্রণোদিত হয়ে আপন যোগ্য সেনাপতি বু-তীকে রাজসিংহাসন প্রদান করেছিলেন। বু-তীর কিন্তু সিংহাসনে কোনো আসক্তি ছিলনা। তিনি বেশ কয়েকবার সিংহাসন ত্যাগ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু প্রজাদের কাতর নিবেদনে সে ইচ্ছা তাঁকে ত্যাগ করতে হয়। তিনি সমস্ত সময়ই প্রায় ধর্ম নিয়ে কাটাতেন। তিনি অনেক বিহার নির্মাণ করেছিলেন। পরমার্থর মতো পণ্ডিতকে রেখে অনেক ধর্মগ্রন্থের চীনা ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন, এবং নিজে সেগুলিকে অধ্যয়ন করেছিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবনের মহান ত্যাগ তাঁর জীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। দিনে একবার তিনি খাদ্য গ্রহণ করতেন, এবং তা অবশ্যই মাংসবর্জিত হতো। বলির জন্য পশুবধ তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং যেখানে বলি আবশ্যিক সেখানে জীবন্ত পশুর পরিবর্তে প্রতীক অর্থাৎ পিটুলির (চালের গুঁড়ো) পশু বানিয়ে বলি দেওয়া হতো। অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দিতে তাঁর কষ্ট হতো, অশ্রু ভরা চোখে নিজের হাতে তাদের মুক্ত করে দিতেন। যে কোনো প্রাণীর প্রতিই তিনি হৃদয়ে অপার করুণা পোষণ করতেন। এরকম একজন লোকের রাজসিংহাসনে এত দীর্ঘকাল টিকে থাকা আশ্চর্যের বিষয়। পরিশেষে তিনি উত্তরের রাজার হাতে বন্দী হন, এবং কারাগারেই তাঁর জীবনাবসান হয়। নিজের বুদ্ধি বিবেচনা মতো তিনি জনকল্যাণের জন্য কাজ করেছেন এবং সিংহাসনের প্রলোভনে পড়েননি। তাঁর জীবন সফল এবং গৌরবজনক ছিল একথা বলার অবকাশ রাখেনা, কিন্তু তিনিও আমার মতো রোগের শিকড় না কেটে পাতা ছেঁড়ার কাজেই সমস্ত শ্রম ব্যয় করেন।

দক্ষিণের রাজধানীতে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখা কঠিন কাজ বলে সে জায়গা ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে সংঘারামের সংখ্যা উত্তরের চেয়ে বেশি। ভিক্ষুরা তীর্থযাত্রা এবং পর্যটনের জন্য সর্বদা ভ্রমণরত থাকেন। যদি আমরা তিনজনের জমায়েত নিয়ে ঘুরি তাহলে লোকে চিনে ফেলতে পারে, যদিও এখানে ভয়ের কিছু ব্যাপার নেই। কিন্তু আমি চেয়েছিলাম এক দীন ভিক্ষুর মতো ঘুরব এবং কঠিন পরিস্থিতিতে লোকে যেমনভাবে জীবন কাটায় সেভাবে জীবন কাটাব।

আমার দুজন সঙ্গীকে বোঝাতে সময় লেগেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরাও আমার প্রস্তাব মেনে নিলেন। নগরীর বাইরে গিয়ে আমি মহানদীর দক্ষিণতট থেকে কিনারা ঘেঁসে ওপরের দিকে চলতে আরম্ভ করেছি। পরনে কাঁথা সেলাই করে তৈরি চীবর আর সংঘাটি, হাতে মাটির ভিক্ষাপাত্র, কাঁধে আর পিঠে আমার চিরসঙ্গিনী তালপাতার পুঁথি। হাতে দণ্ড এবং পা নগ্ন। উত্তরাঞ্চলে বিশেষত শীতকালে পা উন্মুক্ত রাখা অত্যন্ত কষ্টের ব্যাপার। এখানে এখন গ্রীষ্ম তাছাড়া এখানে তুষার পাতের পরিমাণও সামান্য। প্রথমদিনের যাত্রাপথ দুই যোজনের বেশি ছিল। আমার ইচ্ছা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজধানী থেকে দূরে চলে যাওয়া। মহানদীর দক্ষিণ তীর ধরে চলার অর্থ এই নয় যে আমি একেবারে তীর ঘেঁসেই চলছিলাম, তবে নদী থেকে অনেক দূরে কখনোই যেতাম না। এখানকার সঙ্গে ভারতের অনেক মিল রয়েছে। ধানের ফলন এখানে বেশি এবং অধিবাসীরা ভাত খেতেই অভ্যস্ত। নদীর দুই তীরেই বহুদূর পর্যন্ত সমতল ভূমি বিস্তৃত, তারই মধ্যে মাঝে মাঝে পাহাড়ের দেখাও মিলছিল। দক্ষিণ থেকে অনেক নদী এসে এই মহানদীতে মিলেছে। যেখানেই কোনো রমণীয় পর্বত অথবা নদী তট থাকে, তার কাছাকাছি অঞ্চলে সংঘারাম অবশ্যই থাকে। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম যে চলতে চলতে দিনান্ত হয়ে গেলে কোনো সংঘারামে আশ্রয় নেব, আবার ভোর হতেই রওনা দেবো। সংঘারামের আগ্রহে তাদের দেওয়া প্রাতরাশ স্বীকার করতাম কিন্তু মধ্যাহ্নের ভোজন ভিক্ষার দ্বারা সংগ্রহ করতাম। প্রায় তিন বছর এভাবেই বিচরণ করেছি। আমি পশ্চিমের সেই পাহাড়াঞ্চলে গিয়েছি যা দেখে আমার উদ্যানের স্মৃতি মনে পড়ত। পথে একবারই একজন পরিচিত ভিক্ষুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করে আমার পরিচয় গোপন রাখতে রাজি করি। আমি নিতান্ত অপরিচিতের মতো জনারণ্যে বিচরণ করতাম। আমার ভিক্ষাপাত্রে পাঁচ-সাত রকমের ঔষধি থাকত যা আমি কখনো কখনো কোনো অসুস্থ লোকের ওপর প্রয়োগ করতাম।

আমি ভিক্ষুবেশে ছিলাম। বৌদ্ধ হউক বা না হউক যে কোনো গৃহস্থই ভিক্ষুদের প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করে। আমি কখনোই আমার আহার্য জোগানোর দায় কোনো একটি পরিবারের প্রতি চাপাতে চাইনি, এবং সে জন্য আমার সমগ্র পর্যটনকালে বেশ কয়েকবার অনাহারে থাকতে হয়েছে। দরিদ্র মানুষের মনে শ্রদ্ধা এবং দয়ার ভাব দেখে আমার হৃদয় বিচলিত হতো। নিজেরা অভুক্ত থেকেও গৃহে আগত অতিথির যথাসম্ভব সেবা করতাম। আমি পরিধেয়তে ভিক্ষু ছিলাম কিন্তু আমার চেহারায় বিদেশী এবং দারিদ্র্যের ছাপ ছিল স্পষ্ট। একসময় আমি অনেক ধর্মোপদেশ দিয়েছি। এখনো কোনো কোনো সময় আমাকে সেই কাজ করতে হতো তবে একাজে আগের মতো উৎসাহ ছিলনা। আমি যখন দুঃখ সত্যের কথা বলতাম তখন লোকপরম্পরায় শোনা কথা বলতে আমার সঙ্কোচ বোধ হতো। জন্ম দুঃখের, জরা দুঃখের, মৃত্যু দুঃখের, প্রিয়জনের বিয়োগ দুঃখের এবং অপ্রিয় বিষয়ের সংযোগে আসাও দুঃখের। শুধু এইটুকু বললেই দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয় না। প্রকৃত দুঃখ হলো আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাওয়া বহুজনরা যারা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে ফসল ধনসম্পদ সৃষ্টি করে

কিন্তু নিজেরা তা ভোগ করতে পারেনা, তারা অভুক্ত থেকে যায়, আর একদল লুণ্ঠনকারী তাদের শ্রমলব্ধ সম্পদ আত্মসাৎ করে নেয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো যে উৎপাদনকারীরা সংখ্যায় নব্বই ভাগ কিন্তু লুণ্ঠনকারীরা শুধুমাত্র নিজেদের শক্তিতে নয়, ওই পরিশ্রমকারী বহুজনদের সন্তানদের একাংশের হাতে হাতিয়ার ধরিয়ে দিয়ে সমস্ত সম্পদ লুট করে। আমি কি দুঃখ সত্যের এই চিত্রটি প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করতে পারি? অবশ্য পারলেই বা কি লাভ হবে? তা নিছক অরণ্যে রোদন হবে। আমার শ্রোতারা হয়তো এত তলিয়ে বিষয়টিকে বুঝবেও না, ভাববে আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। কিংবা এমনও ভাবতে পারে যে আমি তাদের প্রভুশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা প্রচার করে সেই জায়গা দখল করতে চাইছি। হয়তো আমার বেশভূষা তাদের এতটা ভাবার পক্ষে সহায়ক ছিলনা। তবে এ ধরনের চিন্তা ভাবনা আমাকে একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে এনে ফেলেছিল। তাই যখন আমি আমার ভাবনা চিন্তাকে মনের মধ্যে গোপন রেখে চুপচাপ দণ্ডহাতে পরিক্রমা করে চলতাম, তখন মনের মধ্যে আত্মগ্লানি জন্ম নিত। চতুর্দিকই যেন অন্ধকার ছড়ানো। সবচেয়ে কষ্টের ছিল যখন অন্যের দুঃখ কষ্ট দেখেও নিশ্চুপ থাকতে হতো।

মহানদীর তটভূমি ধরে চলতে চলতে বোধ হয় দ্বিতীয় বর্ষে এমন এক অঞ্চলে এসে পৌছালাম, যেখানকার লোক রীতি-রেওয়াজে চীনের অন্য অঞ্চলের চেয়ে আলাদা। এখানে মেয়ে পুরুষ সকলকেই ভারতের মতো মাথায় উষ্ণীষ বাঁধতে দেখে, আমার বুদ্ধিলের কথা আর চৈত্যগিরির (সাঁচী) তোরণের পাশে মূর্তির কথা স্মরণ হলো। একসময় ভারতে মেয়েরাও পুরুষদের মতো মাথায় উষ্ণীব বাঁধত। এখানকার লোকেরা কি তখন ভারতের কাছ থেকে এই প্রথা শিখেছে? এরা নিজেদের বলে গান্ধারের অধিবাসী। গান্ধার আমার প্রতিবেশী দেশ, সেখানকার পুরুষপুর (পেশোয়ার) এবং তক্ষশিলা নগরীকে আমার নিজের ঘরের মতো মনে হয়েছে। এখানকার মানুষদের মধ্যে বুদ্ধভক্তের সংখ্যা প্রচুর, এখানে পৌছে আমার মনে হলো আমি যেন ভারতের মধ্য দিয়ে চলেছি।

এখানে থেকে যাওয়ার কোনো বাসনা আমার ছিলনা, সেজন্যই এই উন্নান প্রদেশে চার-পাঁচদিন কাটিয়ে আবার ফিরে চললাম। তবে এবার মহানদীর উত্তর দিশাতে। পথে চলতে চলতে উত্তর চীনের হাল হকিকতের কিছু কিছু খবর পেতাম। চাউ বংশ বৌদ্ধদের ভয় করত, তারা চাইতনা যে বৌদ্ধ শ্রমণেরা নিশ্চিন্ত হয়ে তাদের কাজকর্ম করুক এবং নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করুক। আমার তো মনে পড়ে না যে কখনও কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজসিংহাসনের দিকে লোভের দৃষ্টি দিয়েছে। তারা কখনও শাসকদের বিরোধিতাও করেনি। যদি দীন-দুঃখীর সেবা করা, মানুষের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রচার করা অপরাধমূলক কাজ হয় তাহলে অবশ্য স্বতন্ত্র্য ব্যাপার। তবে সংঘের কারণে তাদের সংগঠন খুব দৃঢ় হয়। এক রাজবংশ রাজ্য থেকে উৎখাত হয়ে গেলে আবার তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে না, কিন্তু আমাদের সংঘ সেরকম কাজ অনেকবার করেছে। সংঘ যেন অমর হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। কোনো নৃপতির হিংসার মুখে বৌদ্ধদের হয়তো অনেক ক্ষতি হয়েছে। মানুষ ভেবেছে, এদের সুদিন আর কখনও

ফিরবে না। কিন্তু অত্যাচারী শাসক তো অমর নয়, সে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কৃত ধ্বংসলীলাকে সংস্কার করার জন্য লক্ষ লক্ষ হাত কোথা থেকে এসে যেন জড়ো হয় এবং আমাদের সংঘারামগুলি আগের থেকেও সুন্দর এবং সুসংস্কৃত হয়ে ওঠে। সংঘের এই অজেয় শক্তির জন্যই অনেক সম্রাট এবং সামন্ত প্রভুরা আমাদের প্রভাব সহ্য করতে পারে না।

এই বিচরণকালে যে মিঠে কড়া সত্য আমি মনে প্রাণে অনুভব করেছিলাম তাতে আমার তথাগতর সেই বাণীকে সর্বদা মনে পড়ত– 'খড়গ বিষাণের (গণ্ডার) মতো বিচরণ করো।' একবার ভিক্ষুসংঘে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় কৌশাম্বী থেকে ভগবান বুদ্ধ একাই পরিক্রমা করতে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আমারও কোনো আকর্ষণ নেই। আগামীকালের জন্য কোনো ভোজনও আমার ভিক্ষা পাত্রে থাকত না। মৃত্যু আমার কাছে কোনো ভয়ের ব্যাপার ছিলনা আর মানুষ যতদূর পর্যন্ত সহ্য করতে পারে আমার শরীরও সে পর্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল। আমার চীবর জীর্ণ পুরাতন ছিল কিন্তু আমি তাকে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন রাখতাম। অপরিচ্ছন্ন থাকা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। তবে আমার পরিচ্ছন্ন বেশ দেখে অবশ্য দস্যু তস্করেরা ভাবতে পারত যে আমি ভিক্ষুর দীন বেশের আড়ালে কিছু সোনা দানা লুকিয়ে রেখেছি। অনেকবার আমি তাদের মুখোমুখি হয়েছি। যখনই কারও চোখে লোভের চিহ্ন দেখতে পেতাম তখনই কেবলমাত্র অন্তর্বাস ধারণ করে চীবর এবং ভিক্ষাপাত্র তার সামনে ফেলে দিতাম, এবং বলতাম এ দিয়ে যদি তোমার কোনো উপকার হয়তো হোক। তবে কখনোই কেউ সেগুলি তুলে নেয়নি এবং বিশ্বাস করেছে যে নেওয়ার মতো কিছু সেখানে নেই। এই তিন বছরে জীবনের অভিজ্ঞতা আমার কাছে ছিল একেবারে নতুন। দ্বিপ্রহরে ভিক্ষান্নে উদরপূর্তি করে আপন পুঁথিপত্র নিয়ে কোনো গাছের তলায় বসতাম। বুদ্ধিলের সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা পড়ার সময় আমার তার কথা স্মরণ হতো, আমি মনে মনে তার সঙ্গে কথা বলতাম– 'তোমার অপূর্ণ বাসনাকে আমি রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যদিও আমার সন্তুষ্টির পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। দুঃখ সত্যের অন্য একটি রূপ আমি দেখতে পেয়েছি কিন্তু তা দূর করার কোনো পথ আমার জানা নেই, যদি জানা থাকত তাহলেও হয়তো সেই পথে চলতে পারতাম না। তুমি আমার সঙ্গে থাকলে হয়তো অন্য রকম হতো।'

আমি মহানদী অতিক্রম করে তার দক্ষিণে অবস্থিত মহাসরোবর (তুঙ-তিঙ)-এর কাছে বাস করছিলাম। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল অতীব মনোরম। একবার একে পরিক্রমা করে পশ্চিমে গিয়েছিলাম, আবার এটি দর্শনের আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল। এখানেই খবর পেয়েছিলাম, যে চাউ বংশের অত্যাচারের জন্য আমার কর্মক্ষেত্র আমাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল তার প্রধানমন্ত্রী তাকে উৎখাত করেছে এবং বেন-তী (৪৮১-৬০৫ খ্রিঃ) নামে ছাঙ আনে রাজত্বকারী (৫৮১-৬১৮ খ্রিঃ) রাজবংশের স্থাপনা করেছে। সেই সংঘারামে আমি এই খবর পেলাম সেখানকার ভিক্ষুরা এই সংবাদে যৎপরোনাস্তি খুশি হয়েছিল। নিজেদের রাজত্বকালে চাউ বংশ বৌদ্ধ শ্রমণ এবং তাঁদের সংঘারামগুলির ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার করেছিল। এজন্য ভিক্ষুদের সঙ্গে আমারও আনন্দ হয়েছিল। যে

সঙ্গে এটাও মনে হলো, যে এতকাল ধরে যে আমি নিজেকে নিরাসক্ত উপেক্ষাকারী ভাবছিলাম সেটাও এক ধরনের ফাঁকি। চাউ বংশের উচ্ছেদের সংবাদে হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়েছিল, সেই সঙ্গে পীত নদীর দিকে যাওয়ার আগ্রহও বাড়ল। এর প্রধান কারণ ছিল, উত্তরে আমার মিত্রদের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা, কিন্তু সেখানেও ফাঁকি থাকতে পারে। আমি আমার হৃদয়কে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি সেখানে ভোগ বা লালসার চিহ্নমাত্র ছিলনা, তবে উত্তরের দিকে যাওয়ার বাসনা, কিন্তু সেখানেও ফাঁকি থাকতে পারে। আমি আমার হৃদয়কে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছি সেখানে ভোগ বা লালসার চিহ্নমাত্র ছিলনা, তবে উত্তরের দিকে যাওয়ার বাসনা কেন? উদ্দেশ্যবিহীন ভ্রমণ এখন আর আমার ভালো লাগে না। মনে হচ্ছিল উত্তরে গিয়ে যদি সাধারণ মানুষের কোনো কাজে লাগতে পারি। আমি উত্তরে যাওয়ার স্থির সিদ্ধান্ত তখনই নিইনি যদিও সরোবর থেকে মহানদী পার হয়ে উত্তরের পথেই চলেছিলাম। বেশ কয়েকমাস উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্যাঞ্চলে দিশাহীনভাবে ঘুরলাম। ইতিমধ্যে সংবাদ পেলাম সম্রাট বেন-তী কেবল উত্তরী চাউ আর ছী ভূমিতেই সন্তুষ্ট নন, তিনি সমস্ত চীনকে এক রাজ্যভুক্ত করার সংকল্প নিয়েছেন। তিনি দক্ষিণ চীনের দিকেও ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

আমি এবার অজ্ঞাতবাসের ধারণা ত্যাগ করলাম, আমার পদযুগল সেই দিকে আমাকে নিয়ে চলল যা এখন সুই বংশের অধীনে। বেশিদিন সময় যায়নি সম্রাট বেন-তী আমার সন্ধান পেলেন এবং সিংহাসনে আসীন হওয়ার পরবর্তী বছরেই (৫৮২ খ্রিঃ) তিনি আমাকে রাজধানীতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি ছাঙ-আনের দিকে রওনা হলাম। এখন আমার মনে হলো মানুষের হৃদয়ও তাকে কখনো কখনো ফাঁকি দেয়। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য হৃদয় হলো পরস্পর বিরোধী চিন্তার সমাগম স্থল। তবে মনের মধ্যে এই ভাবও ছিল যে জীবনের অন্তিম লগ্নে যদি মানুষের কোনো উপকার করতে পারি।

জীবন সন্ধ্যা (৫৮২-৫৮৯ খ্রিঃ)

ছাঙ-আন আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নগর ছিলনা। য়েহতে থাকার সময় দু-একবার এখানে এসেছি, তবে তা না আসারই নামান্তর। এলেও কখনোই দু-একদিনের বেশি থাকা হয়নি। এবারে বোধ হয় বাকী জীবনের জন্যই এসেছি। আমার বয়স এখন ৬৩ বছর। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াবার আগ্রহ কমে এসেছে। যদিও মহাচীনের প্রাচীনতম বিহার–শ্বেতাশ্চ বিহার–লোয়াঙ নগরে নির্মিত হয়েছিল যেখানে বাস করে আমাদের পথ প্রদর্শক কাশ্যপ মাতঙ্গ অনুবাদ এবং ধর্ম প্রচারের কাজ করেছিলেন। তবে ছাঙ-আনের মাহাত্ম্য লোয়াঙের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। লো-য়াঙ-ছাঙ আন-কোয়েন-য়ে (নানকিঙ) এই তিনটি বড়ো কেন্দ্র ছিল যেখানে ভারতীয় পণ্ডিতেরা এসে প্রচুর গ্রন্থের ভাষান্তরের কাজ সম্পাদন করেছেন। সুই সম্রাট য়াঙ তাঁর পূর্ব রাজবংশের ভুলগুলিকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে রাজত্ব লাভ করার পর জোর করে প্রজাদের ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া রাজবংশের পক্ষে শেষ পর্যন্ত কল্যাণকারী হয় না। ভারতের ধর্মরাজ অশোক এবং কণিষ্ক বুদ্ধের ধর্মে আস্থাবান হয়েও অন্য ধর্মের

প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেননি, সমস্ত ধর্মের প্রতি সমান উদারতা দেখিয়েছেন। চীনের সম্রাটদেরও অনুরূপ উদারতা দেখানো উচিত ছিল। অবশ্য একথা বলা সহজ যে বৌদ্ধধর্ম এক বিদেশি ধর্ম, আর কনফুশিয়াস এবং লাওজু তাদের নিজেদের দেশের আচার্য, অতএব তাদের মতাদর্শ গ্রাহ্য হতে পারে। কিন্তু তথাগত তাঁর ধর্মকে কোনো দেশ, কাল কিংবা জাতির বন্ধনে বাঁধেননি। মানুষের কল্যাণই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল। তাছাড়া বৌদ্ধরা চীনে এসে এমন কোনো কিছু করেনি যার ফলে চীনারা তাদের চৈনিক সংস্কৃতি ত্যাগ করে অন্য কিছুকে গ্রহণ করে। আমরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে নষ্ট করার চেষ্টা করিনি বরং তথাগতর কাছ থেকে পাওয়া সম্পদ তাদের সঙ্গে সমবন্টন করে নেওয়ায় তাদের ঐতিহ্য আরও সমৃদ্ধশালী হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে হস্তক্ষেপ করা তথাগত কখনোই আমাদের শেখাননি, হয়তো কখনো কোনো পথভ্রষ্ট ভিক্ষু এরকম করে থাকতে পারে কিন্তু তা নেহাতই ব্যতিক্রম।

সম্রাট য়াঙ সবদিক থেকেই দূরদর্শী এবং কর্মঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র অযোগ্য চাউ বংশকে ক্ষমতা থেকে সরিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁর শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য দক্ষিণ চীনের শেষ সম্রাট হো-চুকে পরাজিত করে (৫৬৯-৫৮৬ খ্রিঃ) সমগ্র উত্তর এবং দক্ষিণ চীনকে একত্রিত করে এক মহাচীনের রূপদান করেন। তিনি প্রজাদের সামনে তাঁর বিচারধারাকে ব্যাখ্যা করে বলতেন, রাজবংশ পরিবর্তিত হয় কিন্তু দেশ থেকে যায়। নিজের বংশের স্বার্থে দেশের বিভাজন অত্যন্ত অন্যায়। আমি এমন নির্বোধ নই যে ধরে নেব আমার সুই বংশ চিরকাল থাকবে। সবসময় এরকম দেখা যায় না যে যোগ্য পিতার সন্তানও তাঁরই মতো যোগ্য হয়েছে। সুই বংশ আগামী কোনো কালে ধ্বংস হয়ে গেলেও সমগ্র দেশ যেন ঐক্যবদ্ধ থাকে এটাই আমার ঐকান্তিক ইচ্ছা য়ঙ-তী তাঁর মনের কথা বলেছিলেন। তিনি জানতেন তরবারির মাধ্যমে অর্জিত ঐক্য অস্থায়ী অতএব তাকে চিরস্থায়ী করতে হলে অন্য কোনো সুদৃঢ় কাজ করা প্রয়োজন। দুই মহানদী চীনকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করেছে, যদি এই মহানদী দুটিকে মিলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সমস্ত ভুখণ্ড এক হয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি পীত নদী (হোয়াঙ-হো) থেকে একটি প্রবাহ বের করে দক্ষিণের মহানদী ইয়াঙ-সি কিয়াঙ এর সঙ্গে মেলানর কাজ আরম্ভ করেন। এই প্রবাহ বা খাল ৩০০০ লি (১০০০ মাইল) দীর্ঘ। এর দ্বারা বোঝা যায় যে এই খাল খননের কাজটিও চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলনা। তিরিশ লক্ষের বেশি লোক এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং পনেরো বছরের বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষকেই আবশ্যিকভাবে এই কাজে নিযুক্ত হতে হয়েছিল। উপরন্তু প্রতি পাঁচটি পরিবারকে খাদ্য পানীয় ইত্যাদি যোগানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া পঞ্চাশ হাজার সৈনিকও এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। নিজেদের কোদাল, শাবল, বেলচা নিয়ে রোজ প্রত্যেকটি লোক এই বিশাল কর্মকাণ্ডে অংশ নিত। সম্রাট বলতেন জীবনের কথা কেউ বলতে পারে না, অতএব এই খালের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে চাই। সত্যি সত্যি যেভাবে প্রজাদের বাধ্য করা হয়েছিল এই কাজ করতে, তাতে তাদের কষ্টের সীমা পরিসীমা ছিলনা। হাজার হাজার মানুষ কর্মরত অবস্থায় প্রাণ দিয়েছে। সম্রাট এ খবর জানতেন না এমন নয় কিন্তু মনস্বী

কর্মবীর পুরুষেরা নিজেদের সুখ-দুঃখের পরোয়া করে না। অপরের দুঃখেও কাতর হয়না। কয়েক বছরের মধ্যে খাল সম্পূর্ণ হয়ে গেলো। সম্রাট বললেন, আমার উদ্দেশ্য এখন সফল হয়েছে। চিন বংশের সম্রাট শিহ-হবাঙ মহাপ্রাচীর নির্মাণ করে উত্তরের যাযাবরদের ঠেকাতে পারেননি। হয়তো ঠেকানোর প্রয়োজনও তেমন ছিলনা। আমাদের চীন এত বিশাল এবং ঐতিহ্যশালী যে কেউ একে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। কিছুকালের জন্য নিজেদের শৌর্যবীর্য দেখানোর পর এই মহাসমুদ্রে সকলেই বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যে খালটিকে কাটালাম সেটি উত্তরের এবং দক্ষিণের বিভাজনকে চিরতরে মুছে দেবে।

সম্রাটের মধ্যে বিবেচনার অভাব একেবারেই ছিলনা, তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে তিনি তাঁর উৎসাহের অপব্যবহার করে বসতেন। তিনি কোরিয়াকে জয় করার লক্ষ্যে অনেক ধন সম্পদ নষ্ট করেন। তাঁর খাল সম্পূর্ণ হওয়ার পর বৈভব প্রদর্শনের জন্য চলমান প্রাসাদের রূপে পঞ্চাশটি নৌকাকে সোনা এবং অন্যান্য রত্নে সজ্জিত করেন। তাঁর নিজস্ব জলযানটি ছিল হাল্কা লাল রঙের যার উচ্চতা ছিল তিরিশ হাত এবং লম্বায় ছিল দেড় হাজার হাত। উপরন্তু সেটি ছিল চারতলা। তার মধ্যে অগুণতি কক্ষ ছিল। সম্রাজ্ঞীর নৌকাটিও বৈভবে কম ছিলনা। সেখানকার পরিচারকেরাও সোনা রত্নের অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। ভিক্ষু, ভিক্ষুণীদের জন্য পৃথক দুটি নৌকা ছিল। আমি তখন বিদেশী ভিক্ষুদের অভ্যর্থনাকারীদের প্রধান স্থবিরের পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম, অতএব এই নৌকা দুটির প্রমুখের দায়িত্বও আমার ওপরেই ন্যস্ত ছিল। আমার সঙ্গে ভিক্ষু জিনগুপ্ত, গৌতম ধর্মজ্ঞান, যিনি আমার স্বদেশবাসী অর্থাৎ উদ্যানী, বিনীতরুচি এবং অন্যান্য অনেক ভিক্ষু ছিলেন। নৌকার যাত্রা পথ ছিল তিন হাজার লি। নৌকা মধ্যধারা দিয়ে চলছিল। নৌকার গুণ ছিল রেশমের তৈরি, যাকে জমকালো পোশাক পরা কয়েক সহস্র লোক দুই তীর থেকে গুণ টানছিল। চারিদিকেই ছিল উৎসবের পরিবেশ। যারা গুণ টানছিল তাদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস, নৃত্যগীত করতে করতে চলেছিল কয়েক হাজার সুন্দরী রমণী, যাদের পরনে ছিল রেশমের মহার্ঘ বেশভূষা। গ্রীষ্মের দিন থাকায় একথা আগেই জানা ছিল যে যারা গুণ টানবে, তাদের গরমে কষ্ট হবে সেজন্যই খাল খনন করার সঙ্গে সঙ্গেই তার তীরে অসংখ্য বৃক্ষ রোপিত হয়েছিল। যখন সম্রাটের নৌপ্রাসাদ খালের উদ্ঘাটন করতে করতে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে চলছিল তখন দেখা গেলো খালের দুই পার অসংখ্য বৃক্ষে শোভিত। তাদের ছায়ায় গুণ যারা টানছিল তাদের কষ্টের অনেকটা লাঘব হয়েছিল। এত সুগন্ধ ছড়ানো হয়েছিল যে নৌবহর চলে যাওয়ার পরও চতুর্দিক সুগন্ধে আমোদিত হয়ে উঠেছিল। দুই তীর ছিল জনতার ভিড়ে পরিপূর্ণ।

যখন আমি আমার চোখের সামনে এরকম জাঁকজমকপূর্ণ বৈভবের প্রদর্শন দেখছিলাম তখন আমার মন প্রসন্ন হওয়ার পরিবর্তে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। যাদের শ্রমে এই খাল সৃষ্টি হয়েছে, যাদের রক্ত এবং ঘামের বিনিময়ে এই বৈভব তাদের দুঃখ কষ্ট কি বিন্দুমাত্র লাঘব হয়েছে? এই সমস্ত কিছুর জন্য কি তাদের আরও বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয়নি? জিনগুপ্ত আমার ছাঙ-আনে পৌছাবার তিন বছর পর (৫৮৫ খ্রিঃ)

এসেছিলেন। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের মধ্যে মিত্রতা গড়ে ওঠে। আমার অনেক বিচারের সঙ্গেই তিনি সহমত ছিলেন। তাঁর সামনে আমি আমার মানসিক বেদনা প্রকাশ করতে পারতাম। মিত্রদাতের সন্ধানের অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু সফল হইনি। সেও আমার মতোই ভাবত। তবে মহাচীনকে ঐক্যবদ্ধকারী প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটের বিরোধিতা করবে কে? এই খাল এখন উত্তর আর দক্ষিণে যাত্রী ও মাল চলাচলে অনেক সাহায্য করবে। প্রয়োজনবোধে সৈন্য চলাচলও করতে পারবে। উত্তরের বাসিন্দারা প্রধানত অর্ধবর্বর–দক্ষিণের মানুষের এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করতে এই খাল অনেক সাহায্য করবে। সবই ঠিক তবে সমৃদ্ধি যা হবে তা অল্প লোকের। অধিকাংশের অবস্থা যেমন ছিল তেমনই থাকবে।

সম্রাট য়াঙ আবার বৌদ্ধ ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। চাউ বংশের অত্যাচারে যে সমস্ত নামী দামী ভিক্ষুরা অন্তরালে গিয়েছিলেন, সংঘারামগুলির অবস্থা খারাপ হয়েছিল, তিনি সে সমস্ত কিছুর সংশোধনে ব্রতী হয়েছিলেন। আমার এখানে আসাও এই অবস্থারই ফল। গৌতম ধর্মজ্ঞান, বিনীতরুচিকে এই বছরেই ডাকা হয়েছিল। জিনগুপ্ত ইতিপূর্বেও একবার এদেশে এসেছেন যখন সম্রাট মিঙ (৫৫৭-৫৬৬ খ্রিঃ) ছাঙ-আনে রাজত্ব করতেন। তিনি বিশেষ করে জিনগুপ্তর জন্য বিশেষভাবে 'চতুরদেবরাজিকা বিহার' নির্মাণ করেছিলেন। বূ-তীর (৫৬৮-৫৭৮ খ্রিঃ) শাসনকালে বৌদ্ধদের ওপরে অনেক অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল এবং তাদের চীন ছেড়ে চলে যেতে হয়। জিনগুপ্ত খুব বড়ো পণ্ডিত ছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তিতে অনেকটা বুদ্ধিলের সমপর্যায়ের ছিলেন। চীনা এবং তুর্ক ভাষায় তাঁর অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল। আমি যে বারোটি গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলাম তার পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ হাজার শ্লোক (আহ্নিক) সেখানে জিনগুপ্ত একশো সত্তর লক্ষ আটত্রিশ হাজার শ্লোক (আহ্নিক) সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলীর অনুবাদ করেছিলেন। মহাকবি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'-এর আঠাশটি স্বর্গের এত সুন্দর অনুবাদ তিনি করেছিলেন যে পাঠকেরা তার মধ্যে মূলগ্রন্থের রসের স্বাদ পেত। কাব্য অনুবাদ সবচেয়ে কঠিন কাজ। 'সধর্মপুন্ডরীক' ইত্যাদির মতো মহৎ সূত্রগুলিকেও তিনি অনুবাদ করেছিলেন।

জিনগুপ্ত ছিলেন আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট এবং আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সম্মান দিতেন। কিন্তু জ্ঞানে এবং পাণ্ডিত্যে তিনি ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ। তিনিও দেশ দেশান্তরে ভ্রমণে কম কষ্ট সহ্য করেননি। আমার জন্মের দশ বছর পর পুরুষপুরে কম্বোজের এক ক্ষত্রিয়কুলে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা বজ্রসার ছিলেন একজন রাজকর্মচারী। তাঁর পিতা মাতা তাঁদের বুদ্ধভক্তির নিদর্শন স্বরূপ সাত বছর বয়সেই তাঁকে মহাবন বিহারে শ্রমণের করে দেন। তারপর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি স্থবির জিনযশকে উপাধ্যায় এবং জ্ঞানভদ্রকে আচার্য করে ভিক্ষুদীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনটি পিটককেই সম্যক অধ্যয়ন করার পর তিনি বিনয়পিটক সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। কাব্যের প্রতিও তাঁর রুচি ছিল তবে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহাকবিদের রচনা পাঠ করতে এবং তাঁদের কৃতির অনুবাদ করতে বেশি পছন্দ করতেন। জিনগুপ্তের যখন সাতাশ বছর বয়স তখন তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য বিদেশে যাওয়া মনস্থ করেন। গান্ধার থেকে কপিশাতে গিয়ে তিনি

একবছর কাটান। যেথাদের (হেপতাল) অবস্থা পড়ে গিয়েছিল। মিহিরকুল পরাজিত হয়ে কাশ্মীরে শরণ নিয়েছিল আর তার মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই সমস্ত রাজ্য ভেঙে খান খান হয়ে যায়। উত্তরে অবারদের তুর্করা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করেছিল। কিছুদিন পর তুর্করা কপিশার দিকেও হাত বাড়ায়। এরকম পরিস্থিতিতে দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে কাংস্য দেশ এবং চীনের দিকে যাওয়ার সংকল্প করা সাধারণ লোকের কাজ ছিলনা। পথে যেথাদের রাজত্বের অবসানের প্রমাণ হিসেবে অনেক শহর এবং গ্রামকে জনশূন্য ধ্বংসস্তূপরূপে দেখেছিলেন। খো-লো-ফন (তাশ কুর্গন) হয়ে তিনি কুস্তনেও কিছুকাল কাটিয়েছেন। অতঃপর তূ-য়ূ-হূ-য়েন (তুর্ক-খান) পৌছান, যার অবস্থান ছিল নীল সরোবরের (কাকোনর) পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে, তারপর সেখান থেকে ছান ছাউ (সি-নিঙ) পৌছান। যাত্রাকালে তাঁর সঙ্গী ছিলেন দশজন কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেবল মাত্র চারজনই জীবিতাবস্থায় এখানে পৌছতে সক্ষম হন। ৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি যাযাবরদের ভূমিতে ছিলেন। যদি আমি আমার ইচ্ছামতো যাত্রাপথ স্থির করতে পারতাম তাহলে আমিও জিনগুপ্তের পথেই চীনদেশে আসতাম। আর সেই ক্ষেত্রে প্রথমে য়েহতে না গিয়ে ছাঙ-আনেই আসতাম। জিনগুপ্ত সি-নিঙে তিন বছর ছিলেন। তারপরে চাউ সম্রাট মিঙের আমলে ছাঙ-আন পৌছে চাউ বিহারে অবস্থান করেন। প্রথমে তাঁর অভ্যর্থনা ইত্যাদি ভালোই হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁকে চীন ছেড়ে চলে যেতে হয়। দেশে ফিরে যাওয়ার পথে তিনি তুর্কদের অঞ্চলের মধ্য দিয়ে যান। তোপাখান (৫৭২-৫৮২ খ্রিঃ) তাঁকে তাঁদের অঞ্চলে থেকে যেতে অনুরোধ করেন। জিনগুপ্ত তাঁর সঙ্গী জিনভদ্র এবং জিনযশ ও গুরুভাই যশোগুপ্তের সঙ্গে সেখানে থেকে যান। তুর্ক কআন সম্রাটদের মধ্য তোপা খান খুব বুদ্ধভক্ত ছিলেন। তিনি জিনগুপ্ত এবং তাঁর সঙ্গীদের অত্যন্ত সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। তোপা খানের সহযোগিতায় তাঁরা তুর্কদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সার্বিক প্রচার করেন। সেখানে থাকার সময়েই সংবাদ পান যে চীনে রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটেছে এবং নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুদ্ধ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংবাদ পেয়ে তিনি সম্রাট য়াঙ-এর শাসন কালের পঞ্চমবর্ষে (৫৮৫ খ্রিঃ) তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আবার মহাচীনে আসেন। প্রথম যাত্রাকালে চাউ বংশের সময়ে তিনি তিন হাজার শ্লোক সমৃদ্ধ চারটি গ্রন্থের অনুবাদ করেছিলেন। (এর মধ্যে দুটি গ্রন্থ 'সদধর্ম পুণ্ডরীক' এবং 'নানাসংযুক্ত-মন্ত্র সূত্র,' এখনো উপলব্ধ আছে।)

বিদেশী ভিক্ষুদের আবাহনের দায়িত্ব ছিল আমার ওপরে সেজন্য জিনগুপ্ত আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী ছিলেন কিন্তু পদাধিকারে আমি ছিলাম তাঁর ওপরে, এর ফলে মনে বিরূপ ভাবনা জন্ম নিতে পারে। অতএব, প্রথম সাক্ষাতেই আমি তাঁকে আমার পদভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি শুধু মুখে নয় সমস্ত হৃদয় দিয়ে চাইলেন আমি যেন স্বপদে বহাল থাকি। নানা ধরনের লোকের সেবা করা খুব সহজ কাজ নয় আর তাঁর ইচ্ছা ছিল যতটা সময় পাবেন সবটাই অনুবাদের কাজে ব্যয় করবেন। তাঁর আগ্রহকে আমিও স্বীকার করলাম। এখানে আসার পর (৫৮৫ খ্রিঃ) আমি গ্রন্থ অনুবাদের কাজ করিনি। তবে ছাঙ-আনে থাকতে থাকতে ছোট ছোট আটটি গ্রন্থ অনুবাদ করি। যার শ্লোক

সংখ্যা ছিল পয়তাল্লিশ হাজার (সূর্যসূত্র, মঞ্জুশ্রী বিক্রীড়িত সূত্র, মহামেঘসূত্র, শ্রীগুপ্ত সূত্র, বলব্যূহ সূত্র, শতবুদ্ধ সূত্র, স্থিরমতি সূত্র)।

আমি নিজেকে জিনগুপ্তের চেয়ে কোনো কিছুতেই শ্রেষ্ঠ মনে করতাম না। অনুবাদের কাজে আমার তো রীতিমতো দীর্ঘসূত্রতা ছিল। মহাচীনে বুদ্ধধর্ম প্রচারের সবচেয়ে ভালো মাধ্যম হলো তাঁর উপদেশাবলীকে যথাসম্ভব অনুবাদ করে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এতদিন পর্যন্ত যতটা অনুবাদ হয়েছে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। জিনগুপ্ত এই কাজে নিরন্তর এগিয়ে চলেছিলেন, দেখে আমার ভালো লাগত। আমি কামনা করি তিনি যেন শতবর্ষ জীবিত থাকেন। (নরেন্দ্র যশের মৃত্যুর দশ বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়)। দেশভ্রমণেও তিনি আমার চেয়ে কম কষ্ট স্বীকার করেননি। তুর্কদের ভূমি থেকে শীতসমুদ্র এবং দক্ষিণে সিংহল যাত্রার কারণে আমি তাঁর চেয়ে সামান্য এগিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর যাত্রাপথ আমার যাত্রাপথের চেয়ে কঠিন ছিল যার ফলে তাঁর দশজন সঙ্গীর মধ্যে ছ'জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁর বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার দেখে অত্যাচারী চাউ সম্রাট চেয়েছিল যে তিনি যেন ভিক্ষুজীবন ত্যাগ করে সাধারণ গৃহস্থ হিসেবে ছাঙ-আনে সম্মানের সঙ্গে বাস করেন। কিন্তু তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর ফলে যে তাঁর জীবন সংশয় হতে পারে তা জেনেও করেছিলেন। তবে সৌভাগ্যবশত চাউ সম্রাট তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি দিয়েছিল। তুর্কদের মধ্যে দশ বছর তিনি সুখে কাটাননি। আপন সঙ্গীদের সঙ্গে ওই ভবঘুরেদের মধ্যে বুদ্ধের ধর্ম প্রচার করে তাদের স্বভাবে নমনীয়তা আনার চেষ্টা করেছিলেন।

শুধু আমি বা জিনগুপ্ত নয়, আমাদের দেশ ভারতবর্ষ থেকে শতশত ভিক্ষু মহাচীনে এসে ধর্ম প্রচারে সহায়তা করেছিল। সকলের পক্ষে অনুবাদের কাজ করার সম্ভবপর ছিল না, কেউ চিকিৎসক রূপে রোগীর সেবা করেছেন কেউ অধ্যাপনার দায়িত্বভার সামলেছেন। চীনদেশে বুদ্ধশাসন বিস্তারে তাঁদের সহায়তার ভূমিকা মোটেই কম নয়। যদি আমাদের ভাষান্তরিত গ্রন্থের কিয়দংশও কাল অতিক্রম করে বেঁচে থাকে এবং তার জন্য যদি আমাদের লোকে স্মরণে রাখে তাহলে সেই সঙ্গে তাঁদেরও স্মরণে রাখা উচিত যাঁরা হয় তো গ্রন্থ অনুবাদ করেনি কিন্তু অন্যভাবে অনেক কাজ করেছেন।

আমার বয়স এখন একাত্তর বছর (৫৮৯ খ্রিঃ), আমার স্বাস্থ্য বরাবরই ভালো ছিল। যদি তা না হতো তাহলে কঠিন যাত্রাপথ অতিক্রম করে এই বয়সে পৌছাতে পারতাম না। আজও চলে ফিরে বেড়াতে পারি। ছাঙ-আনের বাইরের বিহারে যাই। লোয়াঙ, য়েহ, হো-শূ (কান-শূ), হেঙ-অন তো (তাঙ), কীয়োন-য়ে, (নানকিঙ) প্রভৃতি পুণ্যস্থান ভ্রমণ করেছি। বিদেশী ভিক্ষুদের স্বাগত জানানোর জন্যও আমাকে এ ধরনের ভ্রমণে বের হতে হয়, তাছাড়া পরিচিত জায়গা, সেখানকার পরিচিত মানুষের সঙ্গ আমাকে আনন্দ দেয়। নদী এবং খালের পথ বাদ দিলে বাকি পথ আমি পদব্রজেই চলতাম। আমার পুরানো বন্ধুদের সংখ্যা এখন কমে এসেছে। আমিও শীতের শুকনো পাতা, যে কোনো সময়ে ঝরে যেতে পারি। যখন আমি আমার সত্তর অতিক্রান্ত জীবনের অতীতের দিকে তাকাই তখন সর্বত্র আমার পুরানো বন্ধুদের দুঃখের স্মৃতি মনে ভাসে। তবে আমার নিজের জীবনের জন্য কোনো পরিতাপ নেই। আমার কাছে যা শ্রেয় মনে

হয়েছে, আমি মন প্রাণ ঢেলে তার জন্য কাজ করেছি। যা যা এবং যতটা করতে চেয়েছি তার সবটা হয়তো পারিনি, কারণ পথে অনেক কঠিন বাধা ছিল। যে সমস্ত বাধা দূর করা একক শক্তিতে সম্ভব ছিলনা, তাই সে জন্য নিজেকে দোষী মনে করি না।

উপসংহার

নরেন্দ্র যশ এখন আর নেই। আমাদের সকলকে তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলতে হবে। বেন-তীর শাসন কালের (৫৮৯ খ্রিঃ) অষ্টম বর্ষে হঠাৎ একদিন তাঁর জীবন দীপ নিভে যায় এবং তার আগে কেউ তাঁর মহাপ্রয়াণের ঘটনার বিন্দুমাত্র আঁচ পায়নি। কোনো ব্যাধি, কিংবা দুর্ঘটনা ঘটেনি, যেমন গাছে ফুটে থাকা ফুল সময়ে আপনিই ম্লান হয়ে ঝরে পড়ে তেমনভাবেই বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে অকস্মাৎ তাঁর মাথা ঝুলে পড়ে। আমার নাম জিনগুপ্ত। যার সম্বন্ধে স্নেহবশত তিনি তাঁর লেখায় অনেক অতিশয়োক্তি করেছেন। আমি নিজেকে কখনোই তাঁর সমকক্ষ মনে করতাম না। তাঁর পর্যটনের কাছে আমারটা কিছুই নয়। তাঁর মতো কষ্ট আমাকে সইতে হ[illegible]। গ্রন্থের অনুবাদ সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি যে তিনি ইচ্ছে করলে আমার চেয়ে অনেক বেশি সেই কাজ করতে পারতেন। অবলোকিতে[illegible] (কোয়ান-ইন) করুণা সম্বন্ধে আমি অনেক পড়েছি, আমাদের নরেন্দ্র যশও ছিলেন [illegible]নই করুণাময়। তাঁর করুণার যতটা পরিচয় তাঁর জীবদ্দশায় আমি দেখেছি তাঁর একাংশও তিনি তাঁর লেখায় লিপিবদ্ধ করেননি। তাঁর জীবনের আরব্ধ কাজ, তাঁর যাত্রাকালের ঘটনাপঞ্জি তিনি লিখে যেতে চেয়েছিলেন, চীনে এ ধরনের ভ্রমণ কাহিনি লেখার রেওয়াজ আছে, সেখান থেকেই তিনি প্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং সেই কারণেই তিনি তাঁর জীবন কাহিনি লিখে গিয়েছেন।

নরেন্দ্র ছিলেন অজাতশত্রু। তাঁর সঙ্গে আমার সখ্যতার কারণ সমকর্ম, সমধর্ম ছাড়াও গান্ধারে আমার জন্ম হওয়াও অন্যতম কারণ ছিল। উদ্যান এবং গান্ধার প্রায় লাগোয়া দুই দেশ, সেজন্য সেখানকার অধিবাসীরা পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তার ভাব অনুভব করে। তবে একথা বললে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে যে তিনি শুধু আমার সঙ্গেই আপনজনের মতো ব্যবহার করতেন। তাঁর স্নেহের অধিকারী ছিল সকলেই। তাঁর একটাই আক্ষেপ ছিল যে তিনি কেন সহস্রবাহু, সহস্রমুখ এবং সহস্রকায় হলেন না। তাহলে তিনি একই সময়ে সহস্র মানুষের সেবা করতে পারতেন।

তাঁর এই গুণাবলীর জন্যই তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়া মাত্রই রাজধানীর বহুলোক তাঁর শব-যাত্রার সঙ্গী হয়েছিল। সমস্ত ধর্মের লোকই তার মধ্যে ছিল। ছাঙ-আনের বাসিন্দাদের মধ্যে ভিক্ষু ভিক্ষুণী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক ইত্যাদি বসবাসকারীদের মধ্যে খুব সামান্যই ছিল যারা তাঁর শবানুগমন করেননি। তুর্করা তাঁর প্রতি চীনের লোকদের মতোই গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করত। কুচী, কুস্তনী, তুখারী সকলেই চোখের জল ফেলেছিল। আমরা তাঁর শবদেহকে পরম শ্রদ্ধাভরে দাহ সৎকার করেছিলাম। তাঁর অস্থি বিহারের একটি স্তূপে রাখা হয়। তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার জন্য যা কিছু সম্ভব আমরা করেছি। তিনি জীবিত থাকলে এ সমস্ত করতে দিতেন না। চিরস্থায়িত্বে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি শুধু এটুকুই চাইতেন যে প্রাণী মাত্রই সুখী হোক, পৃথিবীতে দুঃখ-সমুদ্র শুকিয়ে যাক।